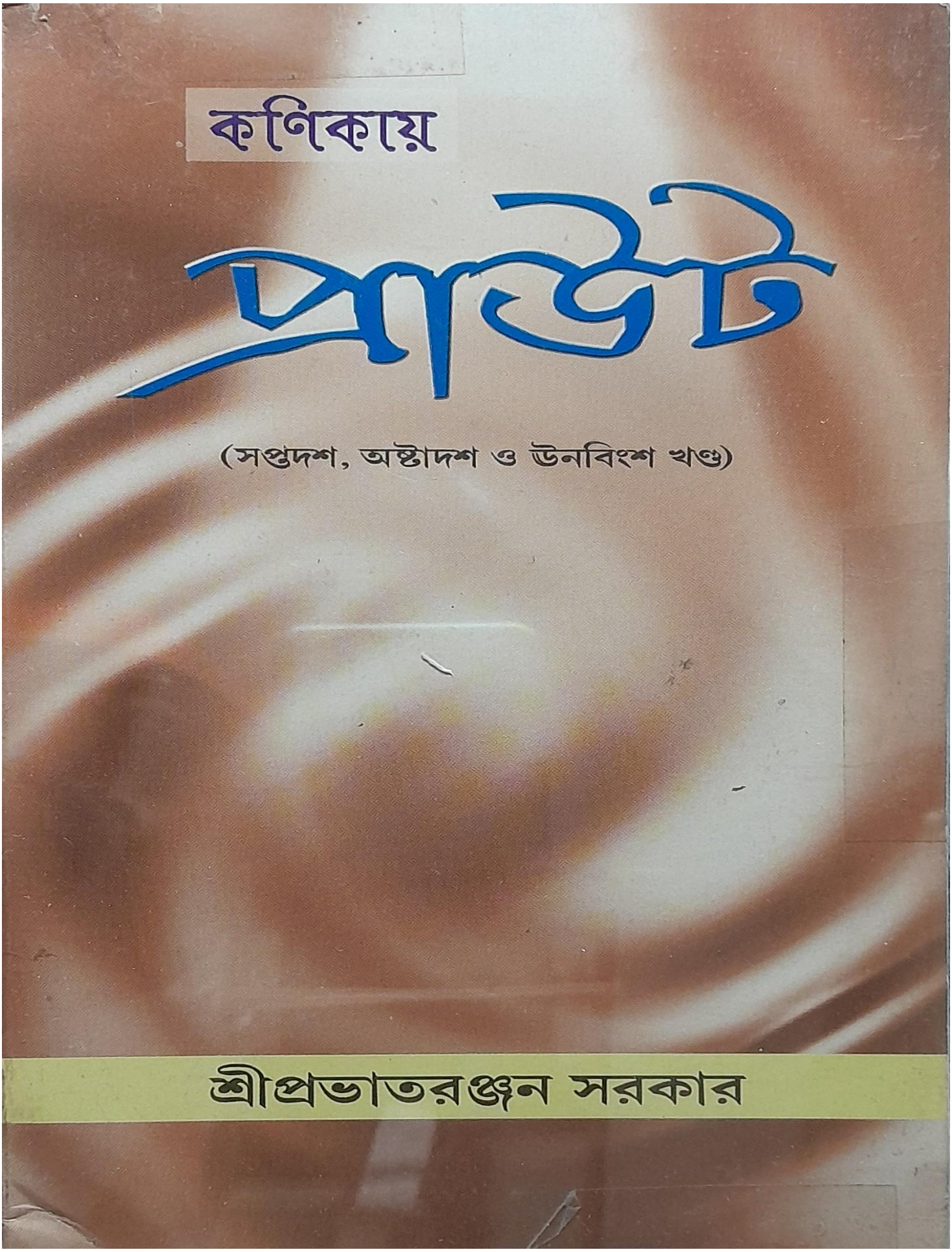

সূচীপত্র

কণিকায় প্রাউট

(সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ খণ্ড)

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

সূচীপত্র

প্রকাশক ও সত্ত্বাধিকারীর বিনা অনুমতিতে এই পুস্তকের কোন অংশ অর্থকরী কিংবা উপাধিগত কিংবা গবেষণা সংক্রান্ত কার্যে কিংবা অন্য যে-কোনো ভাবে ব্যবহার করা অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং কেহ যেন তাহা না করেন।

-প্রকাশক

কণিকায় প্রাউট

© আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয় কার্যালয়) কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

রেজিঃ অফিস: আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ আনন্দনগর, পোঃ- বাগলতা, জেলা-পুরুলিয়া, পঃ বঃ

যোগাযোগ অফিস: আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ ৫২৭, ভি. আই. পি. নগর, কোলকাতা-৭০০ ১০০

প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণী পূর্ণিমা-২০১০

ISBN 978-81-7252-256-8

প্রকাশক: আচার্য সর্বাত্মানন্দ অবধূত

সূচীপত্র

আনন্দমার্গ প্রকাশন বিভাগ

৫২৭, ভি.আই.পি.নগর, কোলকাতা-৭০০১০০

অক্ষর বিন্যাসঃ আচার্য অভিব্রতানন্দ অবধূত আনন্দ প্রিন্টার্স

৩/১সি, মোহনবাগান লেন কোলকাতা-৭০০০০৪

মুদ্রাকর: শ্রীকালী আর্ট প্রেস ২০৯ সি, বিধান সরণী

কোলকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য: একশ' টাকা মাত্র

সূচীপত্র

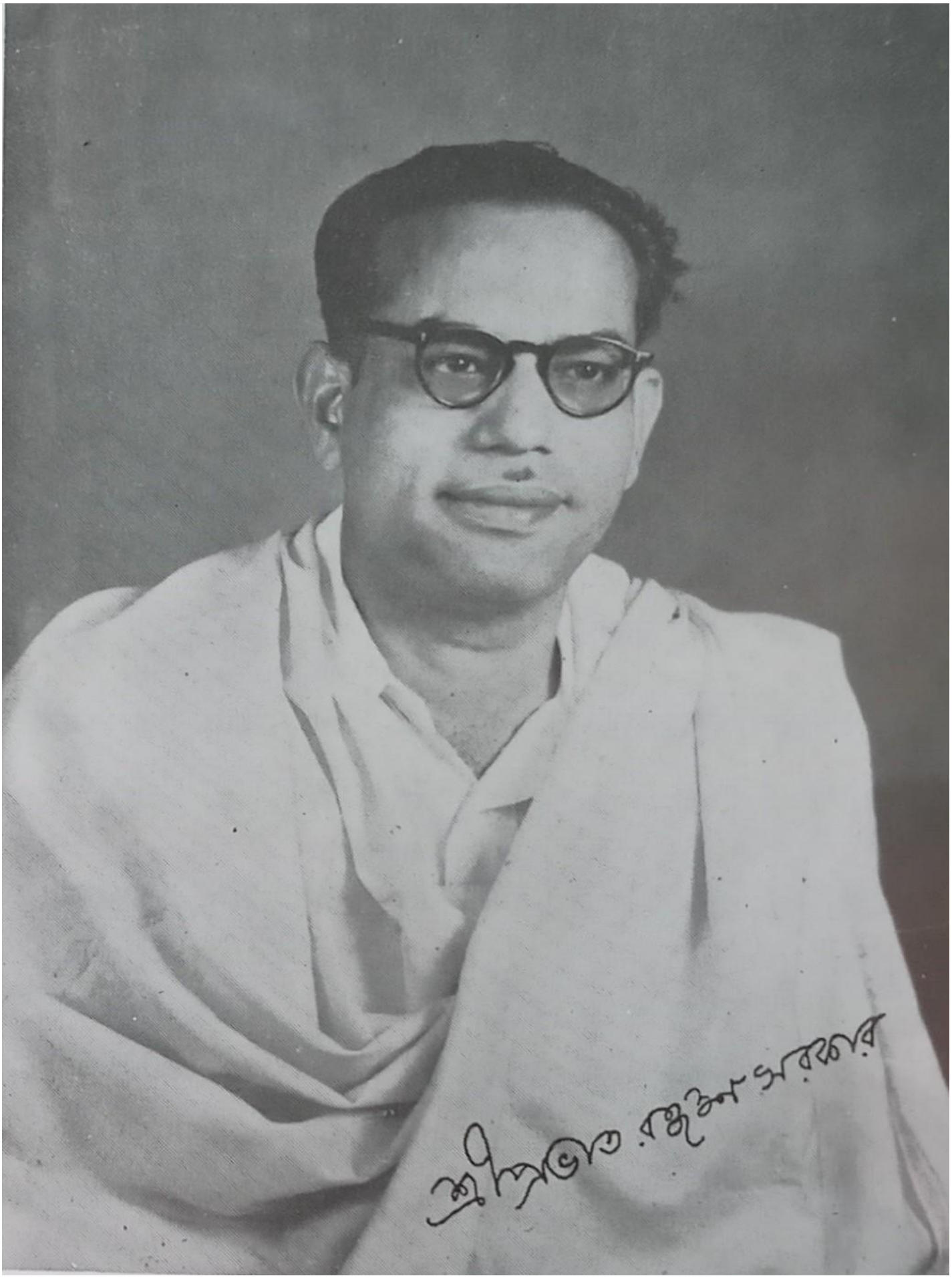

সূচীপত্র

রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা

বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ যথার্থ ভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ও দ্রুত - লিখনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা প্রবর্তিত হল:

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ ঌ ৯ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ
অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ
a á i ii u ú r rr lr lrr e ae o ao aṁ ah

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ
ka kha ga gha uṇa ca cha ja jha iṇa

ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন
ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন
ta tha da dha na ta tha da dha na

সূচীপত্র

প ফ ৰ ভ ম

প ফ ব ভ ম

Pa pha ba bha ma

য ऱ ল ৱ

য র ল ব

ya ra la va

শ ষ স হ ক্ষ

শ ষ স হ ক্ষ

sha śa sa ha kśa

অঁ জ্ঞ ঋষি ছায়া জ্ঞান সংস্কৃত ততোऽহং

अँ ज्ञ ऋषि छाया ज्ञान संस्कृत ततोऽहं

aṇ jiṇa rśi cháyá jiṇána saṁskrta tato’haṁ

সূচীপত্র

a á b c d ḍ e g h i j k l m ṁ
n ṅ ṇ o p r s ś t ṭ u ú v y

সমগ্র বিশ্বে বহুল প্রচারিত রোমকলিপির মাত্র ২৯ টি অক্ষরেই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। এতে যুক্তাক্ষরেরও ঝামেলা নেই। আরবী, ফারসী ও অন্যান্য কোন কোন ভাষার f, q, qh, z প্রভৃতি অক্ষরগুলোর প্রয়োজন আছে, সংস্কৃতের নেই।

শব্দের মধ্যে বা শেষে ' ড ' ও ঢ ' থাকলে যথাক্রমে ড় ওঢ় রূপে উচ্চারিত হয়, ' য় ' - এর মত তারাও কোন স্বতন্ত্র বর্ণ নয়।

অসংস্কৃত শব্দ লিখবার প্রয়োজনে সংযোজিত আরো দশটি বর্ণ:

ক়	খ়	জ়	ড়	ঢ়	ফ়	য়	ল়	ৎ	অঁ
ক়্	খ়	জ়	ড়্	ঢ়	ফ়	য়	ল়	ত্	অঁ
qua	qhua	za	ŕ	ŕha	fa	ya	lra	t	aṇ

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

"প্রাউট” এই বহুল পরিচিতি শব্দটি "প্রগতিশীল উপযোগ তত্ত্ব” বা ইংরেজীতে Progressive Utilization Theory-র সংক্ষিপ্ত রূপ। যাঁরা মহান দার্শনিক শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকারের (ধর্মগুরুরূপে যিনি শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি নামে সমধিক পরিচিত) পুস্তকসম্ভার সম্বন্ধে অবহিত আছেন, তাঁরা জানেন যে তিনি তাঁর সর্বানুস্যূত আধ্যাত্মিক দর্শন প্রবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে সেই দর্শনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এক সামাজিক-অর্থনৈতিক তত্ত্ব "প্রাউট”ও প্রতিপাদিত করেন। এ ব্যাপারে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত হ'ল- "অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচার মত বাঁচতে চাই, চিকিৎসা চাই, নিবাস চাই। আর এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই একদিন আমি অবস্থার চাপে পড়ে 'প্রাউট' দর্শন তৈরী করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ যে মানুষটা খেতে পাচ্ছে না, আগে তাকে অন্ন দোব, তারপর তাকে শেখাবো অধ্যাত্ম দর্শন। তারপর তাকে সাধনায় বসাবো। তাকে সাধনাতেই বসাবো কিন্তু আগে তার পেট ভরাবার ব্যবস্থা

সূচীপত্র

করতে হবে তো। শীতের সময় তার বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। অসুখ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলো প্রাথমিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজনপূর্ত্তি না হলে কখনো সামগ্রিকভাবে মানুষ জাতির উন্নতি সম্ভব নয়।"

১৯৫৫ সাল থেকেই তিনি প্রথম দিককার কয়েকটি প্রবচনে তাঁর সামাজিক- অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ব্যক্ত করা শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে প্রদত্ত এক প্রবচনমালায় দু'টি বিশেষ প্রবচনের মধ্যে একটিতে ("Cosmic Brotherhood"- Idea & Ideology) প্রথম তিনি "প্রগতিশীল উপযোগ তত্ত্ব' তথা Progressive Utilization Theory-- এই নাম ও তত্ত্বের পাঁচটি মূলীভূত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন। তাই ধরা হয় যে এটাই জনসমক্ষে প্রাউটের প্রথম আত্মপ্রকাশ। তারপর ১৯৬২ সালে তিনি "আনন্দসূত্রম" পুস্তকে (পঞ্চম অধ্যায়) ভাবার্থ সহ ষোলটি সূত্রে এই প্রাউটের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিককে উপস্থাপিত করেন। এরপর থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত প্রায় ১৭০টি প্রবচনে প্রত্যক্ষভাবে তথা আরও কয়েকটি প্রবচনে আংশিকভাবে এই প্রাউট ভাবধারার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। এ ব্যাপারে যে বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা নিম্নরূপ-

'কৃষিবিপ্লব'; 'সুসামঞ্জস্য অর্থনীতি'; 'অর্থনীতির চারটি ধারা'; 'ব্লক ভিত্তিক ও আন্তব্লক পরিকল্পনা'; 'অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ'; 'অর্থনৈতিক গণতন্ত্র'; 'শূদ্রবিপ্লব ও সদ্বিপ্র সমাজ'; 'শাসনব্যবস্থার কয়েকটি রূপ'; 'আদর্শ সংবিধানের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ'; 'নিউক্লিয়ার রেভেলিউশন'।

প্রাউট সংক্রান্ত প্রবচনগুলি প্রথমে তাঁর সুবিশাল পুস্তসম্ভারে বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। ১৯৮৭ সালে তাঁর নির্দেশে "কণিকায় প্রাউট" নামক গ্রন্থমালায় সেই প্রবচনগুলি সংগ্রথিত করা শুরু হয়। ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসের মধ্যে "কণিকায় প্রাউট"-এর চতুর্দশ খণ্ড পর্যন্ত ৰাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে প্রকাশিত হয়ে যায়। এরপর নভেম্বর ১৯৮৮ থেকে শুরু করে অক্টোবর ১৯৯১ পর্যন্ত "Prout In a Nutshell"- এর পঞ্চদশ খণ্ড থেকে একবিংশ খণ্ড পর্যন্ত আরও সাতটি খণ্ড ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। "কণিকায় প্রাউট"-এর এই সাতটি খণ্ডের মোট তেষট্টিটি প্রবচন এতদিন বাংলায় অপ্রকাশিত থাকায় প্রাউট সম্পর্কে আগ্রহী অসংখ্য ব্যষ্টি এ ব্যাপারে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন। তাঁদেরই আগ্রহাতিশয্যে "কণিকায় প্রাউট"-এর পরবর্তী খণ্ডগুলি প্রকাশ করার জন্যে আনন্দমার্গ

প্রকাশন বিভাগের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রয়াস শুরু হয়। সেই প্রয়াসেরই ফলশ্রুতিস্বরূপ "কণিকায় প্রাউট পঞ্চদশ ও ষোড়শ খণ্ড" একত্রে ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়। এইবার প্রায় তিন বছর পরে "কণিকায় প্রাউট" সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ খণ্ড একত্রে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। বাকী মাত্র দু'টি খণ্ড যথাশীঘ্র পাঠকের হাতে তুলে দেবার জন্যে আমাদের প্রয়াস চলতে থাকবে।

"কণিকায় প্রাউট" সপ্তদশ খণ্ডটি ১৯৮৯ সালের প্রথম দিক থেকে ১৯৯০ 'সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কলিকাতা তাঁর নিবাসস্থান, যথাক্রমে "মধুমালঞ্চ" ও "মধুকোরক"-এ, তাঁর প্রদত্ত প্রবচনগুলির সমাহার। এই প্রবচনগুলি মূলতঃ এই সময়কালের মধ্যে সংঘটনের সন্ন্যাসী-কর্মী, এল,এফ,টি ও মার্গের অনুগামীদের বিভিন্ন রিপোর্টিং সেশনে দেওয়া প্রবচন যা যত্নসহকারে সংগ্রহ করে ইংরেজী পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

"কণিকায় প্রাউট" অষ্টাদশ খণ্ডটিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রদত্ত প্রবচন, যার মধ্যে ১৯৬৬ সালের একটি, ১৯৬৯ সালের দু'টি ও ১৯৭০ সালের একটি প্রবচন অন্তর্ভুক্ত আছে। ১৯৬৯ সালের দু'টি প্রবচন তাঁর লিখিত "তত্ত্ব

কৌমুদী” গ্রন্থ থেকে গৃহীত। এরপরে ১৯৮০, ১৯৮১ ও ১৯৮৫ সালের প্রবচনগুলিও অন্তর্ভুক্ত আছে। ২৫ মে ১৯৮৫ সালে প্রদত্ত প্রবচনটি আনন্দনগরে প্রদত্ত আর, ইউ প্রবচন। এর পরেকার বাকী প্রবচনগুলি ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে তাঁর "মধুকোরক” বাসস্থানে প্রদত্ত প্রবচনমালা থেকে সংগৃহিত।

"কণিকায় প্রাউট” ঊনবিংশ খণ্ড সপ্তদশ খণ্ডের মতই ১৯৮৮ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত বিভিন্ন সেশনে প্রদত্ত প্রবচনমালা থেকে সংগৃহিত। এর মধ্যে একটি প্রবচন ১৯৮১ সালের।

এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই তিনটি খণ্ডের সব প্রবচনগুলি হয় মূল বাংলা ও ইংরেজীতে প্রদত্ত। কিন্তু প্রবচনগুলি প্রথম ইংরেজী পুস্তকে প্রকাশিত হওয়ায় এর সময়ক্রম ও উপস্থাপনার একই রীতি বর্তমান পুস্তকে অনুসৃত হয়েছে। তাই সবক্ষেত্রে প্রবচনগুলির যথাযথ সময়ক্রম রক্ষা করা যায়নি। এর অর্থ ইংরেজী পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার সময় তখন যেভাবে বা যে সূত্র থেকে যে প্রবচনটি সংগৃহিত হয়েছিল, বাংলা পুস্তকেও সেটি যথাযথ ভাবে রক্ষা করা হয়েছে যাতে এর মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ন না হয়।

বর্তমান পুস্তকে প্রায় সব প্রবচন মূল ইংরেজী থেকে ৰাংলায় অনুবাদ করেছেন আচার্য বিবেকানন্দ অবধূত। এর মধ্যে কয়েকটি প্রবচন আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের ত্রৈমাসিক মুখপত্র “প্রগতি শিখা"-য় পূর্বে প্রকাশিত হয়। কয়েকটি প্রবচন অনুবাদ করেছেন আনন্দমার্গ প্রকাশন বিভাগের কর্মীবৃন্দ। শ্রীপ্রণব রায় সমগ্র পুস্তকটির প্রুফ খুব যত্নসহকারে সংশোধন করে দিয়েছেন। আচার্য পীযূষানন্দ অবধূত বিশেষ আগ্রহ নিয়ে এই পুস্তকের DTP তৈরী, Lay out, মুদ্রণ ইত্যাদি কাজগুলি সম্পন্ন করেছেন। এঁদের সকলের কাছে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া অন্য আরও যাঁরা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলের জনেও রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

লেখকের সুস্পষ্ট অভিমত হ'ল, ভাষাবিজ্ঞান তথা শুদ্ধ বানান-বিধির স্বার্থে ৰর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব'-এর ব্যবহার বাংলায় থাকাই উচিত। তাই পুস্তকে এই দু'টি 'ব'-এর যথোপযুক্ত ব্যবহার করা হয়েছে। পুস্তকের যেখানে প্রথম ৰন্ধনীর চিহ্ন আছে তা লেখকের বক্তব্য বলেই ধরতে হবে। আর যে সব শব্দ বা বাক্যাংশ তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে আছে সেগুলি হ'ল পাঠকের সুবিধার্থে সম্পাদকীয় সংযোজনা।

আজ বিশ্বজুড়ে বঞ্চিত, শোষিত, নির্যাতিত ও অত্যাচারিত মানুষ সামাজিক- অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে যে নবতর সংগ্রাম শুরু করেছেন, তাঁদের ও সমস্ত চিন্তাশীল মানুষদের প্রয়োজন যদি এই পুস্তকের মাধ্যমে সংসাধিত হয় তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে বলে আমরা মনে করব।

শুভেচ্ছান্তে,
প্রকাশক
শ্রাবণী পূর্ণিমা,
২৪ অগাষ্ট ২০১০

॥ সূচীপত্র ॥

(সপ্তদশ খণ্ড)

পৃথিবীর জলসম্পদের সংরক্ষণ।

বিশ্বের লিপি ও ভাষা সম্পর্কিত এক পর্যবেক্ষণ।

ভাষার তাৎপর্য। নূনতম প্রয়োজন ও সর্বাধিক সুখ-সুবিধা।

প্রাউট ও নব্যমানবতাবাদ্। প্রদমন, অবদমন ও দমন।

হিম যুগ আসছে। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলো।

ভারতীয় ভাষাসমূহের ক্রমবিবর্তন।

(অষ্টাদশ খণ্ড)

তোমাদের জীবনব্রত। সদ্বিপ্র বোর্ড।

প্রাপ্তবাক্য ও আপ্তবাক্য। শোষণের বহুবিধ রূপ।

মানুষের সার্বভৌমিক কল্যাণের জন্যে নিরন্তর প্রয়াস–১

মানুষের সার্বভৌমিক কল্যাণের জন্যে নিরন্তর প্রয়াস–২

শিক্ষা প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য। বিদ্বান ও শিক্ষিত।

প্রাউটের বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা।

ঈশ্বরকেন্দ্রিক দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব। সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহতা।

প্রশ্নোত্তরে প্রাউট।

(উনবিংশ খণ্ড)

পূর্বার্দ্র তত্ত্ব। আয়ারল্যান্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাঙলাদেশের কতকগুলি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা।

ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বিহারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
চক্রনেমী(মাষ্টার ইউনিট)। অর্থনৈতিক শোষণের তিনটি রূপ।
বাঙলার কয়েকটি অঞ্চলের উন্নয়ন সম্পর্কে কিছু বক্তব্য।

অন্য গন্য বুকমার্ক

Mass feeding centre. অঙ্গদেশ।
অপুষ্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আমাদের কর্তব্য।
ইংরেজী বিশ্বভাষা। ইংল্যান্ডের সংবিধান অলিখিত।
উর্দুকে অণুসরণ করলে হিন্দির অকালমৃত্যু হবে।
একদলীয় শাসনতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মৌলনীতির...
একদিন বুদ্ধি আর বোধি এই পৃথিবীকে শাসন করবে।
ঔপনিবেশিক শোষণ। কমিউন ব্যবস্থার মনস্তাত্বিক ত্রুটি।
কম্যুনিজম। কম্যুনিষ্টদের রাষ্ট্রবিরোধী... পরিণতি ত্রিপুরা
কম্যুনিষ্টদেশে সবকিছুই কেন লৌহযবনিকা...
খরার কারণ সমূহ।

গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচের কুফলগুলি।
গোর্খাল্যান্ড। গোর্খাল্যান্ডের দাবী।
গোর্খাল্যান্ডের দাবী রাজনৈতিক আন্দোলন নয়।
গোর্খা হিল কাউন্সিল ভারতীয় সংবিধান বিরোধী।
জীবনের সুখ সুবিধা।
তখনও কি বিশ্বসামরিক রক্ষীবাহিনী রাখতে হবে?
ত্রিপুরায় আলুর প্রক্রিয়াকরণ শিল্প।
দীঘার সমুদ্রতট পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে চওড়া।
দুইমেরুর অবস্থানের পরিবর্তন শুরু হয়েছে।
দ্বিতীয় কর্তব্য নীতিবাদীদের ঐক্যবদ্ধকরা।
দ্রব্য বিনিময় বাণিজ্য barter trade. নদী।
নলকূপের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার ত্রুটি।
নেপাল সীমান্তে তেলের ভাণ্ডার আছে। পঞ্চগৌড়।
পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা। পৃথিবীর দারিদ্র্য অধ্যুষিত অঞ্চল।

প্রাউট ও নব্যমানবতাবাদ। প্রাউট দর্শনের আঙ্কিক স্থিতি কী?

প্রাউট প্রতিষ্ঠিত হবে অধ্যাত্মবাদীদের দ্বারা।

প্রাউটের প্রগতি কী ধরনের প্রগতি? প্রাকৃতিক সুখ সুবিধা।

ফ্যাসিষ্ট শোষণ। বনসর্জন।

বাঙলার জন্যে উপযোগী কয়েকটি উন্নয়ন কার্য।

বাঙলার মূল অধিবাসী।

বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির মিলন বিন্দু।

বিশ্ব জুড়ে জল সংকট। বৃহত্তর বাঙলা।

বোনাস ব্যবস্থা ও ফুরণ কাজ।piece work.

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ। ভবিষ্যৎ প্রগতি ।

ভারতের ভাষা সমূহ। ভারতের লিপি সমূহ।

ভোজপুরী। মগধ, নাগপুরী, রাঢ়অঞ্চল।

মানব সভ্যতার ইতিহাস হচ্ছে সামূহিক মনস্তত্বের ইতিহাস।

মানস অর্থনৈতিক মুক্তি। মানুষের মানসিক অভীপ্সা পূর্ত্তি।

মার্কসবাদ তো এখন মৃত; প্রাউটের ভূমিকা কী হওয়া উচিত্।

মিথিলা।

রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেবার দাবী সমর্থন করবো কি?

রাম অনার্য শূদ্রককে হত্যা করেছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে weightage

রিলিজিয়ন বা উপধর্ম বা ধর্মমত। শিক্ষানীতি

শিক্ষার পদ্ধতি। শিক্ষার সংজ্ঞা

ষ্ট্যালিন লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল।

সংস্কৃত হোক দেশের জাতীয় ভাষা।

সমস্ত উপভাষা একদিন মূলভাষায় মিশে যাবে।

সর্ব শ্রেষ্ঠ সেচ পদ্ধতি। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ।

সার্বিক জন সেবামূলক পরিকল্পনা।

সুবর্ণরেখার উত্তরে ও অন্যত্র খনিজ দ্রব্যের সন্ধান।

সেবামূলক সমবায় কাকে বলে?

পৃথিবীর জলসম্পদের সংরক্ষণ

শুরুতে পৃথিবী গ্রহে বিরাজ করত চরম নীরবতা–কোনো জীবিত সত্তাতো ছিলই না, এমনকি গাছপালাও জন্মায়নি। লক্ষ কোটি বছর ধরে এই অবস্থা চলেছিল। তারপর পৃথিবী অনেক ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলে উপযুক্ত ভাবে তৈরী হ'ল। এরপরে এক স্তরে পৃথিবীর বুকে নেবে এল বৃষ্টিধারা, শুরু হ'ল ঝড়ঝঞ্ঝা। এইভাবে ক্রম–পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে জীবনের উদ্ভব হ'ল। বৃষ্টির ফলেই কার্বণ পরমাণুতে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হ'ল। কার্বণ পরমাণু–সমন্বিত প্রোটোপ্লাজমিক সংঘর্ষ–সমিতি জন্ম দিল এই প্রাণ শক্তির।

পৃথিবী গ্রহের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় জল হ'ল এক অত্যাবশ্যকীয় তত্ত্ব। আজ এই জল ছাড়া মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালার জীবনধারণ আর সমগ্র পৃথিবী গ্রহের অস্তিত্বের কথা চিন্তাই করা যায় না। যদি মাত্র এক বৎসর পৃথিবীর কোথাও বৃষ্টিপাত না হয়, তাহলেই পৃথিবীর বুক থেকে জীবনের অস্তিত্ব

ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এর কারণ হ'ল ছোট এক-কোষী জীব থেকে সর্ব বৃহৎ জানোয়ার- সমস্ত জীবিত সত্তারই জলের প্রয়োজন। যদি জল না থাকে তাহলে আগে ছোট ছোট জীবের মৃত্যু হবে, তারপরে গ্রহের সামগ্রিক পরিবেশগত ভারসাম্যটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তারপর মরবে মানুষেরা। শেষে পৃথিবী এক পরিত্যক্ত উষর ভূমিতে পরিণত হবে।

বিশ্ব জুড়ে জল-সংকট

নিকট ভবিষ্যতে পৃথিবীর অনেক অংশেই তীব্র জল-সংকট দেখা দেবে। গঙ্গা, যমুনা, টেমস ইত্যাদির মত অনেক বড় বড় নদীর জল খুব দূষিত হয়ে পড়েছে। এদের জল পানযোগ্য তো নয়ই, যদি এই জলে হাত-পাও ধোয়া হয়, তাহলেও রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যায়। এর একমাত্র সমাধান হ'ল বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভর করা। আমাদের বৃষ্টির জলধারা সঞ্চয় করে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিয়ে হিলিয়াম গ্যাস বা অন্যান্য প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম বৃষ্টি সৃষ্টি করতে হবে; জলভরা মেঘ যা সমুদ্রে বৃষ্টিপাত ঘটায় তা স্থলভূমির দিকে টেনে আনতে হবে। অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় কেবল গভীর নলকূপ খনন করে চলা কোন সমাধানই নয়।

বরং বৃষ্টিপাত যেখানে হচ্ছে, ঠিক সেই জায়গায় জলকে সংগ্রহ করে রাখবার চেষ্টা করতে হবে। এই জন্যে অবিলম্বে ওইসব জায়গায় অনেক পুকুর, খাল, ছোট বাঁধ, জলাধার, হ্রদ তৈরী করে বৃষ্টির জলকে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহারের জন্যে সঞ্চয় করে রাখতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে মানবতা যে জল-সংকটের সম্মুখীন হবে তা থেকে বাঁচবার এই হচ্ছে একমাত্র উপায়। জাগতিক ক্ষেত্রে দুই ধরনের বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকে -এক হচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দ্বিতীয় হচ্ছে মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয়। আজকে যদিও মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয়ের সংখ্যাই যেন বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যেই মানুষ টাইফুন, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়েরও সম্মুখীন হচ্ছে। মানুষ এইভাবে নানারকম দুর্বিপাকের কবলে পড়লেও, প্রলয় বলে কিছু কোন কালেই হবে না। প্রলয়ের ভ্রান্ত ধারণাটাই দাঁড়িয়ে আছে ভাবজড়তা আর কুসংস্কারের ওপর।

মনুষ্য সৃষ্ট দুর্বিপাক দুই ধরনের প্রথমটা হ'ল কোনো জায়গায় মানুষের সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত, ত্রিধাবিভক্ত করে ফেলা। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল ইজরায়েল-প্যালেষ্টাইন সংঘর্ষ আর উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে যুদ্ধ। অখণ্ড

ভারতকে ভেঙ্গে ভারত, পাকিস্তান আর পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সৃষ্টি ত্রিধাবিভক্ত করার উদাহরণ। পরিবেশের ধ্বংসসাধন করে আর কয়লা, তেল ও জলের মত মাটির নীচেকার সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে মানুষ নিজে এক বড় বিপর্যয়কে ডেকে আনছে। জঙ্গল উচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে মানুষ পরিবেশের চরম ধ্বংসসাধন করছে। এর ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে আগত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাযুক্ত মেঘ সমগ্র ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে আরব সাগরের ওপর বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছে। এর অর্থ হ'ল, যে মেঘ আগে মগধে বৃষ্টিপাত ঘটাত তা এখন আরব সাগরের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে আরব সাগরের জলস্তর উঁচু হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বঙ্গোপসাগরের জলে লবণাক্ত ভাব বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে আবার ভারতের উপকূল অঞ্চলের জলস্তর উঁচু হচ্ছে, তার সঙ্গে ভারত উপমহাদেশের স্থলভূমি সঙ্কুচিত হয়ে আসছে আর ভূমিক্ষয় বেড়ে চলেছে। পৃথিবীর প্রায় দুই- তৃতীয়াংশ ভূভাগ হ'ল জলের তলায় আর এক-তৃতীয়াংশ হ'ল স্থলভাগ। কিন্তু নির্বিচারে বন ধ্বংসের ফলে জলভাগ বেড়ে যাচ্ছে অথচ ভূভাগ কমে আসছে।

পরিবেশ ধ্বংসের আর একটি উদাহরণ হ'ল ভূ-নিম্নস্থ সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। মাটির নীচেকার এই সব সম্পদ খনন করে বাইরে নিয়ে আসার ফলে বিশাল ও গভীর খাদের সৃষ্টি হচ্ছে যা ঠিক ভাবে ভরাট করে দেওয়া উচিত। অনেক দেশে মাটির নীচে থেকে কয়লা উত্তোলনের পরে বালি দিয়ে সেই স্থান ভরাট করে দেওয়া হয়। তা যদি না করা হয় তাহলেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলি অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশী ভূমিকম্প-প্রবণ এলাকায় পরিণত হবে। শুধু তাই নয় না ভরাট করা খাদ পৃথিবীর ভূমি-সংরচনাকেই দুর্বল করে দেবে যার ফলে সমগ্র অঞ্চলটাই একদিন ধসে যাবে।

আরব দেশগুলি মাটির নীচে থেকে তেল উত্তোলন করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে চলেছে। বেশ কিছু বছর আগে সেই দেশের নেতারা বুঝলেন যে তেলের উৎপাদন এইভাবে চিরকাল চলবে না। তাই তেলের সরবরাহ শেষ হয়ে গেলে তাদের দেশের ভবিষ্যৎ কি হবে, এই নিয়ে তাঁরা ভাবনা চিন্তা শুরু করলেন। তাদের দেশে জলস্তর নীচে নেবে যাচ্ছে আর মরুভূমির পরিধি বেড়ে যাচ্ছে, এই দেখে তারা উৎকন্ঠিত হয়ে উঠলেন। এই সমস্যা সমাধান করার জন্যেই তাঁরা মাটি

আর মিষ্টি জল আমদানী করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারপর থেকে যেসব গাছপালা তাঁরা লাগিয়েছিলেন আজ তা আট-দশ বছরের হয়েছে। আর এর মধ্যেই সেই সব দেশের মানুষের প্রথম বন্যা দেখার মত অভিজ্ঞতা হয়েছে। স্থানীয় মানুষের অনেকে এর আগে বন্যা কখনো দেখেননি। আর ছোট ছোট শিশুরা এত বৃষ্টি দেখে আশঙ্কায় চিৎকার করে উঠেছিল।

পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে ভূ-গর্ভস্থ জলের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে মরুভূমি তৈরী হওয়ার মত পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ জল নীচে নেমে যাওয়ার অর্থই হ'ল ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি মাটি শুকিয়ে যাওয়া, যার ফলে গাছপালাও শুকিয়ে মরে যায়। রাজস্থানের অনেক অংশে ঠিক এই রকমটাই হয়েছে। একমাত্র ব্যাপক বনসর্জন এই মরুভূমি হওয়ার করুণ পরিণতি থেকে বাঁচাতে পারে।

মানুষ অতীতে জলের আকাল আর খরার কবলে পড়ে অনেক ভুগেছে আর ভবিষ্যতে যদি ওই ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে তারা আরও ভুগবে। যদি বন ধ্বংস ও ভূগর্ভস্থ জলকে নিয়ে যথেচ্ছাচার চলতে থাকে তাহলে পৃথিবীর অনেক দেশ ১৯৯৩ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে

ভয়ংকর জল সংকটের মধ্যে পড়বে। এই মর্মান্তিক পরিণতি থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হ'ল অবিলম্বে জলসম্পদ সংরক্ষণের জন্যে একটি বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনা রূপায়িত করা।

খরার কারণ সমূহ

খরা কেন হয়? এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি কী কী? এর তিনটি প্রধান

কারণ হ'ল নিম্নরূপ:-

প্রথম, ব্যাপকভাবে গাছপালা ও বন ধ্বংস করা। দ্বিতীয়, সমুদ্র ও মহাসাগরের ওপর নিম্নচাপ তৈরী হওয়ার প্রাকৃতিক নিয়ম। আর তৃতীয় কারণ হ'ল সূর্য সহ অন্যান্য জ্যোতিষ্ক, যেমন-ধূমকেতু-নেবুলা বা গ্যালাক্সির কৌণিক গতির হঠাৎ পরিবর্তন।

বন উচ্ছেদ খরার জন্ম দেয় কেননা এর ফলে গাছপালা মাটিকে সরস রাখতে পারে না। সাধারণ অবস্থায় গাছের ছোট ছোট আঁশযুক্ত শেকড় মাটি থেকে প্রচুর জল শুষে নেয় ও তা ধরে রাখে যা ধীরে ধীরে মাটিতে ছাড়তে থাকে।
উদাহরণস্বরূপ, গ্রীষ্মকালে বাংলার ধানক্ষেতে দেখা যাবে যে

ক্ষেতের ধারে নিচু অংশে অল্প অল্প জল জমা হচ্ছে। জল এল কোথা থেকে? জমিতে দাঁড়ানো ফসলের গোড়া থেকেই তা বেরিয়ে আসে। কিন্তু যখন ধান ও সহকারি ফসল কাটা হয়ে যায় তখন দেখা যায় সেই জলও শুকিয়ে যাচ্ছে। মানুষই বনোচ্ছেদের কারণ, তাই মানুষকেই নিজের প্রয়াসের দ্বারা এই সমস্যা সমাধান করতে হবে।

খরার দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণ বর্তমানে মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ভবিষ্যতে আবহ বিজ্ঞান ও সামুদ্রিক বিজ্ঞানের (meteorological and marine sciences) উন্নতি হলে মানুষ আংশিক ভাবে দ্বিতীয় কারণকে প্রভাবিত করতে পারবে বা তা থেকে নিস্তার পেতে পারবে। তৃতীয় কারণ একমাত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন পরম চৈতন্যসত্তা। অবশ্য মানুষ যদি পজিটিভ মাইক্রোবাইটার পথ নেয় আর পরম চৈতন্যসত্তার কৃপা পায়, তাহলে মানুষও তৃতীয় কারণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

গ্রহ-তারা-জ্যোতিষ্কদের কৌণিক গতির হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে কীভাবে খরা হতে পারে? কিছু ধূমকেতু আছে যার গতিপথ আগে থেকে স্থিরীকৃত হয়ে থাকে। আর জ্যোতির্বিদরা তাদের পৃথিবীর কক্ষপথে আগমন ও তজ্জনিত সম্ভাব্য প্রভাব

সম্পর্কে জানতে পারেন। কিন্তু কিছু কিছু ধূমকেতু আছে যারা আগাম কোনো সতর্ক বার্তা ছাড়াই হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়। যখন এই রকম কোনো শক্তিশালী জ্যোতিষ্কের হঠাৎ আগমন হয় বা তাদের কক্ষপথে যদি হঠাৎ কোনো পরিবর্তন ঘটে তাহলে তাদের মহাকর্ষীয় টানে ঋতুচক্র বা সৃষ্টিধারার স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন কোনো শক্তিশালী ধূমকেতু বা উল্কার প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে মেঘ তৈরী হওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সংস্কৃতে এই অবস্থাকে বলা হয় বক্রীদশা।

বিশাল সংখ্যায় পজিটিব বা নেগেটিব মাইক্রোবাইটামের একত্র সমাবেশের ফলে উল্কা, ধূমকেতু বা উপগ্রহের মধ্যে এক ধরনের বিচ্যুতি আসতে পারে। বিশাল মহাশূন্যে সবকিছুর গতি-প্রকৃতি নির্ভর করে পজিটিব ও নেগেটিব মাইক্রোবাইটার গতি প্রকৃতির ওপর।

জ্যোতিষ্কের কৌণিক গতি মানুষের মনকেও প্রভাবিত করে। ধর, শান্ত পূর্ণিমা রাতে তুমি বাইরে কোথাও আছ, মৃদুমন্দ ঠাণ্ডা বাতাস তোমার শরীরকে জুড়িয়ে দিচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবে এই পরিবেশে এক সুন্দর ভাললাগার অনুভূতি তোমার মনে

বিরাজ করবে। ধর, এই অনুভূতি তোমার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আছে কিন্তু তার মধ্যে এক সময় হয়ত তুমি দেখলে যে তোমার স্নায়ুকোষগুলো কেমন যেন নির্জীব হয়ে আসছে। আর এই অভিজ্ঞতা যদি একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে চলে যায়, তোমার চিন্তাশক্তি বিকল হয়ে যেতে পারে, যার ফলে কোনো মানসিক রোগও দেখা দিতে পারে। [বাইরের অন্য কিছুর প্রভাবে, যেমন কৌণিক গতির পরিবর্তন] মানুষের শারীর মানসিক সংরচনার মধ্যে পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলে এটা হয়।

ধর, আট বছর বয়সে তোমার জীবনে কোনো ঘটনা ঘটেছিল। আমরা জানি এই বিশ্বে একটি জিনিস অন্য একটি জিনিসের সঙ্গে হুবহু এক নয়, যদিও পারস্পরিক সাদৃশ্য থাকতে পারে। এখন আট বছর পরে যদি অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে ১৬ বছর বয়সে একই রকমের ঘটনা হয়ত তোমার জীবনে ঘটে যেতে পারে। তোমাদের দেখতে হবে, যে বিশেষ পরিস্থিতিতে একজনকে অতীতে কোনো কষ্টকর ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তাকে যেন কখনই সেই পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়। কেননা সেই ক্ষেত্রে

তা মানুষটির আধ্যাত্মিক প্রগতিকে ব্যাহত করবে। এই ব্যাপারটা জাগতিক ও মানসিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

মানুষের গতি হচ্ছে পরিবেশগত ভারসাম্য অর্জনের দিকে– চরম সংশ্লেষণাত্মক স্থিতির দিকে। অন্তর্জগতে সমতা বজায় রাখতেই হবে। কেন না এর ফলে আধ্যাত্মিক প্রগতি সম্ভব হবে। পরিবেশগত শৃঙ্খলা বজায় রাখা শুধু এই গ্রহের জন্যে নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্যে। আর তা ভেতরে বাইরে দু'দিকেই বজায় রেখে চলতে হবে। কোনো জ্যোতিষ্কের কৌণিক স্থানচ্যুতি যেমন মানুষের মনকে প্রভাবিত করবে, তেমনি বহির্জাগতিক দিক থেকে বিশ্বকে তো প্রভাবিত করবেই। তাই অন্তর্জগত–বহির্জগতে সমতা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এই সূক্ষ্ম সমতা ৰোধ বজায় রেখে চলতে হবে এটাই হ'ল সত্যিকারের পরিবেশগত ভারসাম্য।

নলকূপের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার ত্রুটি

আমি আগেই বলেছি অধিক সংখ্যায় নলকূপ তৈরী করে দিলেই জল–সংকটের সুরাহা হবে না। এই ব্যবস্থায় ত্রুটি কী?

নলকূপের মাধ্যমে সেচ জলস্তরকে নীচে নামিয়ে দেবে, আর এর অনবরত ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ জলের স্রোেত শুকিয়ে যাবে। প্রথমে হয়ত এর কুফল ঠিকভাবে ৰোঝা যাবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে এক উর্বর এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেল। আসলে যদি ভূ-গর্ভস্থ জলের স্তর কুড়ি-পঁচিশ ফুটের ওপরে থাকে, তাহলে ভূ-পৃষ্ঠের গাছ-পালার ক্ষতি হবে না, কিন্তু তা যদি পঞ্চাশ ফুটের নীচে নেমে যায় তাহলে ভূ-পৃষ্ঠের মাটি এক বন্ধ্যা, পতিত জমিতে পরিণত হতে বাধ্য।

গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচের কুফলগুলি নিম্নরূপঃ-

১। পার্শ্ববর্তী অগভীর নলকূপের জল শুকিয়ে যায়, যার ফলে পানীয় জল পাওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

২। গাছ, ফলের বাগান, বড় বড় উদ্ভিদ যথেষ্ট পরিমাণে জল মাটির নীচে পায় না। ফলস্বরূপ তারা শুকিয়ে মরে যায়। নলকূপের মাধ্যমে যদি ব্যাপক ভাবে কৃষিকাজ করা হয়

তাহলে গ্রামাঞ্চলের সবুজ পটভূমি ৩০ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যেই শুকিয়ে মরুভূমিতে পর্যবসিত হবে।

৩। কিছু গভীর নলকূপের ক্ষেত্রে শক্র পদার্থ যেমন ভারী খনিজ বা খনিজ লবণের মত মাটির পক্ষে ক্ষতিকর পদার্থ জলের সঙ্গে মিশে তার লবণাক্ত ভাগকে বাড়িয়ে দিয়ে সমস্যা তৈরী করে। ফলে শেষ পর্যন্ত জমি অনুর্বর ও চাষের কাজে অনুপযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। যখন নলকূপের উৎস শুকিয়ে যায়, তখন ওই

নলকূপের জল যা চাষের জন্যে ট্যাঙ্কে জমিয়ে রাখা হয়েছিল তাও শুকিয়ে যায়।

নলকূপের মাধ্যমে সেচ শুধু সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কেননা তা শেষ পর্যন্ত চারিপাশের পরিবেশের বিপুল ক্ষতি করে দেয়। সেচের জন্যে বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থা হ'ল নদী সেচ, পুকুর-বাঁধ-সায়রের মাধ্যমে সেচ, তোলা সেচ, খাল/নালার মাধ্যমে সেচ। সেচের জল হ'ল ঘুরন্ত লাটিমের মাথার মত গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যকতা। এ ছাড়া কৃষিকাজ অসম্ভব।

সর্বশ্রেষ্ঠ সেচ পদ্ধতি

সেচের জন্যে সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি হ'ল পুকুর-খাল-বাঁধ, জলাশয়, আর জলাধারের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের জলকে সংরক্ষণ করা।

রাঢ় ও ওড়িষ্যার উদাহরণ নেওয়া যাক্। এই দুই অঞ্চলের সম্ভাবনাকে ঠিকমত কাজে লাগানো হয়নি বা তার উপযুক্ত বিকাশেরও ব্যবস্থা করা হয়নি। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় সম্পদ হ'ল ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ যা ঠিকমত ব্যবহারে আনা উচিত ছিল, কিন্তু বাস্তবে এ সম্পর্কে কিছুই করা হয়নি। জমির ক্ষমতাকেও যথোপযুক্ত ভাবে কাজে লাগানো উচিত ছিল, কিন্তু তাও অবহেলার শিকার হয়ে রয়ে গেছে।

এই অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলের সম্ভাবনাকে কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে? এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত খুবই কম, বছরের একটা সময় শুধু বৃষ্টি হয়, বাকী সময় শুকনো থাকে। নলকূপেরও ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। আর তোলা সেচ বা খাল-নালার মাধ্যমে সেচেরও অবস্থা তথৈবচ। শতকরা ৬৫ ভাগ জমি পাথুরে ও বালু যুক্ত। মোটা দানার কিছু শস্যই

এই মাটিতে হতে পারে। তাই রাঢ়ে আমাদের দু'টি জিনিস অবিলম্বে করতে হবে ছোট ছোট অনেক পুকুর, বাঁধ, সায়র তৈরী করতে হবে, আর সব নদী-জোড়-নালার দুই পাশে ব্যাপক বনসর্জন করতে হবে। রাঢ় হ'ল তরঙ্গায়িত মাটির দেশ। তাই বড় বড় জলাধার এখানে সহজে তৈরী করা সম্ভব হবে না, কিন্তু ছোট ছোট অনেক সায়র ও পুকুর তৈরী করা যাবে। ছোট ছোট পুকুরের তুলনায় বড় ও গভীর জলাধার কোনো উপকারে আসবে না। তাই এই প্রয়াসকে উৎসাহ দিয়ে লাভ নেই। তাছাড়া বড় জলাধার মানেই হ'ল জল অনেক ওপরে তুলে খাল/নালার মাধ্যমে জমিতে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করতে হবে। রাঢ়ে এই ব্যবস্থায় জলের চাপ কম হবে কেননা জল জলাধার থেকে খালের মাধ্যমে পৌঁছাবার সময়ে দেখা যাবে উঁচু নিচু পাহাড়ী জমিতে খাল বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই বড় বড় জলাধার তৈরী করতে বিশাল অঙ্কের অর্থ লগ্নী করলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। অথচ সেই একই অর্থে অনেক ছোট পুকুর ও সায়র তৈরী করা যাবে। প্রতিটির জন্যে লাখ টাকা খরচ ধরে যদি অনেক ছোট ছোট বাঁধ (check dams) তৈরী করা হয়

তা হলে দেখা যাবে যে এগুলি থেকে কোটী কোটী টাকার প্রতিদান পাওয়া যাচ্ছে।

ছোট ছোট পুকুর বা বাঁধের ক্ষেত্রে হয় কি? না, খালের অতিরিক্ত জল যা ক্ষেতের দিকে চলে যেত তা আবার জলের মূল উৎসের কাছে ফিরিয়ে এনে জলের অপচয়কে এড়ানো যায়। ছোট স্তরের সেচখালের জলকে খুব কম দূরত্বে নিয়ে যেতে হয়। তাই অধিকাংশ সময় পার্শ্ববর্তী জমিতে খুব ভালভাবে সেচ হয়ে যায়। অবশ্য অন্য সময়, যেমন বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল থাকবেই যা মূল উৎসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয় বা নদীর নিম্নাংশে ব্যবহার করতে হয়। এই ব্যবস্থায় বর্ষাকালে বন্যার মত পরিস্থিতি হলে তা প্রতিহত করা যায়। এইভাবে নদীর ওপর যে ছোট বাঁধ তৈরী হয়েছে তাকেও ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো যায়। কর্ষকদের যত্নবান হতে হবে যেন জমিতে অত্যধিক পরিমাণে অজৈব সার ব্যবহার না করা হয়। কেননা সেক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থ নদীর জলকে দূষিত করে দেবে; ফলে মানুষ, জানোয়ার, মাছ, গাছ আর পরিবেশের ক্ষতি হবে। তাই অজৈব সারের বদলে জৈব সার ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।

কোনো বৃষ্টিছায়া (rain shadow) অঞ্চলে সেচকার্য কীভাবে করা উচিত? যখন জলভরা মেঘ সমুদ্র থেকে এসে পাহাড়ে ধাক্কা মারে তখনই বৃষ্টিপাত হয়। পর্বত শ্রেণীর যে অংশটা সমুদ্রের দিকে থাকে তা প্রচুর বৃষ্টি পায়। কিন্তু উল্টোদিকে অন্তর্ভূমি (inland) কম বৃষ্টি পায়। যে অংশটা প্রচুর বৃষ্টিপাত পায় তা হ'ল বৃষ্টি– সম্মুখ অঞ্চল আর যা কম বৃষ্টি পায় তা হ'ল বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল। সমগ্র তেলেঙ্গানা এলাকা ও মহারাষ্ট্রের পুণে ও তৎসন্নিহিত অংশ বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল।

পুণে এলাকায় কীভাবে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে? এ জন্যে দু'টি প্রধান উপায় আছে। এক হ'ল, পর্বতশ্রেণীর সন্নিহিত উপকূল এলাকায় জল পাম্প করে তুলে এমন জায়গায় ফেলতে হবে যাতে তা অন্তর্ভূমি এলাকায় গড়িয়ে চলে যেতে পারে। দ্বিতীয় হ'ল, বৃষ্টি–সম্মুখ অঞ্চলের দিক থেকে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল পর্যন্ত জল নিয়ে যাওয়া। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিই সবচেয়ে সস্তা। ভালভাবে তৈরী এই ধরনের সুড়ঙ্গ একশ পঞ্চাশ বছরের মত টিকবে।

নদী

তিন ধরনের নদী হয়- বরফগলা জলে পুষ্ট নদী, বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী, আর ভূ-গর্ভস্থ জলে পুষ্ট নদী। প্রথমটির ক্ষেত্রে যখন তাপমাত্রা বাড়ে তখন নদীতে বন্যা হয়, আর বাকী দু'ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঋতু অনুযায়ী যখন ভারী বৃষ্টিপাত হয় তখন বন্যা হয়। অবশ্য তাপমাত্রা বেশী বাড়লে এই ধরনের নদী শুকিয়েও যায়।

রাঢ়ের নদীগুলি বারমাস জলে ভর্তি থাকে, না সেগুলি ঋতু নির্ভর? তারা আসলে কী বরফ গলা জলে পুষ্ট বা বৃষ্টির জলে পুষ্ট বা আর্তেশীয় জলস্তরের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তারা কী ভূগর্ভস্থ উৎস থেকে জল পায়? অনেক বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী জল-সরবরাহ পায় বর্ষাকালে, অন্য ঋতুতে নয়। মধ্য রাঢ়ের নদীগুলিও বৃষ্টির জলে পুষ্ট কিন্তু আর্তেশীয় উৎস থেকেও তারা কিছু জল পায়। আমাদের শুধুমাত্র বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদীর ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। কেননা বর্ষাকালে প্রচুর জল জমা হলেও অন্য ঋতুতে তাদের শুকিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কিছু বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী ভূ-গর্ভস্থ জলে (আর্তেশীয় উৎস) সারা বছর ধরে পুষ্ট হওয়ার যদি সুযোগ

পায়ও, তবুও সেক্ষেত্রে ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল সঞ্চয় করে রাখার সব রকম প্রয়াস করা উচিত।

চার শ্রেণীর নদী হয়- খুব ক্ষুদ্র নদী (জোড়), ক্ষুদ্র নদী, মাঝারি নদী ও বড় নদী। নদীরও আবার তিন'টে স্তর পার্বত্য স্তর, সমতল স্তর ও ব-দ্বীপীয় স্তর। কিছু নদীর ব-দ্বীপীয় স্তর থাকে না। কেননা সমুদ্রে পৌঁছানোর আগেই মাঝপথে নদী হারিয়ে যায়। মিথিলা ও মগধের ভূ-সংস্থানকে এ ব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে দেখা যাক্। মিথিলায় বর্ষাকালে প্রচুর জল বাগমতী, গণ্ডক, কোশী দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই নদীগুলির পার্বত্য স্তর নেপালে, সমতল স্তর মিথিলায় আর ব-দ্বীপীয় স্তর বাঙলায়। মিথিলায় সমতলের মাটি নরম মাটি। তাই এ নদীগুলি বার বার গতিপথ পরিবর্তন করে। এদের কোনোটারই ব-দ্বীপীয় স্তর মিথিলায় নেই। এই নদীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে মিথিলা ও বাঙলার যৌথ সহযোগিতা চাই।

মগধে কিন্তু নদীগুলির পার্বত্য ও ব-দ্বীপীয় স্তর মগধেই ব্যতিক্রম শুধু সুবর্ণরেখা যা দক্ষিণ মগধ ও উত্তর ছত্রিশগড়ের সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। মগধ ও কোশলের পারস্পরিক

সহযোগিতায় কোয়েল নদীকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বস্তুতঃ মগধ ও কোশলের অনেক সমস্যা একই ধরনের।

কোনো নদীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে বা তাকে বশে আনার জন্যে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে শক্তিশালী বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা দরকার যাতে নদীর তিনটি স্তর সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকেরা থাকবেন। এর ফলে নদী পরিকল্পনা সফলভাবে রূপায়িত হতে পারবে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কোনো দেশই নিজের ইচ্ছামত নদীর জল ব্যবহার করতে পারে না। পার্বত্য স্তর, সমতল স্তরের সঙ্গে ও সমতল স্তর ব- দ্বীপীয় স্তরের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা করে নেবে। উদাহরণস্বরূপ, নেপালের যেসব নদী ভারতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়, কিছু করতে গেলে নেপালকে তাদের সমতল স্তর ও ব-দ্বীপীয় স্তরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হবে। যদি এই তিনের মধ্যে সহযোগিতা না থাকে, যেসব নদী পার্বত্য স্তর থেকে আসছে বা ব-দ্বীপীয় স্তরে অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, তারা এক বিশাল এলাকাকে প্লাবিত করবে। মগধ সেক্ষেত্রে এক সুবিধাজনক অবস্থায় আছে কেননা তাদের নদীগুলির পার্বত্য ও সমতল স্তর মগধের মধ্যেই।

বনসর্জন

সব জলপ্রবাহের দু'টি তীরই গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত হওয়া উচিত। এর পিছনে বিজ্ঞানটা হ'ল এই যে গাছের শেকড় জলকে ধরে রাখে। যখন জলস্তর নীচে নেমে যায় তখন গাছের শেকড় ধীরে ধীরে জল ছাড়তে থাকে। তাই গাছপালা দিয়ে ঘেরা পুকুরের জল কখনই সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে না। গাছের পত্ররাজি জলের বাষ্পীভবনের মাত্রাকেও কমিয়ে রাখে। এছাড়া গাছের পাতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে যা মেঘকে আকর্ষণ করে। এইভাবে গাছ বৃষ্টিপাত বাড়াতে সাহায্য করে। মাত্র একশ বছর আগেও রাঢ় ভূমিতে বিশাল বিশাল অরণ্য ছিল। সে সময় মানভূম জেলাতে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৭০ থেকে ৮০ ইঞ্চি। এখন তা কোনো রকমে ৪০ থেকে ৪৫ ইঞ্চি মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বনরচনার যে-কোনো বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনার দু'টো দিক থাকা উচিত। প্রথম স্তরে, শীঘ্র বাড়ে এমন গাছ লাগাতে হবে। সেই গাছই নির্বাচিত করতে হবে যা ছয় মাস বা দু' বছরের মধ্যে পূর্ণ উচ্চতায় পৌঁছে যায় আর গহন সবুজ বনানী তৈরী করে দেয়। দ্বিতীয় স্তরে যেসব গাছ বর্ধিত হতে

বেশী সময় নেয় কিন্তু তারাও গহন সবুজ বনানী তৈরী করে, তাদের লাগাতে হবে। এই পদ্ধতিতে কোনো অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

নিবিড় বনসর্জন আর বিস্তৃতভাবে বনসর্জন দু'ভাবে এই কাজ করতে হবে। সবচেয়ে ভাল উপায় হ'ল শীঘ্র ৰাড়ে ও ধীরে ৰাড়ে এই দু'ধরনের গাছই একসঙ্গে লাগানো। শুধুমাত্র ধীরে বাড়ে এমন গাছ লাগানোটা আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক হবে না। কেননা আশানুরূপ ফল পেতে গেলে ৩০, ৫০, ৭০ বা ১০০ বছরও অপেক্ষা করতে হতে পারে। আর শীঘ্র বাড়ে শুধু সেই ধরনের গাছ লাগালেও তা থেকে কোনো দীর্ঘকালীন সুফল পাওয়া যাবে না। তাই অবিলম্বে নিবিড়ভাবে ও বিস্তৃতভাবে, এই দুইভাবে বন রচনার কাজ করতে হবে। পূর্ণত্বে পৌঁছানোর পরেই বাছাই করে গাছ কাটা উচিত আর তা বিক্রয় করা উচিত।

পুকুর-বাঁধ-খাল-সায়র বা জলাশয়ের পাড়েও বন রচনা করা উচিত। যেমন, এ সব স্থানে বাবুল বা খয়ের গাছ লাগানো যেতে পারে। এদের মাঝখানে লাগানো যেতে পারে বকফুল। আবার তাদের মাঝখানে লাগানো যেতে পারে

ভারতীয় প্রজাতির শাল। এর কারণ হ'ল বকফুল খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে ও পাঁচ বছরেই দীর্ঘ বৃক্ষে পরিণত হয়। কিন্তু ৰাবুল বাড়তে এর থেকে বেশী সময় নেয়। শাল গাছ বাড়ে ধীরে। কিন্তু অনেক দিন বাঁচে। এই ভাবে বকফুলের গাছ তাড়াতাড়ি বড় হয়ে সেগুলি মেঘকে আকর্ষণ করে বৃষ্টিপাত ঘটাবে ও অন্য গাছকেও বাড়তে সহায়তা করবে। তারপর পাঁচ-ছয় বছরে সেই গাছগুলি পূর্ণত্বে পৌঁছলে কেটে ফেলা যাবে। কিন্তু ততক্ষণে শালের এক গভীর বন তৈরী হয়ে যাবে।

এই গাছগুলির আবার অন্যদিক থেকেও উপযোগিতা আছে। যেমন বকফুলের পাতা গোরুর দুধ বাড়ায়। আবার এর পাতা বা কাণ্ড থেকে সুতোও তৈরী করা যায়। শালগাছ বৃষ্টিপাত বাড়ায় আর গোড়ায় জল ধরে রাখে। এর ফুল থেকে প্রচুর পরিমাণে মধু পাওয়া যাবে। পাতা থেকে পত্রথালি তৈরী করা যাবে। রস থেকে আঁঠা তৈরী হবে যা ধূপবাতি শিল্পে ব্যবহৃত হবে। আর গাছে অ-তুঁত রেশমের চাষ হবে যা থেকে তসর সিল্ক পাওয়া যাবে। এর ৰীজ মানুষের খাদ্য যা গরীব লোকেরা খায়। আর শালের মধুর ঔষধীয় গুণ থাকায় আর্থিক

দিক দিয়ে মূল্যবান, কেননা তা রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে বিদেশী মুদ্রা আনতে পারবে। যদি প্রয়োজন হয় শালের মাঝখানে পিয়াশালও লাগানো যেতে পারে। এইভাবে ধাপে ধাপে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

বিজ্ঞানসম্মত ভাবে শস্য উৎপাদন, জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ। যেমন বার্লির ক্ষেতের থেকে শাকসব্জির ক্ষেতে বেশী জল লাগবে। যদি দুই ধরনের ক্ষেত পাশাপাশি থাকে তা হলে তরকারীর ক্ষেত মোট সেচের জলের ৭৫ ভাগ জল টেনে নেবে। বাকী পঁচিশ ভাগ জল যদি বার্লি ক্ষেতের দিকে বইয়ে দেওয়া হয় তাহলে ওই ক্ষেতের সেচের জন্যে সেই জল হবে যথেষ্ট। বার্লি ফসলের জন্যে আলাদা কোনো সেচের ব্যবস্থা রাখার দরকার পড়বে না।

ফলের গাছ গোড়ায় যথেষ্ট জল ধরে রাখতে পারে। তাই নদীর দুই ধারে আর শস্য ক্ষেতের কাছে ফলের গাছ লাগানো উচিত। এতে জল সংরক্ষণের সুবিধা হবে। আনন্দনগরে ফসল কাটা হয়ে গেলে জমির জল অলকানন্দা (আলকুশি) ও পরাগতির (পরগো) জোড়ে গিয়ে পড়ে। এতে ক্ষেত শুকিয়ে যায়, অল্প দিন পরে জোড়ও শুকিয়ে যায়। কেননা জমি থেকে

চোঁয়ানো জলের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এ সমস্যা সমাধানের জন্যে জোড়ের ধারে ফলের গাছ লাগানো উচিত। ফলগাছের গোড়ায় সঞ্চিত জল মাটিকে সরস ও উর্বর করে রাখবে। এটা দেখতে হবে যাতে ফল গাছের শাখা-প্রশাখা শস্যের ক্ষেতে সূর্যরশ্মিকে না আটকে দেয়। যদি এ নিয়ম মেনে চলা হয় তাহলে ফসল কাটার পরে জমি জলহীন হয়ে পড়লেও জোড়ে কিন্তু জলের প্রবাহ বজায় থাকবে। যদি নদীর দু'ধারে ফল গাছ লাগানো হয় তাহলে সেগুলি জল সঞ্চিত করে রাখবে।

বুদ্ধিহীন ও লোভী মানুষেরা নদীর দু'পাড়ের সব গাছই কেটে ফেলেছে। তাই এখন অনেক নদী মৃতপ্রায়। কে বিশ্বাস করবে যে আজ থেকে একশ পঞ্চাশ বছর আগেও বাংলার ময়ূরাক্ষী নদীতে বড় বড় নৌকা চলাচল করত? আজ ময়ূরাক্ষী এক ছোট নদী, কেবল বর্ষাকালে ছোট নৌকো নদীর বুকে চলাচল করে। নদী তীরের সব বন নিশ্চিহ্ন। বনের বড় বড় গাছ তাদের গোড়ায় যে জল ধরে রাখে তা নিয়ন্ত্রিত ভাবে তারা ছাড়ে বলে নদীর নাব্যতা বজায় থাকে। এখন তোমরা অরণ্যের গুরুত্ব ও উপযোগিতা বুঝতে পারলে তো? ময়ূরাক্ষী নদীর ধার ঘেঁসে কটাসু গ্রামে আমি একবার পুরনো

জাহাজের মাস্তুলের টুকরো খুঁজে পেয়েছিলুম। এতে প্রমাণিত হয় যে এক সময় এই নদীর ওপর দিয়ে বড় বড় জাহাজ চলাচল করত। আমি দামোদর নদীর তীরেও এমন জিনিস দেখেছি। অরণ্য ধ্বংস করার ফলে এই নদীগুলি শুকিয়ে আসছে, তাই বৃষ্টিপাতও গেছে কমে।

আমাদের জল-সংরক্ষণ পরিকল্পনার মূল ভাবধারা হ'ল এই যে, ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলের বর্তমান পরিমাণকে অবিলম্বে বাড়িয়ে দ্বিগুণ করতে হবে। তবে সবচেয়ে ভাল হয় তা যদি দশ গুণ বাড়ানো যায়। এর জন্যে শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল জল সংরক্ষণের জন্যে এক বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা নেওয়া যা জল ভাণ্ডার তৈরী বা সেই সংক্রান্ত ব্যবস্থার গভীরতা ও পরিধি বা দুই-ই বাড়িয়ে দেবে। প্রথম পদক্ষেপ হ'ল, ওইসব পুকুর, বিল, বাঁধ, সায়র, নদী আর বড় জলাধারের যা বর্তমানে জলসঞ্চয়ের জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে- তার গভীরতা বাড়িয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হ'ল এই স্টোরেজের (জলভাণ্ডার) সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকা বাড়িয়ে দেওয়া। আর তৃতীয় পদক্ষেপ হ'ল এদের চারিপাশে গাছের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে ৰাড়িয়ে চলা। এই নোতুন গাছ লাগানোকে দশ গুণ কীভাবে করা যাবে? এ জন্যে প্রত্যেক স্টোরেজ

ব্যবস্থার চারপাশে গাছের সারি পাঁচ গুণ করে দিতে হবে আর প্রতিটি গাছের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমিয়ে অর্ধেকের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এর অতিরিক্ত অনেক ছোট ছোট পুকুর, বাঁধ, বিল, সায়র ও জলাধার তৈরী করতে হবে। একটা সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হবে যে ভূ-গর্ভস্থ জলের তুলনায় ভূ-পৃষ্ঠের জলের ব্যবহারকে বেশী প্রাধান্য দিতে হবে।

তুমি আগে নিজেকে তৈরী কর। জ্ঞানের পরিধি বা পরিক্ষেত্র বাড়ানো বা জ্ঞানের বিস্তার নিজেকে নিয়ে শুরু করতে হয়। মানবতা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি জান তুমি কে, আর পৃথিবীর মানুষ তোমার কাছে কী আশা করে। আজকের পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান তোমাকেই করতে হবে। তোমরা বিস্তারিত ভাবে কাজের পরিকল্পনা তৈরী করে নাও আর সেই অনুযায়ী কাজে লেগে যাও। তোমাদের পথ প্রদর্শক হতে হবে।

২৫ মার্চ ১৯৮৯, কলিকাতা

বিশ্বের লিপি ও ভাষা সম্পর্কিত এক পর্যবেক্ষণ

[ব্রহ্মচক্রে] বিভিন্ন বিন্দুগত অস্তিত্ব রয়েছে (বিন্দুর নির্দিষ্ট অবস্থান আছে কিন্তু কোনো বিস্তার নেই)। আবার তাদের মধ্যেকার চিতিশক্তির যে চিন্ময় প্রবাহ তাতেই উদ্ভুত হচ্ছে অসংখ্য বুদ্বুদ। এই বুদ্বুদগুলিই হচ্ছে ভাব বা idea। পরম সত্তা থেকে উৎসারিত এই ভাবের বুদ্বুদ যখন অণু আমিত্ব-বোধকে (Unit-I) স্পর্শ করে তখন ভূমাসত্তার নৈকট্য নিবন্ধন সৃষ্ট হয় Unit-idea বা অণুভাব। এই অণুভাব ভুমাভাবেরই প্রতিফলন বা প্রতিসরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন অণুভাব অণুসত্তার সঙ্গে সম্বন্ধিত হয় তখন অণু আমি-বোধ মানস-শারীরিক অস্তিত্বের মাধ্যমে নিজেকে অভিব্যক্ত করার চেষ্টা করে। স্বরযন্ত্রের (Vocal cord) সামর্থ্য ও [নির্দিষ্ট গ্রন্থি থেকে] হরমোন-ক্ষরণের পরিমাণ অনুযায়ী অণুসত্তা নিজের ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করে। অণুভাবের এই প্রতিফলন বা

প্রতিসরণ (reflection or refraction) দুই ভাবেই হয়। অভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তিকে বলি inner voice আর বাহ্যিক অভিব্যক্তিকে বলি outer voice-এই দুই অভিব্যক্তির সামবায়িক নামই হচ্ছে ভাষা।

অবয়ব, জলবায়ু, পরিবেশ ও জনগোষ্ঠীগত বৈচিত্র্যহেতু বিভিন্নভাবে ভাষার অভিপ্রকাশ ঘটে। এই কারণেই বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব হয়েছে। [ভূমা] ভাবের প্রতিফলিত বুদবুদ হিসেবে বিশ্বের ভাষা এক ছিল, এক আছে ও চিরকাল একই থাকবে। অভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তি অর্থাৎ inner voice-এর ক্ষেত্রে ভাষা এক ও অবিচ্ছেদ্য। কেবল outer voice-এর ক্ষেত্রেই বহু ভাষার অবস্থিতি। তাই বহিরঙ্গিক বিশ্বে ভাষাগত বিভিন্নতার কিছুটা তাৎপর্য রয়েছে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ জগতে এই বিভিন্নতা কোনো অর্থ, তাৎপর্য বা মূল্য বহন করে না।

সমগ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠী রয়েছে। নিম্নলিখিত বিচারধারার ভিত্তিতে এই বিভিন্ন জনগোষ্ঠী-কথিত ভাষাগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

(১) ফরাসি ও সংস্কৃত ভাষার মত যেসব ভাষায় কর্তার বচন ও লিঙ্গ অনুযায়ী ক্রিয়াপদ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

(২) ইংরেজী ভাষার মত যেসব ভাষায় কর্তার লিঙ্গ ভেদে ক্রিয়াপদ পরিবর্তিত হয় না ঠিকই কিন্তু বচন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ- 'হেনরী ইজ কামিং' ও 'হেনরিয়েটা ইজ অলসো কামিং', কিন্তু 'হেনরি এ্যান্ড হেনরিয়েটা আর কামিং'। এখানে কর্তা পুরুষ বা স্ত্রী যাই হোক, ক্রিয়াপদ অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু কর্তা একাধিক হলেই ক্রিয়াপদ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

(৩) মৈথিলী ও ভোজপুরী ভাষার মত কিছু ভাষায় কর্তার বচনভেদে ক্রিয়াপদ অপরিবর্তিত থাকলেও লিঙ্গভেদে তা পরিবর্তিত হয়। ভোজপুরীতে ক্রিয়াপদ পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত নয়। যেমন-ইংরেজী 'ইউ'-এর পুং রূপ 'তু গইল', কিন্তু স্ত্রী- রূপ 'তু গইলু'। বাংলার মত কিছু কিছু ভাষায় ইংরেজী 'be' ক্রিয়াপদের কোনো ব্যবহার থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, 'হি ইজ এ গুড বয়'-এর বাংলা হচ্ছে 'সে ভাল ছেলে'। এখানে is (ইজ)-এর বাংলা ভাষান্তর (হয়) [অধিকাংশ ক্ষেত্রে] উহ্য থাকে।

ভারতের ভাষাসমূহ

সুপ্রাচীন ভারতে অস্ট্রিক, নিগ্রো ও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী বসবাস করত। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ঘনবসতিপূর্ণ ছিল। দক্ষিণ রাশিয়ার মধ্যাঞ্চল থেকে ককেশিয়রা ভারতে এসেছিল। সেজন্যে বলা যেতে পারে যে, দক্ষিণ রাশিয়ার মধ্যাঞ্চলের আর্য-রক্ত এসে ভারতের রক্তের সঙ্গে মিশেছিল। ভারতের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে আর্য রক্তের সংমিশ্রণ কম হয়েছিল, বেশী সংমিশ্রণ হয়েছিল উত্তর ও পশ্চিম ভারতে। যে সমস্ত আর্য ভারতে এসেছিল তারা বিকৃত বৈদিক ভাষায় কথা বলত। সেই ভাষাই অস্ট্রিক, নিগ্রো ও মঙ্গোলীয়দের সংমিশ্রণে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। অস্ট্রিক, নিগ্রো ও মঙ্গোলীয়দের ভাষার সঙ্গে যেহেতু বৈদিক ভাষার সংমিশ্রণ হয়েছিল, তাই তাদের ভাষাতে বৈদিক শব্দের ছড়াছড়ি।

মালয়ালাম ভাষার মত অবৈদিক ও অস্ট্রিক-নিগ্রো সঞ্জাত ভাষার সঙ্গে জন্মসূত্রে বৈদিক ভাষার কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তাদের শব্দভাণ্ডারের ৭৫% শব্দই সংস্কৃত ও বৈদিক ভাষা। বাংলা ভাষা-অস্ট্রিক-নিগ্রো-মঙ্গোলীয় সঞ্জাতভাষা হলেও এতে ৯২% সংস্কৃত শব্দ রয়েছে। পঞ্জাবী ভাষা সরাসরি বৈদিক

ভাষা সঙ্গাত। এতে ৮০% তদ্ভব বৈদিক বা বিকৃত বৈদিক শব্দ রয়েছে। পারস্য ও তুরস্কের কাছাকাছি থাকায় পঞ্জাবী ভাষার মধ্যে পারসিক ও তুর্কী শব্দও রয়েছে। সমস্ত দেশ জুড়েই যেমন সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হয়েছিল, ঠিক তেমনই আদান-প্রদান হয়েছিল ভাষার ক্ষেত্রেও।

সংস্কৃত ভাষায় চার ধরনের স্থানীয় উচ্চারণ রীতি রয়েছেঃ (ক) গৌড়ীয়, (খ) কাশিকা, (গ) মহারাষ্ট্রীয়, (ঘ) দক্ষিণী। কোনো বিশেষ ভাষার বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণ রীতি থাকতে পারে যা এমনকি জেলায় জেলায় পরিবর্তিত হয়। বিহারের ভাষা সমূহের ও উত্তর প্রদেশের কয়েকটি ভাষা তাদের অঞ্চলেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। দেউরিয়া ও গোরক্ষপুরে যে ভোজপুরী ভাষা চলে তাকে তরাই ভোজপুরী বলা হয়। ভোজপুরের ভোজপুরীকে গঙ্গার ভাটি অঞ্চলের ভোজপুরী, আর গোপীগঞ্জের পূর্বদিকের ভোজপুরীকে উজানিয়া অঞ্চলের ভোজপুরী বলা হয়। এই দুই অঞ্চলের ভোজপুরী ভাষার মধ্যেও পার্থক্য আছে। গোপীগঞ্জের পুব দিকে ভোজপুরী ভাষা চলে আর পশ্চিমে চলে বাঘেলী ভাষা। ৫০০ বছর অগে পর্যন্ত যে ডোগরী ভাষার বিকাশ হচ্ছিল তা কাশ্মীরি

ব্রাহ্মণদের নিঃশব্দ বিরোধিতার ফলে অসম্পূর্ণ থেকে গেল। সে সময়ে কশ্মীরে উর্দু ভাষার প্রভাবও ছিল।

সংস্কৃত ভাষার গৌরবময় যুগেও এখনকার মতই অন্যান্য ভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি। সংস্কৃতকে বলা হত 'ভাষা', আর জনগণের মুখের ভাষাকে 'ভাখা' বলে অপবাদ দেওয়া হত। সংস্কৃত আর জনগণের মুখের ভাষার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে বলা যায় যে, সংস্কৃত ছিল বদ্ধ জলাশয় আর জনগণের ভাষা ছিল বহতা নদীর মত। 'বারনাকুলার' (vernacular) মানেও ক্রীতদাসের ভাষা। জনগণের ভাষাকে মর্যাদা দেবার জন্যে যা করণীয় তা তোমাদের করতে হবে।

যে সমস্ত ভাষা একই উৎস থেকে সৃষ্ট হয়েছে তাদের মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকে। মাগধী প্রাকৃতের কথাই ধরা যাক্। পূর্বী অর্ধ-মাগধী থেকে উদ্ভূত বাংলা ও মৈথিলী ভাষার উদাহরণ নেওয়া যাক্। এই দুই ভাষায় বর্তমান কালে 'চ', 'ছ' ব্যবহৃত হয়-বাংলায় 'আমি যাচ্ছি' আর মৈথিলীতে 'হম্ যাইছি'। অতীতকালের ক্ষেত্রে 'ল' ব্যবহৃত হয়-বাংলায় 'সে গেল', মৈথিলীতে 'হমে গইল'। ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে 'ব' ব্যবহৃত

হয়-বাংলায় 'আমি যাব', মৈথিলীতে 'হম যাএব' ওড়িয়াতেও 'মু যিবি'। পশ্চিমী অর্ধ-মাগধী ভাষাসঞ্জাত মগহী, ভোজপুরী, নাগপুরিয়া। ছত্তিসগড়িতে আবার অন্যরকম। বর্তমানকালে 'চ' ব্যবহৃত হয় না- [ভোজপুরীতে] 'হম্ যা রহল বানি' ইত্যাদি। অতীতকালের ক্ষেত্রে 'ল' ব্যবহৃত হয়-'গইল' 'গইলী'/'গইলু' ইত্যাদি। আর ভবিষ্যতে কালে 'ব' ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কেবল বর্তমান কালের ক্ষেত্রে পূর্বী অর্ধ-মাগধী ও পশ্চিমী অর্ধ-মাগধীতে পরিবর্তন হচ্ছে। যদি কেউ ভাষা বিজ্ঞান ও উচ্চারণ রীতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে চান, তাঁকে এইসব বিশেষত্ব খুবই সযত্ন প্রয়াসে জানতে হবে।

লিপির গড় আয়ু সাধারণতঃ ২০০০ বছর, আর ভাষার গড় আয়ু ১০০০ বছর। এই সময়কালের পর তাদের মধ্যে পরিবর্তন এসে যায়। বৈদিক ও সংস্কৃত একই ভাষা নয়। আর্যদের ভাষা ছিল বৈদিক; আরও সঠিকভাবে বললে- ঋগ্বেদীয়। সংস্কৃত ভারতের নিজস্ব ভাষা। [বৈদিক ও ভারতের জনভাষাকে সংস্কার করে নিয়ে সংস্কৃত ভাষা তৈরী হয়েছিল]। সংস্কৃতের 'মম', 'অস্মাকম' ও 'নঃ' বৈদিক ভাষায় যথাক্রমে 'মে', 'নো' ও 'নঃ'। 'দিস ইস মাই হাউস'-এর সংস্কৃত হচ্ছে

'ইদম্ অস্মাকম্ গৃহমস্তি'; বৈদিক ভাষায় এর ভাষান্তর- 'যেতদ্ নঃ ধাম' আর রাশিয়ান ভাষায়-'তদ নস্ ধাম'। রাশিয়ান ভাষার সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতের খুবই মিল আছে। স্থান, কাল ও পাত্রের পরিবর্তনে বৈদিক ভাষায় কিছু কিছু পরিবর্তন এসে গেছে।

দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলি অস্ট্রিক-নিগ্রো জাত। কিন্তু লিপি আর্য-ভারতীয় (যেমন ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি)। উদাহরণ হিসেবে তেলেগু ও কন্নড় ভাষাকে ধরা যেতে পারে। উভয় ভাষাতেই ৮০% শব্দ সংস্কৃত। যদিও তিব্বতী ও মঙ্গোলীয়রা জাতিগতভাবে ভারত-তিব্বতীয় বংশোদ্ভূত কিন্তু তাদের লিপি আর্য-ভারতীয়। অর্থাৎ একই কিন্নৌর ও লাদাখে একই ধরনের লিপি। পাঞ্জাবী ও সিন্ধী ভাষার সংমিশ্রণে প্রায় ৩০০০ বছর আগে মুলতানি ভাষার উদ্ভব হয়েছিল। পাহাড়ী পাঞ্জাবীতে যেখানে সম্বন্ধ কারকে 'দ', 'দী' ও 'দে' ব্যবহৃত হয়, সেখানে মাড়োয়ারী ভাষায় 'রা', 'রী' ও 'রে' ব্যবহৃত হয়।

ভারতের সাতটি জন-ভাষা প্রাকৃতভাষা নামে খ্যাত। পূর্বভারতের জনভাষাকে মাগধী প্রাকৃত বলা হত। (ভারত

অনেকগুলি রাজ্যের সমাহার ছিল। মগধ ছিল তাদেরই মধ্যে একটি)। মাগধী প্রাকৃতের বিশেষত্ব হচ্ছে তিনটি 'স' (অর্থাৎ 'শ', 'য' ও 'স')-এর পরিবর্তে কেবল একটি 'স'-অর্থাৎ 'স' উচ্চারিত হয়। মধ্যোত্তর ভারতের জনগণের ভাষা ছিল শৌরসেনী প্রাকৃত। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী রাজ্য শুক্রসেনের প্রাচীন নাম ছিল 'ব্রহ্মাবর্ত্ত'। মহাভারতের কালে একে 'শুরসেন' বলা হত। রাজধানী ছিল মথুরা। পাঠান ও মুঘল যুগে একে 'দোআব' বলা হত-যার অর্থ 'দুই নদীর মধ্যবর্তী' স্থান। শৌরসেনীর পশ্চিমে চলত পৈশাচী প্রাকৃত, তারও পশ্চিমে চলত পাশ্চাত্য প্রাকৃত। সিন্ধু ও বালুচিস্তানের ভাষা ছিল সৈন্ধবী প্রাকৃত। মধ্যপ্রদেশের উত্তরে রাজস্থানের ও গুজরাটের ভাষা ছিল মালবী প্রাকৃত। মহারাষ্ট্রে, গোয়ায় ও কর্ণাটকের কিছু অংশের ভাষা ছিল মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত। প্রাকৃত ভাষা ছিল একান্তই ঘরোয়া ভাষা। অর্থাৎ তা চলতো কেবল ঘরের মধ্যে। প্রাকৃত ভাষাও আরও বদলে গেল। মাগধী প্রাকৃত দু'ভাগ হয়ে হ'ল পূর্বী অর্ধ-মাগধী ও পশ্চিমী অর্ধ-মাগধী। পশ্চিমী অর্ধ-মাগধী থেকে সৃষ্ট হ'ল ছত্তিশগড়ী, নাগপুরী, ভোজপুরী ও মগহী ভাষার। আর পূর্বী অর্ধ-মাগধী থেকে এল অসমীয়া,

বাংলা, অঙ্গিকা ও মৈথিলী ভাষাসমূহ। এই নয়টি ভাষাই এল মূল মাগধী প্রাকৃত থেকে। বুদ্ধদেব যে পালি ভাষায় তাঁর ধর্মোপদেশ দিতেন তা আসলে মাগধী প্রাকৃত। 'পল্লী' মানে গ্রাম, আর 'পালি' মানে গ্রামের মানুষের ভাষা। শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে এসেছিল অবধী, বুন্দেলী, বাঘেলী, ব্রজভাষা ও হরিয়ানবী। হরিয়ানবী (এতে পারসিক ও তুর্কী শব্দ প্রচুর) থেকে এসেছে 'উর্দুভাষা [উর্দু ভাষাতে আরও কয়েকটি ভাষার সংমিশ্রণ আছে]। যারা মিলিটারী পোষাক বা 'বর্দি' পরে তাদের মুখের ভাষা হিসেবে 'উর্দু' ভাষার উদ্ভব। পৈশাচী প্রাকৃত থেকে এসেছে পস্তা, কাশ্মীরি, তাজাকী, কুরদিস ও দক্ষিণ রাশিয়ার ভাষা সমূহ। সৈন্ধবী প্রাকৃত থেকে এসেছে সিন্ধি, বালুচ ও ব্রাহুই (ব্রোহী) ভাষা। শেষের দু'টি ভাষা (অর্থাৎ বালুচ ও ব্রোহী) আর্য-ভারতীয় ভাষা নয়-দ্রাবিড়ীয় ভাষা। মালবী প্রাকৃত থেকে অনেক ভাষার উৎপত্তি হয়েছে যা ভোপাল, বিদিশা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের কথিত ভাষা যেমন-গুজরাতী, মালবী, কচ্ছী।

পশ্চিমী মালবী প্রাকৃত থেকে মাড়োয়ারী, মেওয়ারী, হরৌতি, ঢুন্চারু ও মেওয়াতি ভাষার প্রচলন হ'ল। মহারাষ্ট্রীয়

প্রাকৃত থেকে এল মারাঠী (বিদর্ভের ভাষা 'বঢ়াড়ি', পুণে অঞ্চলের ভাষা 'দেবস্থ') ও 'কোঙ্কনী'। পৈশাচী প্রাকৃতে dipthongs-এর ব্যবহার নেই বললেই চলে। পাশ্চাত্ত্য প্রাকৃতে–যেমন পদম্পোষ শব্দে–dipthongs কখনো কখনো দেখা যায়। পাহাড়ী পাঞ্জাবী ও পূর্বী ডোগরীর মিশ্রণ হ'ল কুলু অঞ্চলের ভাষা।

আমি আগেই বলেছি যে বিশ্বের সমস্ত ভাষাই এক, আর তার মধ্যে তুমি জান মাত্র পাঁচ, সাত বা দশটি ভাষা। মাতৃভাষার অবদমনের ফলেই মানব ভাবপ্রবণতা তথা মানবিক অভিপ্রকাশ অবদমিত হয়। ব্যাপারটা শুধু মন্দই নয়–ঘৃণ্য।

ভারতের লিপিসমূহ

প্রাচীন ভারতে দু'ধরনের লিপি অর্থাৎ ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির প্রচলন ছিল। এই দু'ধরনের লিপিই ভারতের প্রথম মুসলমান রাজার রাজত্বকালে ছাগলের চামড়ার ওপর লেখা অবস্থায় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মী লিপি লেখা হত বাম থেকে ডানদিকে, আর খরোষ্ঠী ডানদিক থেকে বামদিকে।

পরবর্তীকালে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপি বিবর্তিত হয়ে যায়। ব্রাহ্মী লিপি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে সারদা, নারদা ও কুটিলা লিপিতে পর্যবসিত হয়। সারদা লিপির প্রচলন ছিল প্রয়াগের (বর্তমান এলাহাবাদের) উত্তর-পশ্চিম দিকের জনগণের মধ্যে, আর নারদা লিপির প্রচলন ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। এই লিপি দু'টিই ইংরেজীর মত বাঁদিক থেকে ডানদিকে লেখা হত। প্রয়াগ ছিল সারদা ও নারদা লিপির সঙ্গমস্থল। কুটিলা নামে পরিচিত আর একটি নোতুন লিপির উদ্ভব হ'ল-যেহেতু কৌসাম্বী অঞ্চল থেকে প্রকৃতপক্ষে এই লিপির উদ্ধৃতি সেইহেতু এই লিপির অপর নাম ছিল কৌসাম্বী লিপি। যেহেতু রাজা শ্রীহর্ষের সিলমোহরে এই লিপি ব্যবহৃত হয়েছিল সেইহেতু এই লিপি শ্রীহর্ষলিপি নামেও পরিচিত হয়েছিল। এলাহাবাদের পূর্বদিকে এই লিপি প্রচলিত ছিল।

নাগর ব্রাহ্মণদের প্রভাবে নারদা লিপির অপর নাম হয়ে গিয়েছিল নাগরী লিপি। গুপ্তযুগের পর এলাহাবাদের পূর্বাংশে কিছু অঞ্চলে কান্বকুব্জ ব্রাহ্মণদের প্রভাব কমে যাওয়ায় ও নাগর ব্রাহ্মণদের প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় কুটিলা লিপির থেকে নারদা লিপির ব্যবহার বেড়ে গেল। কাশীর [বারাণসীর]

পণ্ডিতবর্গ আগে কুটিলা লিপিতে লিখতেন কিন্তু নাগর ব্রাহ্মণদের প্রভাব বেড়ে যাওয়ায়, নাগরী লিপিই কুটিলা লিপির স্থান অধিকার করে নিল। কুটিলা লিপি শুধু ভারতের পূর্বাঞ্চলে ব্যবহৃত হতে থাকল। হর্ষবর্দ্ধনের সময়কালে কুটিলা লিপির প্রচলন বেশী ছিল। তাই সেই সময়কার শিলালিপি ও তাম্রলিপি সমূহ কুটিলা লিপিতে খোদিত হয়েছিল। নাগরীলিপি এল গুপ্তযুগের পরে। মুঘল যুগে কায়স্থরা নাগরীর বিবর্তিত লিপিতে সরকারী নথিপত্র লিখত। যেহেতু কায়স্থরা এই লিপিতে লিখত তাই এই লিপির নাম হয়ে গেল কায়থী লিপি। উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে ও বিহারে এই লিপি প্রচলিত ছিল। ভোজপুরী ভাষা এই লিপিতে লেখা হত। মুঘল রাজত্বের সরকারী ভাষা ছিল উর্দু। কায়থী লিপিতে কোনো যুক্তাক্ষর ছিল না। ব্রিটিশ যুগে আদালতে এই লিপি ব্যবহৃত হত। কায়থী লিপির সঙ্গে গুজরাতী লিপির খুবই মিল ছিল, ৭০/৮০ বছর আগেও তার ব্যবহার ছিল। যখন আগ্রা, অবধ ও রোহিলাখণ্ড মিলিত হয়ে আগ্রা ও অবধ সংযুক্ত প্রদেশ হ'ল তখনই আদালত থেকে কায়থী লিপি অন্তর্হিত হ'ল, আর তার জায়গায় এল উর্দু লিপি।

সারদা বা সারস্বত লিপির কয়েকটি বিভাজন ছিল। কাশ্মীরে ব্যবহৃত হত কাশ্মীরি সারদা, দ্বিগর্তভূমিতে (জম্মু) ব্যবহৃত হত ডুঙ্করদেশীয় সারদা, হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে টেড়ি/টেড়ি বা টেংড়েই, লাদাখী ও সপ্তসিন্ধুতে ব্যবহৃত হত পাঞ্জাবী সারদা। পরবর্তীকালে পঞ্জাবে শিখগরু অর্জনদেব গুরুমুখি লিপির প্রবর্তন করেন। পার্সি লিপিরও বহুল প্রচলন ছিল। পাঞ্জাবীতে বহু তদ্ভব শব্দ ব্যবহৃত হয় যাতে যুক্তাক্ষর নেই। সেজন্যে পাঞ্জাবী ভাষায় 'স্কুল' ও 'স্টেশন' শব্দ দু'টি যথাক্রমে 'সকুল' ও সটেশন' হিসেবে উচ্চারিত ও লিখিত হয়। পরবর্তীকালে পাঞ্জাবী সারদার বিবর্তিত রূপ হিসেবে লানদেই লিপির প্রচলন হয় ও সিন্ধের (ব্যবসায়ী) লোকেরা এই লিপিতেই লিখতে থাকে।

জম্মু ও কশ্মীর হিন্দু রাজ্য ছিল। রণবীর সিং সেখানে ডোগরী লিপিকে জনপ্রিয় করতে চেয়েছিলেন। সেই সময় হিন্দু প্রভাবিত রাজ্যে কেবল ব্রাহ্মণ ও সান্ধিবিগ্রাহিকরাই (কায়স্থরা) মন্ত্রী হতে পারত। রাজ্য যেহেতু সকলের জন্যেই সেজন্যে এই নিয়ম ঠিক নয়। জম্মু ও কশ্মীরের ব্রাহ্মণরা কাশ্মীরি সারদা লিপিকে পছন্দ করল। তাদের প্রভাবের

কারণেই জম্মু ও কশ্মীরে ডোগরী লিপি গৃহীত হ'ল না। পরবর্ত্তীকালে কশ্মীর অঞ্চলে অবশ্য উর্দু ব্যবহৃত হতে থাকে।

বাংলা ও অসমীয়া বই ও কোষ্ঠী দুইই শ্রীহর্ষ লিপিতে লেখা হয়, কিন্তু মিথিলায় কোষ্ঠী লেখা হয় শ্রীহর্ষ লিপিতে, আর বই লেখা হয় নাগরী লিপিতে। কাশ্মীরে কোষ্ঠী লেখা হয় সারদা লিপিতে। প্রাচীনকালে পঞ্জাবে কোষ্ঠী ও বই লেখা হত পাঞ্জাবী সারদা লিপিতে অর্থাৎ সপ্তসিন্ধু সারদায়। কিন্তু এখন কোষ্ঠী লেখা হয় পাঞ্জাবী সারদায় আর বই লেখা হয় গুরুমুখী লিপিতে।

ওড়িয়া লিপি তালপাতায় লোহার কলমে লেখা হত। লোহার কলমের খোঁচায় তালপাতা যাতে ছিঁড়ে না যায় সেজন্যে অক্ষরগুলিকে গোল করে লেখা হত। বাংলায় কিন্তু কোণাচে অক্ষরেই লেখা হত। কিন্তু শিলালিপিগুলি কোণাচে (an- gular) ভাবে অথবা উৎকলীয় ভাবে লেখা হত। আর শ্রীহর্ষ লিপি কোণাচে ভাবে বা গৌড়ীয় ভাবে লেখা হত।

সারদা বলতে বোঝায় বুদ্ধি বা বুদ্ধিমত্তা। কশ্মীরের বুদ্ধিজীবীদের লিখিত লিপিকে বলা হত সারদা লিপি। বেদের শ্লোকগুলি যখন তৈরী হয় তখন সেগুলি গুরু থেকে শিষ্য

পরম্পরায় স্মৃতিতে রাখার ব্যবস্থা করা হত। যেহেতু সে সময় লিপি আবিষ্কৃত হয়নি সেইহেতু বেদ লিখিত রাখাও সম্ভব ছিল না। বেদকে সেজন্যে বলা হয় শ্রুতি (ঋগ্বেদের সময় লিপি ছিল না)। বেদকে লিখিত রূপ না দেওয়া একটা কুসংস্কারে দাঁড়িয়েছিল, আর এই কুসংস্কারের কারণে বেদের অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও কশ্মীরের পণ্ডিতরাই সর্বপ্রথম সারদা লিপিতে বেদ লিখে ফেলেন। তাঁরা অথর্ব বেদ লিখেছিলেন।

এলাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে কচ্ছের রাণ পর্যন্ত, বম্বের উত্তর পর্যন্ত নারদা লিপি ব্যবহৃত হত। যেহেতু গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণরা এই নারদা লিপির আবিষ্কর্তা, সেজন্যে এই লিপিকে নাগরী লিপি বলা হত। এই ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত ভাষা (যাকে দেবভাষা বলা হত) নাগরী লিপিতে লিখতেন বলে সেই লিপির নাম হ'ল দেবনাগরী লিপি। এইভাবে দেবনাগরী লিপি গুজরাট থেকে এসেছিল- উত্তরপ্রদেশ থেকে নয়। গুজরাটী লেখা হয় অক্ষরের ওপর কোনো মাত্রা না দিয়ে খুবই সরল ভাবে। যখন এই লিপিতে সংস্কৃত লেখা হ'ল, অক্ষরের

ওপর মাত্রা দেওয়া হ'ল। এই ধরনের মাত্রাযুক্ত লিপিই নাগরী লিপির একটি বিশেষ রূপ যা দেবনাগরী লিপি নামে পরিচিত হ'ল।

এলাহাবাদের পূর্বদিকে কুটিলা লিপি ব্যবহৃত হত। যেহেতু এই কুটিলা লিপিতে জটিল যুক্তাক্ষর ছিল সেইহেতু এই লিপিকে কুটিলা লিপি বলা হত। কুটিল মানে জটিল। রাজা অশোকের সময়কালে কুটিলা লিপি খুবই জনপ্রিয় ছিল কিন্তু শিলালিপি লিখিত হয়েছিল ব্রাহ্মী লিপিতে। গুপ্তযুগের পর থেকে ভারতে পাঠান আক্রমণের সময়কাল পর্যন্ত কান্বকুব্জ ও সরজুপারী ব্রাহ্মণদের প্রভাব কমে এসেছিল আর নাগর ব্রাহ্মণেরা সেই স্থান দখল করে নিয়েছিল। বারাণসীতে নাগর ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ছিল। তারই ফলস্বরূপ কুটিলা লিপির আধিপত্য কমে গিয়ে সেখানে দেবনাগরী লিপির আধিপত্য তৈরী হয়েছিল। বারানসী দেবনাগরী লিপিকেই তাদের লিপি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। যখন বৃটিশরা ভারতে এসেছিল তখন অনেক ব্রিটিশ পণ্ডিত দেবনাগরী লিপিতে সংস্কৃত লিখেছিলেন। জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারও দেবনাগরী লিপিতে সংস্কৃত লিখেছিলেন। যদিও সংস্কৃত ভাষায় নিজস্ব কোনো লিপি নেই তবুও ভারতে

দেবনাগরীই সংস্কৃত লিপি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ বিভিন্ন লিপিতেও সংস্কৃত লেখা হত। সুতরাং কারও মনে যেন এই ধারণা না হয় যে দেবনাগরী সংস্কৃত ভাষায় একমাত্র লিপি।

পৈশাচী ও পাশ্চাত্য প্রাকৃতে তদ্ভব বা বিবর্তিত সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য রয়েছে। প্রাচীনকালে মানুষ যাযাবর ও জিপসীদের মত এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস না করে ঘুরে বেড়াত। পরবর্তীকালে তারা গ্রামে গ্রামে বসতি স্থাপন করল। বৈদিক সংস্কৃতে 'অন্ন' শব্দের অর্থ মূল খাদ্য, অর 'পিণ্ড' শব্দের মানে যে-কোনো খাদ্য। যেখানে মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে তার নাম ছিল-'পিণ্ড' + ইক পিণ্ডিক। পৈশাচী প্রাকৃতে তা হ'ল পিণ্ডা। বর্তমানের পাঞ্জাবী ভাষায় পিণ্ডা বা পিণ্ডী মানে গ্রাম [রাওয়ালপিণ্ডী]। পাঞ্জাবী ভাষায় বহু তদ্ভব সংস্কৃত শব্দ রয়েছে।

৮০০ বছর আগে এই নাগরী লিপি দেবনাগরী আখ্যা পায়। সারদা লিপি ১৩০০ বছর ধরে চলছে। কুটিলা লিপি অর্থাৎ ওড়িয়া, বাংলা, ভোজপুরী, মেথিলী, অঙ্গিকা প্রভৃতি ভাষাতে প্রচলিত লিপি ১১০০ বছরের পুরোনো লিপি।

কৃষ্ণের মাতৃভাষা ছিল শৌরসেনী প্রাকৃত। রহিম ও সুরদাস প্রাকৃত ভাষার কবি ছিলেন। ব্রজবাসী আগরওয়ালারা ব্রজ এলাকার অধিবাসী–তারা মাড়োয়ারী নন। এলাহাবাদের মুসলমানরা অবধী ভাষা বলেন। কেবল শিয়ারা উর্দু বলেন।

পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা

পৃথিবীর ভাষাসমূহ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। কিছু কিছু ভাষা জাতিগত ও নৃতাত্ত্বিক সম্পর্কের সঙ্গে সমান্তরলতা বজায় রেখে চলে। কিন্তু সবক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে না।

তিব্বতীয়রা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সদস্য। মঙ্গোলীয়দের পাঁচটি শাখা রয়েছে– (১) নিপ্পন, (২) মূল চৈনিক শাখা, (৩) ইন্দো–টিবেটান, (৪) মালয় শাখা ও (৫) ইন্দো–বার্মান। তিব্বত, বহির্মঙ্গোলীয়া ও কোরিয়া ব্যতিরেকে সমগ্র চীন দেশের অধিবাসী ও জাপানের নিপ্পন শাখার অধিবাসী মূল চৈনিক ও নিপ্পন শাখার জনগোষ্ঠীভূক্ত (same race)। ভুটান, সিকিম, নেপালের উত্তরাংশ, উদয়ন রাজ্যের উত্তরাংশ (গাড়োয়ালী ও কুমায়ুনী), হিমাচল প্রদেশের কিন্নরী আর জম্মু

ও কাশ্মীরের পার্শ্ববর্তী লাদাখের লোকেরা ইন্দো-টিবেটো-মঙ্গোলয়েড শাখার অন্তর্গত। ইন্দো-টিবেটিয়গণের চেহারা মাঝারী ধরনের। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী, ইন্দোনেশীয়, মালয়ী, ভিয়েতনামী ও তাইল্যাণ্ডের দক্ষিণদিকের অধিবাসীদের মত চীনাদেরও শারীরিক কাঠামো অপেক্ষাকৃত ছোট। বর্মীরা আবার অন্য ধরনের। ভারতীয়দের মত তাদেরও ভাষা এক নয়। ভারত যেমন বহুভাষী, বহুজাতিক দেশ, বার্মাও তাই। বার্মার ভাষা সমূহের মধ্যে বার্মিজ ভাষাই প্রধান গুরুত্ব পেয়ে থাকে। মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ও মেঘালয়ের কিছু অংশের অধিবাসীগণ মঙ্গোল জনগোষ্ঠীর ইন্দো-বার্মিজ উপশাখার অন্তর্গত। কিন্তু ভাষার দিক দিয়ে তারা আবার একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র।

বার্মার ভাষা চীনের ভাষা থেকে আলাদা। বার্মার লিপিও চীনা লিপির মত চিত্রাক্ষর নয়। বর্মীরা 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' ইত্যাদি লিপি ব্যবহার করে। সেখানকার লোকেরা 'ওঁং মণিপদ্মে হুম্' [বৌদ্ধ মন্ত্র] মন্ত্রোচ্চারণ করে।

জাপান চীনাদের চিত্রলিপি ব্যবহার করে। নৃতত্ত্বগত ভাবে ও জনগোষ্ঠীগতভাবে জাপানীরা চীনাদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত অঞ্চল সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। ভাষা-ইন্দোনেশীয়াতে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার আছে। তাইল্যাণ্ডের ভাষায় ৮০% সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়। মালয় অঞ্চলের অধিবাসীরা আর্য-ভারতীয় জাতি সম্ভূত নয়, মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত।

বর্মীয়, কান্, চীন, কাচীন, মার্তাবান প্রভৃতি 'ইন্দো-বর্মীয়' গোষ্ঠীর ভাষা। 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও তাইল্যাণ্ড-এ দেশগুলির ভাষা হ'ল মালয়গোষ্ঠীভুক্ত। এইসব ভাষাগুলি আর্যগোষ্ঠীর ভাষা নয়। কিন্তু এরা অক্লেশে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে থাকে। মালয়েশিয়ান ও ইন্দোনেশিয়ান ভাষাতে সংস্কৃত শব্দের শতাংশের হার খুবই বেশী-যদিও তা ভারতীয় ভাষার সংস্কৃতের শতাংশের হার থেকে কম, তবুও ৪০ শতাংশের কম নয়। বর্মী ভাষায় সংস্কৃত শব্দের হার ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ।

চীনা ভাষায় তিনটি উপভাষা আছে, কিন্তু মান্দারিণ হচ্ছে স্টান্ডার্ড চাইনীজ ভাষা। ফিলিপাইনে 'রাজা', 'গুরু' ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাইল্যাণ্ডের ভাষায় রাস্তাকে বলে 'রাজপথ'। সরকারী হাসপাতালকে বলা হয়-'রাজানুকূল

হাসপাতাল'। তাইল্যাণ্ডের একটি হোটেলের নাম 'অপ্সরা হোটেল'। 'এঞ্জেল'-কে সংস্কৃতে 'অপ্সরা' বলা হয়। (তাইল্যাণ্ডের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী রাজার সঙ্গে কথা বলতে হয় সংস্কৃত ভাষায়। কৃষিতে অভিজ্ঞ ব্যষ্টিদের সেদেশে বৃক্ষশ্রী বলা হয়)। ইন্দোনেশিয়ার বিমান পরিষেবার নাম 'গোরুড় এয়ারওয়েজ'। (এরা সমুদ্রকে বলে 'মহোদধি'। অনেক মেয়েরই নাম রাখা হয় 'কুসুমসম্ভবা')। সংস্কৃতে 'গোরুড়' বলতে পৌরাণিক পক্ষীকে বোঝায়। ইন্দোনেশিয়া একটা মুসলিম দেশ, কিন্তু যেহেতু এখানে মহাভারত ও রামায়ণের প্রভাব আছে সেইজন্যে একজন রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর ছেলের নাম রেখেছিলেন 'সুকর্ণ'। তিনি মহাভারতের কর্ণের নামে নাম রাখেন সুকর্ণ। তাঁর ধারণা ছিল যে কর্ণ যদিও খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু তাঁর কিছু অসম্পূর্ণতাও ছিল। রাজা চেয়েছিলেন যে, তাঁর ছেলে কর্ণের ত্রুটিগুলি বাদ দিয়ে গুণগুলো পাক। সুকর্ণ মানে উচ্চস্তরের কর্ণ। সুকর্ণ একজন জাপানী মহিলাকে বিবাহ করেন ও বিয়ের পর তার নাম রাখেন রত্নেশ্বরী দেবী। এক বর্ষার দিনে জন্মেছে বলে তিনি তাঁর মেয়ের নাম রাখেন 'মেঘবর্ণা সুকর্ণ-পুত্রী'।

য়ুরোপের মেডিটেরিয়ান দেশগুলির ভাষা লাতিন সঞ্জাত। ১০০০ বছর পর মূল লাতিন ভাষায় (যার একটি শাখা কন্টিনেন্টাল লাতিন) কিছু পরিবর্তন এসেছিল ও দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল–প্রাচ্য অর্ধ–লাতিন ও পাশ্চাত্য অর্ধ–লাতিন (Occi- dental Demi-Latin and Oriental Demi-Latin)। অক্সিডেন্টাল ডেমি– ল্যাটিন থেকে জন্ম নেয় বাস্কে, স্পানিশ ও পোর্তুগীজ; ওরিয়েন্টাল ডেমি–ল্যাটিন থেকে জন্ম নেয় ইতালীয় ও ফরাসী (ফ্রেঞ্চ) ভাষা। লাতিন ও বৈদিক ভাষার প্রভাব আর যে সমস্ত ভাষায় পড়েছে তার মধ্যে পড়ে আলপাইন ও নর্ডিক অঞ্চলের ভাষাসমূহ। পোলিশ ও স্লোভাক আলপাইন সঞ্জাত, তাদের ভাষার ওপর লাতিন ও বৈদিক ভাষার বেশ প্রভাব রয়েছে। এছাড়াও তাদের ভাষায় এ্যাংলো–স্যাক্সন শাখার স্ক্যান্ডেনেভিয়ান ভাষারও কিছুটা প্রভাব রয়েছে। এই স্ক্যান্ডেনেভিয়ান শাখার মধ্যে পড়ে নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও আইসল্যান্ড। আধুনিক ইংরেজী ভাষা লাতিন, এ্যাংলো–স্যাক্সন ও নরম্যান্ডিক ফ্রেঞ্চ (ফ্রান্সের উত্তর দিকে এই ভাষার প্রচলন রয়েছে)–এর সংমিশ্রণ।

ঠিকভাবে ইংরেজী জানতে হলে লাতিন ও এ্যাংলো–স্যাক্সন শব্দ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ফুট হচ্ছে দূরত্ব মাপার একক। সংস্কৃতে দূরত্ব মাপার এককের নাম গজ। গজ ফুট থেকে বড় একক। গজ মানে হাতি। প্রাচীনকালে হাত দিয়ে মাপা হত। প্রায় দশ হাজার বছর আগে মাপের একক ছিল কনুই থেকে মধ্যমার ডগা পর্যন্ত (এক হাত)। লাতিনে ফুটকে বলে 'পেডাস', আর তা থেকে এসেছে 'প্যাডেল'। সাইকেল চালান বোঝাতেও প্যাডেল শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্যাডেল হচ্ছে পেডালের বিশেষণ। সংস্কৃত শব্দ 'নক্রম্' ল্যাটিনে 'nocturnal'। ইংরেজীতে 'bloody' শব্দের দু'টি অর্থ–একটা ব্যবহৃত হয় খারাপ অর্থে। লাতিনে bloody শব্দটি হচ্ছে 'sanguinis' আর তার adjective হচ্ছে 'san- guinary'

ইংরেজী শব্দভাণ্ডারে নর্ডিক, এ্যালপাইন ও মূল নরম্যাণ্ডিক শব্দের ছড়াছড়ি। ইংরেজী একটি মিশ্রভাষা ও এর দু'ধরনের উচ্চারণ রীতি আছে–একটা হচ্ছে এ্যাংলো–স্যাক্সন রীতির উচ্চারণ, অপরটি হচ্ছে নর্ম্যান ধারার উচ্চারণ। উদাহরণ দিতে গিয়ে বলা যায়–ইংরাজী শব্দ 'knife' এসেছে ফ্রেঞ্চ 'kanif' থেকে। ইংরেজীতে 'k'-এর উচ্চারণ না করে 'nife' 'নাইফ'

উচ্চারণ করা হয়। 'Edu- cation' শব্দটিকে নর্ম্যান ধারায় উচ্চারণ করা হয় 'এডুকেশন' আর এ্যাংলো– স্যাকসন ধারায় উচ্চারিত হয় 'ejucation' রূপে। একইভাবে 'guardian' শব্দটিও ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়।

আফ্রিকায় জলবায়ুগত তারতম্য ও নদী উপত্যকার প্রভেদে ভাষার পরিবর্তন হয়। অনেক নিগ্রো ভাষার উৎপত্তি হয়েছে সাহারা মরুভূমির দক্ষিণাঞ্চলে। সাহারার উত্তরে মূল ভাষা ছিল ইজিপ্সিয়ান। যখন আরবরা ইজিপ্ট জয় করল তখন সেই ভাষার ওপর আরবি ভাষার প্রভাব পড়ল ও নানা ধরনের উপভাষা ও কথ্যভাষা (sub-dialect) তৈরী হ'ল। মরক্কো থেকে ইরান আর লেবানন থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত আরবী ভাষার চল রয়েছে। পার্সিয়ান ও আফগানী ভাষা ঋগ্বেদের সংস্কৃতের খুবই কাছাকাছি। উদাহরণস্বরূপ সংস্কৃতে 'অস্তি', পার্সিয়ানে 'অস্ত', সংস্কৃতে 'ভ্রাতা' পার্সিয়ানে 'বিরাদর'। পার্সিয়ান ভাষা ঋগ্বেদীয় সংস্কৃতের পৌত্র। আধুনিক হিব্রু ভাষা ও পুরোনো আধুনিক আরবী ভাষা এসেছে প্রাচীন সেমিটিক ভাষা থেকে।

ইহুদিরা যখন মধ্যপ্রাচ্যে তাদের বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয় ও য়ুরোপ তথা আমেরিকায় বসবাস করতে শুরু

করে তখনই প্রাচীন হিব্রু ভাষা হারিয়ে যায়। একটা নোতুন 'ইদ্দিস' (yiddish) ভাষার সৃষ্টি হ'ল, কিন্তু এখন আর তার অস্তিত্ব নেই। ইহুদিরা যখন আবার মধ্যপ্রাচ্যে পুনর্বাসিত হ'ল তখন তাদের সরকারী ভাষা হ'ল হিব্রু ভাষা। হিব্রু ভাষার সঙ্গে আরবী ভাষার খুবই নিকট সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আরবি আব্রাহাম, ইউসুফ, ইয়াকুব ও দায়ুব শব্দগুলি হিব্রুতে যথাক্রমে ইব্রাহিম, যোশেফ, জ্যাকব ও ডেভিড। দু'টিই সেমিটিক ভাষা আর দু'টিই লেখা হয়–ডানদিক থেকে বাঁদিকে।

সারা বিশ্বের এই হ'ল ভাষা সংক্রান্ত এক সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ। *

২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯, কলিকাতা

** ভারত ও পৃথিবীর ভাষা ও লিপি সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য আরও স্পষ্টভাবে ও রীতিসম্মতভাবে জানতে তাঁর "বর্ণবিজ্ঞান" পুস্তকখানি দ্রষ্টব্য।–* সম্পাদক।

ভাষার তাৎপর্য

এই বিশ্বের সবকিছু এক নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে কাজ করে। যখন নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্মের স্তরে চলে আসেন তখন তিনি সীমাবদ্ধতা বা তামসিকতার আওতায় এসে যান। আমাদের যত আশা-আকাঙ্ক্ষা, যত এষণা সবকিছুই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করে কিন্তু তার পরিধি মোটেই ক্ষুদ্র নয়, পরিধি খুবই বিশাল, প্রায় অসীমিত স্বভাবের। মানবীয় অস্তিত্ব অথবা মানবীয় সত্তা এই বিশাল পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধতা নিয়েই কাজ করে।

মানব সমাজের প্রগতির পথে অবশ্যই অতীত ঐতিহ্য- অতীত ঐতিহ্য বলতে আমি ডগা অথবা ভাবজড়তার কথা বলছি না, আমি বলতে চাইছি অতীত ঘটনাবলীর প্রবাহ। অর্থাৎ মানব সমাজের প্রগতিকে সম্ভব করতে হলে আমাদের একাধারে অতীত ঐতিহ্য, বর্তমানের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা- এদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে হবে।

তাই শুধু ভারতবর্ষ বা এশিয়া বা এই পৃথিবী গ্রহটাই নয়, সমগ্র বিশ্বের মানব সমাজকেই আমাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। কোনোরকমের সাম্রাজ্যবাদ অথবা এক গোষ্ঠীর অপর গোষ্ঠীর ওপর শোষণ–এসব আমাদের সমর্থন করলে চলবে না। যদি কোনো মতবাদ অথবা কোনো গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে শোষণ করে চলে, তাহলে সামাজিক ব্যবস্থার শান্তি ও সুস্থিতি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই আর্থিক– সামাজিক ক্ষেত্র, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র, সাংস্কৃতিক জীবনে অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আমাদের সদাসতর্ক থাকতে হবে, যাতে কোনো সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব পিছনের দরজা দিয়ে এসে আমাদের মানসাধ্যাত্মিক জগতে ঢুকে যেতে না পারে।

সমগ্র পৃথিবীর জন্যে একটি ভাষাগত যোগসূত্র থাকা দরকার, আর বর্তমানে ইংরেজী সেই যোগসূত্রের কাজ করছে। ভবিষ্যতে ইংরেজীর পরিবর্তে অন্য কোনো ভাষা সেই স্থান গ্রহণ করতে পারে কিন্তু ঠিক বর্তমানে ইংরেজী ভাষা সেই উদ্দেশ্য ভালভাবেই সিদ্ধ করছে। তাই ইংরেজীকে বর্তমানের অবস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করা

উচিত নয় অর্থাৎ আমাদের হরণকারীর ভূমিকায় আসা উচিত নয়।

ভারতের অতীত ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে এটা অবশ্যই বলা যায় যে, তা নিহিত আছে সংস্কৃত ভাষার বিশাল পরিধির মধ্যে, আর আমাদের আশা- আকাঙ্ক্ষাও নিহিত আছে সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই। ভারত দেশটাকে পঞ্জাব বা বাঙলা বলা হয় না, বলা হয় ভারতবর্ষ যা প্রাচীন জম্বুদ্বীপের অংশ। এই সত্যকে ভুলে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ দেশটাকে জাগতিক, মানসিক আর আধ্যাত্মিক দিক থেকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া। তাই এই আবশ্যক সত্যটাকে অবশ্যই ভুললে চলবে না। ভবিষ্যতেও ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা সংস্কৃত ভাষার প্রবাহের মধ্যেই সুসংহত থাকবে। তাই সংস্কৃতকে অবশ্যই প্রোৎসাহিত করে চলতে হবে। তার সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষার নামে কারোর ওপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না, যা আজ হিন্দীর ক্ষেত্রে করা হচ্ছে।

এক সুস্থ সমাজব্যবস্থার স্বার্থে সমাজকে একটি পরিবার হিসেবে ধরতে হবে। মনে কর, কোনো পরিবারে পাঁচজন ভাই

আছে, পরিবারের সবকিছুই ওই পাঁচ ভাইয়ের সম্মতি ও সমর্থন নিয়ে করতে হবে। না হলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে যদি এক বা দুইজন ভাইয়ের মতামত দেওয়ার কোনো অধিকার না থাকে, তাহলে তারা নিজেদের সেই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করবে, আর এইভাবে সেই পরিবারটির সামূহিক সংরচনাটাই ভেঙ্গে পড়বে। ভারতবর্ষ এক বহুজাতিক আর বহুভাষিক দেশ। তাই ভাষার ব্যাপারে সকলের স্পষ্ট সম্মতি নিয়েই সেটা করতে হবে, অর্থাৎ অধিকাংশের মতকে জোর করে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। আমাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবন, আমাদের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলতে হবে, আর তা করতে হবে উজ্জ্বল অতীত আর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মধ্যে বিশ্বৈকতাবাদের স্বর্ণিম যোগসূত্র স্থাপন করেই।

'সমাজ' কথাটির অর্থ কী? "সমানং এজতি ইতি সমাজঃ"। সাধারণভাবে চলা, সঃ চলতি; খেতে খেতে চলা, সঃ চরতি; সাধারণভাবে দেখতে দেখতে চলা, সঃ গচ্ছতি; অনুসরণ করে চলা, সঃ অনুগচ্ছতি; চারিপাশে পর্যবেক্ষণ করতে করতে চলা, সঃ অটতি; লিখতে লিখতে চলা, সঃ পরগটতি; ধীরে ধীরে

চলা, সঃ এজতি। তাহলে সমাজ কথাটির অর্থ হ'ল সেই জনসমূহ যারা সুখে ও আনন্দের সঙ্গে চলে চলেছে। তোমরা দেখছ সংস্কৃত কত সমৃদ্ধ ভাষা।

পরমপুরুষ সম্বন্ধে যজুর্বেদে বলা হয়েছে–

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দুরে তদ্বিহস্তিকে
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।।"

পরমসত্তা চলমান আবার তিনি অচল। পরমসত্তা দূরে, অতিদূরে, না তিনি নিকটতম সত্তা। তিনি সবকিছুর ভিতরে, আবার তিনি সবকিছুর বাইরে।

'তদেজতি'। তিনি চলেন..... তিনি চলেন..... তিনি এক অজানা আদিবিন্দু থেকে আর এক অজানা অন্তিম বিন্দুর পানে চলেন। তিনি চলেন–এই 'তিনি' পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ দুই অর্থেই চলে। পরমপুরুষ পুংলিঙ্গবাচক আর পরমাপ্রকৃতি স্ত্রীলিঙ্গবাচক। এই পুরুষ আর প্রকৃতির সামবায়িক নাম ব্রহ্ম, যা ক্লীবলিঙ্গবাচক। শ্লোকে বলা হয়েছে 'তদ্ ব্রহ্মা'; 'স ব্রহ্ম', অথবা 'সা ব্রহ্ম' বলা হয়নি। 'স এজতি অথবা সা এজতি'

নয় কিন্তু 'তদ্ এজতি' ক্লীবলিঙ্গবাচক। সেই ব্রহ্ম শান্তি, প্রশান্তি সহ চলেন আর সেই চলবার সময় তিনি সবকিছুকে দেখতে থাকেন। যদি তিনি তাড়াতাড়ি করে চলেন তাহলে সবকিছু ঠিকভাবে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হবে না। তাই তিনি ধীরে ধীরে ও শান্তভাবে চলেন, অর্থাৎ ডাবল্ মার্চ নয়। তাই 'তদেজতি'।

"বৃহচ্চ তদ্দিব্যং অচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দুরাৎ সুদুরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎ স্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্।।"

পরমসত্তা সর্ববৃহৎ আর তিনি সমস্ত মহাজাগতিক উৎসারণের চরম উৎপত্তিস্থল। পরমসত্তা যিনি জানা-বোঝারও বাইরে, আবার তিনি সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতম। তিনি সবকিছু থেকে অনেক অনেক দূরে, আবার তিনি নিকটতমের থেকেও নিকটে। যে নিজের অন্তরের অন্তস্থলে তাঁকে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে, একমাত্র সেই তাঁকে অনুভব করতে পারে।

পরমপুরুষ বিশাল, অনেক অনেক বিশাল, অনেক, অনেক বিশাল। যখন বিশালতা মাপার বাইরে হয়ে যায় তখন সংস্কৃতে তাকে বলে বিরাট। পরমপুরুষ বিশাল ও বিরাট, আবার তিনি খুব সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম, আর সেই জন্যেই তাঁকে তুমি দেখতে পাও না। যদি তুমি ভাব তিনি দুরে, তাহলে তোমার থেকে অনেক, অনেক দূরে। জ্ঞানী বা দার্শনিকেরা ভাবেন তিনি অনেক দূরে, এত দূরে যে দূরত্ব মাপার বাইরে। কিন্তু ভক্তেরা ভাবেন তিনি খুবই নিকটে, এত নিকটে যে দূরত্ব মাপা সম্ভব নয়। যাদের দেখার চোখ আছে তারা দেখে যে পরমপুরুষ তাদের হৃদয়ে অন্তরতম কোণে অবস্থিত আছেন। তিনি প্রতিটি সত্তার অস্তিত্বের ভিতরে নিহিত আছেন, তাই তাঁকে পাওয়ার জন্যে এখানে-সেখানে ভ্রমণ করার প্রয়োজন নেই। তিনি প্রত্যেকের 'আমি ৰোধের' মধ্যেই গুহায়িত হয়ে আছেন, আবার তিনি সবকিছুকে ঘিরেও আছেন।

সংস্কৃত পৃথিবীর শাস্ত্রীয় ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর প্রতিটি শাস্ত্রীয় ভাষায় আবার স্থানীয় শব্দ ও স্থানীয় শব্দসম্ভার আছে। বিশ্বে যত লিখিত ভাষা আছে তারা সংস্কৃত ভাষা বুঝতে ও সংস্কৃত থেকে শব্দচয়ন করে নিজেদের ভাষায়

ব্যবহার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ "প্রয়োজনের পরিভাষা" পুস্তকে আমি ইংরেজী রকেটের জন্যে কী শব্দ ব্যবহার করেছি? 'প্রগম'।

প্রাচীন পৃথিবীতে বৈদিক ছিল একটা স্বীকৃত ভাষা। এই বৈদিক ভাষা পরবর্তীকালের রূপ হ'ল সংস্কৃত। জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে সংস্কৃত উপযুক্ত। 'সংস্কৃত' শব্দের অর্থ হ'ল যে ভাষার সংস্কার করা হয়েছে, পরিমার্জনা করা হয়েছে। বৈদিক ভাষা যখন সাধারণ মানুষ তথা পশ্চাদপদ্ মানুষদের সংস্পর্শে এল তখন সেটাই হয়ে গেল সংস্কৃত। বৈদিক উচ্চারণ তিন প্রকারের-ঋগ্বেদীয়, যজুর্বেদীয় আর অথর্ববেদীয়। যেমন সংস্কৃতের ঋগ্বেদীয় উচ্চারণ হবে সমস্কৃত, যজুর্বেদীয় উচ্চারণ হবে সমস্তুত আর অথর্ববেদীয় উচ্চারণ হবে সমস্কুত।

যদি পূর্বদিকে চলা যায় তাহলে সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত ভাষাগুলি নিম্নরূপ- ফারসী, পস্তো, পশ্চিমী পাঞ্জাবী, পূর্বী পাঞ্জাবী, ডোগরী, কাশ্মীরি, সিন্ধী, গুজরাটী, রাজস্থানী, নাগপুরিয়া, ছত্তিশগড়ী, ওড়িয়া, মগহী, ভোজপুরী, হরিয়ানবী, বাংলা, অসমিয়া, বার্মিজ, থাই, আর ইন্দোনেশীয় ভাষাসমূহ।

ইংরেজী night শব্দের লাতিন বিশেষণ nocturnal। এটা লাতিন বিশেষণ noctrun থেকে এসেছে যার অর্থ night। আবার রাত্রিকালের জন্যে বৈদিক শব্দ nocturn. লাতিনে ইংরেজী t-এর 'ত'-এর মত উচ্চারণ হবে, কখনই 'ট'-এর মত নয়। এই t-এর বিভিন্ন উচ্চারণ আছে, যেমন ইংরেজীতে tea-এর মত আবার ফরাসী ভাষায় te-এর মত।

"মধু নক্ত মুতশসো"-"আমাদের রাত্রি মধুময় হোক"।

তাহলে দেখা গেল বৈদিক তথা সংস্কৃতের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য শাস্ত্রীয় ভাষাগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যদি সংস্কৃতের আরো বেশি চর্চা করা হয় আর তাকে প্রোৎসাহিত করা হয়, তাহলে সেটা পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ করতে আর মানুষের মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে খুবই সহায়ক হবে। বৈদিক ভাষায় যে মহিলা তার শিশুকে মাপেন তাকে বলা হয় 'মা'। বৈদিক ভাষায় 'মা' শব্দের অর্থ মাপা। এর লাতিন শব্দ maternal আর ইংরেজী শব্দ mother। 'ভাই' শব্দের জন্যে

বৈদিক শব্দ ভ্রাতৃ, ইংরেজী শব্দ brother আর ফারসী শব্দ 'বিরাদর'। ফারসী ভাষার মূল লিপি ছিল খরোষ্ঠী। ইরাণ দেশ যখন ইস্লামিক দেশে পরিণত হ'ল তখন লিপি হয়ে গেল আরবীয়।

যদি সংস্কৃতকে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাহলে মানুষের মধ্যে একতা আর নিকটতর সম্পর্ক প্রোৎসাহিত হবে। তোমরা দেখলে বৈদিক, সংস্কৃত আর বিশ্বের অন্যান্য ভাষাগুলির মধ্যে কিরকম মধুর ও গভীর সম্পর্ক আছে। তাই তোমাদের সংস্কৃত ভাষাশিক্ষাকে খুবই উৎসাহ দেওয়া উচিৎ। সংস্কৃত আমাদের পিতৃপুরুষদের ভাষা, এটা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরা। যদি সকলের মধ্যে যোগসূত্রের ভাষা হিসেবে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রীয় ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহলে মানুষে মানুষে, ভারতবাসী একে অপরের মধ্যে, পূর্ব ভারতীয় আর পশ্চিম ভারতীয় অথবা উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয়- এদের মধ্যে একতার যে এক স্বর্ণসূত্র রয়েছে, তা দুর্বল হয়ে যাবে। ভারত এক ও অবিভাজ্য। যদি কোনো বিশেষ একটি ক্ষেত্রীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সংখ্যাধিক্যের জোরে সমগ্র দেশের ওপরে বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তা ভারত

জাতিটাকেই খণ্ড বিখণ্ড করে দেবে, দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, ফলস্বরূপ সমগ্র দেশটাই দুর্বল হয়ে পড়বে। ভারতবর্ষ এক বহুজাতিক ও বহুভাষিক দেশ। আমাদের সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য যেভাবে আছে, সেভাবেই থাকতে দেওয়া হোক। এই সুন্দর সংরচনা কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেওয়া উচিত নয়।

ভারতে যদি তুমি হিন্দী বা ইংরেজীতে কথা বলতে সক্ষম না হও তাহলে লোকসভায় ঠিকভাবে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারবে না; এমনকি দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তর পত্র লিখতে সক্ষম হবে না। এটা বাঞ্ছনীয় নয়। ব্যাপারটা এই রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যারা হিন্দী বা ইংরেজীতে কথা বলতে সক্ষম তারা বিশেষ সুবিধাভোগী আর অন্যেরা দ্বিতীয় স্তরের নাগরিক। দেশের প্রতিটি পরীক্ষাই সমানতার ভিত্তিতে হওয়া উচিৎ অর্থাৎ তা নিজের স্বাভাবিক ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা অথবা হিন্দী অথবা ইংরেজীতে হওয়া উচিৎ।

সংবিধানে ভারতের সমস্ত ভাষাকেই সমান মর্যাদা দেওয়া উচিৎ। আর সেই সঙ্গে **সংস্কৃত হোক দেশের জাতীয় ভাষা**

কেননা এতে সকলেই সমান সুযোগ- সুবিধা পাবে। ভারতের সব ভাষারই মূল উৎস হচ্ছে সংস্কৃত।

ব্রিটিশ যুগে ইংরেজীকে ভারতের ওপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিদর্শন। তাই নয় কি? আমাদের সংবিধানকে সংশোধন করতে হবে যাতে সকলেই সমানাধিকার ও সমান সুযোগ পায়, কোনো একজনকেও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা উচিৎ নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হ'ল অর্ধেক-দাস বা semi-slaves. Demi, semi, hemi এরা লাতিন শব্দ যার অর্থ 'অর্ধেক'।

ভারতের সমস্ত ভাষাগুলিকে সমান অধিকার ও মর্যাদা দিতে হবে। সংস্কৃত হবে সকলের সাধারণ ভাষা কেননা তা সমগ্র ভারতেরই পিতৃপুরুষদের ভাষা। যদি সমস্ত ভাষাভাষীর মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে সংস্কৃতকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহলে তা সকলের পক্ষেই সুবিধাজনক হবে। আগেই বলা হয়েছে ভারতের সমস্ত ভাষারই মূল উৎস সংস্কৃত। যখনই কোনো ভাষায় কোনো বিশেষ শব্দের অভাব হবে, সংস্কৃতের শব্দসম্ভার থেকে সেটা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হবে। যদি জোর করে তোমাকে হিন্দী শিখতে হয়, যেমনটি আজ করা হচ্ছে, সেটা

বাঞ্ছনীয় নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মাতৃভাষায় নিজেদের অভিব্যক্ত করার সুযোগ না পাচ্ছে ততক্ষণ তারা অন্যের সঙ্গেও যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হয় না।

একটা সুসংবদ্ধ সামাজিক সংরচনার জন্যে এই মূল কথাগুলি ভুললে চলবে না। এই বিশাল বহুভাষিক দেশে একটা বিশেষ ক্ষেত্রীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, সেটা আমাদের সংবিধানের একটা ত্রুটি বলে ধরতে হবে। তোমাদের মনে রাখতে হবে ভাষা, সংস্কৃতি অথবা আর্থিক-সামাজিক ক্ষেত্রে কোনোরকমের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। আমাদের প্রাউট- তত্ত্ব এই মূল সিদ্ধান্তের ওপরে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। আজ হোক, কাল হোক সকলেই পৃথিবীর ভৌতিক ও আধিভৌতিক সমস্ত ব্যাধি ও সমস্যার একমাত্র নিদান হিসেবে প্রাউটকে স্বীকার করে নেবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

ন্যূনতম প্রয়োজন

ও সর্বাধিক সুখ-সুবিধা

আমাদের এই সমাজের অসংখ্য আকর্ষণ, আর সেই আকর্ষণে আকর্ষিত হওয়াই মানুষের স্বভাব। মানুষের এই স্বভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে কম্যুনিজম সবাইকে সমান সম্পদ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু এই বিশ্বের জাগতিক সম্পদ সীমিত। তাই সকলকে কি সম পরিমাণ সম্পদ দেওয়া সম্ভব? সম্ভব নয়। আর শুধু তাই নয়, সেই প্রচেষ্টাও আপাতদৃষ্টিতে মনোরঞ্জক এক ভণ্ডামি। এখন কম্যুনিজম মৃত্যুশয্যায়। কম্যুনিজম ছিল এক 'ইজম্' (মতবাদ)-বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষার ফুলঝুরি।

সকলকে সম পরিমাণ সম্পদ দেওয়ার পরিবর্তে সকলের জীবন যাপনের ন্যূনতম প্রয়োজন পূর্তির নিশ্চিততা প্রদানই সঠিক পদক্ষেপ। সাধারণ মানুষের আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনের ব্যাসার্দ্ধও বেড়ে যাবে।

অধিকতর স্বচ্ছল ও সাধারণ মানুষের মাঝের ব্যবধান ঘোচাতে ন্যূনতম প্রয়োজনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। বিশেষ গুণসম্পন্ন বা প্রতিভাসম্পন্নগণ সমাজের সেবা যাতে আরও ভালভাবে করতে পারেন, সেই সুযোগ করে দিতেই তাঁদের সর্বাধিক সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই কাজটা করার উদ্দেশ্যেই কিছুটা সম্পদ গুণীদের জন্যে আলাদাভাবে বরাদ্দ করে রাখতে হবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে, গুণীদের এই সর্বাধিক সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেওয়াটা যেন সাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। প্রতিভাবানদের সর্বাধিক সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষও যাতে সর্বাধিক সুখ-সুবিধা পায় তার ব্যবস্থাও করতে হবে।

বিশেষ গুণসম্পন্নগণ সাধারণের থেকে বেশী আয় করবেন, আর এই আয়ের মধ্যেই থাকবে তাঁদের সর্বাধিক সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা। কিন্তু সাধারণ মানুষকেও সর্বাধিক সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে না। তারাও যাতে সর্বাধিক সুখ-সুবিধা পায় সেই প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। তবুও বিশেষ গুণসম্পন্নদের সর্বাধিক সুখ- সুবিধা, আর জনসাধারণের সর্বাধিক সুখ-

সুবিধার মধ্যের ফারাকটা থেকেই যাবে। কিন্তু এই ফারাকটা কমিয়ে আনার অন্তহীন প্রয়াস চালিয়েই যেতে হবে।

কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক্। মনে কর, স্কুলের ছাত্ররা ন্যূনতম প্রয়োজন পেয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি স্কুলে তাদের জলখাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, সেটা তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূর্তির পর অতিরিক্ত সুখ-সুবিধা হিসেবে গণ্য হবে। আবার, সমস্ত যাত্রীদের যদি বিনামূল্যে চা বা কফি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাহলে তাও সুখ-সুবিধা বলেই গণ্য হবে।

সাধারণ মানুষকে যদি সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা না দেওয়া হয়, তাহলেও সমাজ এগিয়ে যাবে, কিন্তু ভবিষ্যতে পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা সবসময়েই থেকে যাবে। এই ন্যূনতম প্রয়োজন ও সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধার পরিমাণ সব সময়েই বাড়তে থাকবে। এই বিষয়টি প্রাউটের নব-সংযোজন।

গুণীদের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা যদি খুব বেড়ে যায় তাহলে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলিও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বিশেষ গুণসম্পন্নদের যদি মোটর বাইক থাকে আর সাধারণ মানুষের যদি সাইকেল থাকে, তাহলে সেই অবস্থাকে সন্তুলিত অবস্থা বলা যেতে

পারে। কিন্তু বিশেষ গুণসম্পন্নগণ যদি মোটরগাড়ি পাবার অধিকারী হন তাহলে সাধারণ মানুষকে অনতিবিলম্বে মোটর সাইকেল পাবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রবাদ বাক্য আছে: 'সাধারণ জীবনযাপন আর অসাধারণ চিন্তন'। কিন্তু সাধারণ জীবনযাপন বলতে কী বোঝায়? ৮০ বছর আগের সাধারণ জীবনযাপন আর এখনকার সাধারণ জীবনযাপন এক নয়। যুগে যুগে তার পরিবর্তন হয়। তাই যুগে যুগে ন্যূনতম প্রয়োজন ও সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা-দু'টোই পরিবর্তিত হবে, আর দু'টোই ক্রমবর্দ্ধমান হবে। তা যদি না হয় তাহলে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে না।

সেজন্যে যুগের সর্বনিম্ন প্রয়োজন পূর্তির ব্যবস্থা সকলের জন্যে করা, ও গুণসম্পন্নদের কর্মের সামাজিক মূল্য অনুযায়ী সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও যুগানুযায়ী সর্বাধিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করাই আমাদের কর্তব্য। প্রত্যেক যুগেই ন্যূনতম চাহিদা ও সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আর্থিক মূল্য নির্দ্ধারণ করতে হবে, ও পরবর্তী যুগে তা পুনর্নির্দ্ধারণ করতে হবে - এই ভাবে চলতেই

থাকবে। এই পদ্ধতিতে মানুষের জীবনযাপনের মানকে ক্রমশঃই বাড়িয়ে যেতে হবে।

জীবনের সুখ-সুবিধা

জীবনের সুখ-সুবিধা বলতে সেগুলিকেই বোঝায় যেগুলি মানুষের জীবনযাপনকে সহজ করে। 'aminity' (সুখ-সুবিধা) শব্দটি লাতিন 'amenus' থেকে উদ্ভূত। ইচ্ছার পূর্ত্তি অথবা অবস্থাকে সহজতর করাই এর অর্থ। জাগতিক ও মানসিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্তির উপাদান সমূহকে বলা হবে সেই যুগের সুখ- সুবিধা। সাধারণ মানুষকে সেই সুখ-সুবিধা সর্বাধিক দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন, আগেকার দিনে পানীয় জলের জন্যে লোকে কুঁয়ো খুঁড়তো, ও সেখান থেকে জল নিয়ে ঘরে যেত। কিন্তু পরবর্তীকালে জলাধার তৈরী করে নলের মাধ্যমে ঘরে ঘরে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। এইভাবে সুখ-সুবিধার পরিমাণ বাড়িয়ে তোলায় জীবনে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য। যদিও মূল উদ্দেশ্য ছিল জল পাওয়া, কিন্তু পাওয়ার পদ্ধতি হয়েছে কম প্রয়াস সাপেক্ষ ও বেশী সুবিধাজনক।

সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাধারণ মানুষকে বেশী বেশী করে সুখ- সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই পদ্ধতিই বেশী বেশী করে সম্পদ আহরণ ও উপযোগের প্রেরণা জোগাবে, আর সামুহিক সম্পদের উপযোগিতাই সাধারণ মানুষ ও গুণসম্পন্নদের জীবনযাপনের মানকে উন্নত করবে।

ন্যূনতম প্রয়োজনের প্রাপ্তিতে, ও সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধিতে জীবন- যাপনের সংগ্রাম ক্রমশঃ সহজ ও উপভোগ্য হয়ে উঠবে। এজন্যে প্রাউট সকলের ন্যূনতম প্রয়োজন ও সর্বাধিক সুখ-সুবিধা সুনিশ্চিত করেছে।

সু-বিধ + অচ্ + ধা = 'সুবিধা'। অর্থাৎ যে আভোগ পেতে চাই। 'কুবিধা' মানে যে আভোগ পেতে চাই না। মনে কর, ট্রেনে যাচ্ছ আর দেখছো কেউ খুব সুস্বাদু খাবার খাচ্ছে, তখন সেই ধরনের সুস্বাদু খাবার খাওয়ার স্বাভাবিক ইচ্ছা তোমারও হবে। জাগতিক আভোগ প্রাপ্তির এ এক সাধারণ ইচ্ছা।

প্রাকৃতিক সুখ-সুবিধা

যা তোমার দেহ চায় তাকেই বলব প্রাকৃতিক সুখ-সুবিধা। সমস্ত প্রাকৃতিক আকুলতাই-সমস্ত প্রাকৃত-দৈহিক আকুলতা, যেমন-মল-মূত্র ত্যাগ, ক্ষুধায় খাদ্যগ্রহণ, ইত্যাদিকে প্রাকৃতিক সুখ-সুবিধার অন্তর্গত করতে হবে। জীবনে আরও স্বাচ্ছন্দ্য আনার উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষকে বেশী বেশী করে প্রাকৃতিক সুখ- সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

অতি-প্রাকৃতিক সুখ-সুবিধা

অতি-প্রাকৃতিক সুখ-সুবিধা দেবার ব্যবস্থাও করতে হবে। জনসাধারণ নানাধরনের মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে দিন কাটায়-তাদের এই সমস্ত মানসিক উদ্বেগ থেকে মুক্ত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের গ্রামের লোকেরা সর্বদাই তাদের ফসলের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকে। যদি বৃষ্টি কম হয়, বা না হয়, তাহলে ধানের উৎপাদন কম হয়। যদি শীতকালে খুব বেশী ঠাণ্ডা পড়ে, অথবা ঠাণ্ডা খুব কম হয়, তাহলেও শীতকালীন ফসল মার খায়। সাধারণ মানুষকে এই সমস্ত

উদ্বেগের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করে এই কাজটা করা যেতে পারে। একেই বলবো অতি-প্রাকৃতিক সুখ-সুবিধা। ভালো কৃষি-প্রযুক্তির ব্যবহার, নদীর জল ধরে রাখার জন্যে ছোট ছোট বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে এই সুখ- সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। এমনকি খুব সাধারণ প্রযুক্তিও শস্য উৎপাদন বাড়াতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সরষে ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে জ্বলন্ত কাঠের টুকরোর ধোঁয়া বইয়ে দিলে সরষে গাছে সঙ্গে সঙ্গে ফুল আসবে, আর উৎপাদনও বেড়ে যাবে।

তাই রাষ্ট্রের জাগতিক, ৰৌদ্ধিক ও প্রযুক্তিগত সামর্থ্য অনুযায়ী সাধারণ মানুষকে প্রাকৃতিক ও অতি-প্রাকৃতিক সুখ-সুবিধা সরবরাহ করতে হবে। এই প্রচেষ্টার ফলেই যথেষ্ট সুখ-সুবিধা প্রাপ্তি সম্পর্কে মানুষ নিশ্চিন্ত হবে, ও তাদের জীবনে আসবে তৃপ্তি ও অনুকূল পরিবেশ।

তাই সমস্ত মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন পূর্ত্তি আবশ্যিক করতে হবে, আর নিজ নিজ পরিবেশ অনুযায়ী সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অবস্থা অনুযায়ী সেখানকার মানুষের জাগতিক ও মানসিক

চাহিদার, জাগতিক ও মানসিক আভোগের সম্প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পরিবেশ অনুযায়ী সকলের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিকে সুনিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশ বলতে বোঝাবে নির্দিষ্ট সময়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভূ-সংস্থান, ভৌগোলিক, সামাজিক ও মানসিক অবস্থা।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য কী? পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলতে বোঝায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমস্ত জাগতিক বিষয়সমূহ। এই জাগতিক বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষভাবে জাগতিকও হতে পারে, আবার জাগতিক-অতি জাগতিকও হতে পারে। আবহাওয়া বলতে বোঝায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জল, বাতাস, বাতাসের ঘনত্ব, উষ্ণতা প্রভৃতির স্বভাব। পরিবেশ বলতে বোঝায় যা প্রাণীন ও অপ্রাণীন সত্তা সমূহের বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এক যুগ যাবে আর এক যুগ আসবে, আর সেই অনুযায়ী মানুষের চাহিদারও পরিবর্তন হবে। কোনো এক যুগে এক ধরনের জলখাবার উপযুক্ত মনে হবে, আবার পরবর্তী যুগে তা অনুপযুক্ত মনে হবে। এ যুগের মানুষ মাখন মাখানো রুটি খাচ্ছে, কিন্তু পরবর্তী যুগে হয়তো ভাত-ভাজা (ফ্রায়েড

রাইস) অথবা পায়েস খাওয়াই উপযুক্ত মনে করবে। তাই প্রত্যেকের সর্বাধিক সুখ-সুবিধা প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে হবে, আর তার মানও ধারাবাহিক ভাবে বাড়িয়ে যেতে হবে। মানব প্রগতির সাথে সাথে সর্বাধিক সুখ-সুবিধার সীমানাও প্রসারিত হতে থাকবে। মানুষ এগিয়ে চলেছে, আর সেই সাথে তার জাগতিক ও মানসিক আভোগের এষণাও বেড়ে চলেছে। যুগের ন্যূনতম প্রয়োজন পূর্ত্তি সুনিশ্চিত করতে হবে, সেই সঙ্গে সেই যুগের সর্বাধিক সুখ-সুবিধা প্রাপ্তিও সুনিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট পরিবেশ অনুযায়ী এই সুখ-সুবিধা দিতে হবে।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার পূর্ত্তি কি পূর্ণ রূপে সম্ভব? মানুষের অসীম ক্ষুধা কি কখনও তৃপ্ত হবে? কেন মানুষের চাহিদার শেষ নেই? প্রাউট থেকে আমরা যাই মানস- দর্শনে। আপেক্ষিক জগতে মানুষের অনন্ত চাহিদার তৃপ্তি সম্ভব নয়। মানুষ পরমপুরুষের সন্তান, সেই জন্যেই তার চাহিদাও অনন্ত। পরমপুরুষের সমস্ত গুণাবলীই মানুষের মধ্যে নিহিত; শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, এই ব্যক্ত জগতের প্রতিটি সত্তার মধ্যেই নিহিত। জাগতিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা ও আধ্যাত্মিক চাহিদার নিরসন কি সম্ভব? কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক চাহিদারই

পূর্ত্তি সম্ভব। অণু যখন ভূমায় মিলে মিশে এক হয়ে যায় তখনই অণুর আধ্যাত্মিক চাহিদার নিরসন হয়। মানবদেহের রয়েছে সীমিত ক্ষমতা। অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে এই দেহের কাজের পরিধি সীমায়িত। মনের অধিক্ষেত্র যদিও বেশ বড়, তবু তাও সীমায়িত।

ভবিষ্যৎ প্রগতি

প্রতিটি ব্যবস্থার গুণাগুণ আছে। এই ব্যবস্থার দোষ এই যে, [ভবিষ্যতে] যেহেতু জীবনযাত্রা সহজ থেকে সহজতর হয়ে যাবে সেহেতু মানুষের দৈহিক ক্ষমতা ক্রমশঃই কমে যাবে। অতীতে মানুষ খালি পায়ে হেঁটে বহু দূরে চলে যেত, গায়ে জড়ানো থাকতো এক টুকরো কাপড়। কিন্তু এখন মানুষ খালি পায়ে বা খালি গায়ে কোথাও যায় না বললেই চলে। একথা সত্যি যে ভবিষ্যতে মানুষের দৈহিক সামর্থ্য কমে যাবে, কিন্তু সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মেলাতে তা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এমন একদিন আসবে যখন মানুষের চোখ ও হাড় দুর্বল হয়ে যাবে। প্রায় সকলকে চশমা পরতে হবে, ও নকল দাঁত লাগাতে হবে। ভবিষ্যতে মানুষের দৈহিক কাঠামোও

খুবই বদলে যাবে। মানুষের বুদ্ধি ক্ষুরধার হবে, মস্তিষ্ক বড় হয়ে যাবে, আর স্নায়ুতন্ত্র খুবই জটিল হবে। মানুষের মধ্যেই যে শুধু এই পরিবর্তন আসবে তাই নয়, জীব জগৎ ও উদ্ভিদ জগতেও পরিবর্তন আসবে। অফ্রিকার হাতির চেহারা বিশাল কিন্তু মাথা ছোট, এরা পোষ মানে না। ভারতীয় হাতির দেহ অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু মাথা বড়, এদের পোষ মানানোও যায়।

যেহেতু জীবন সংগ্রাম কমে যাবে সেহেতু ৰৌদ্ধিক চর্চার সুযোগ বেড়ে যাবে। এমন দিন আসবে যখন কায়িক পরিশ্রম হবে খুবই সামান্য। এখন একথা বিস্ময়ের উদ্রেক করছে, হয়তো আমরা তা ভাবতেও চাইছি না, কিন্তু সেদিন অবশ্যই আসবে। দৈহিক সামর্থ্য ক্রমশঃ বৌদ্ধিক সামর্থ্যে পর্যবসিত হবে, ও ৰৌদ্ধিক সামর্থ্য আধ্যাত্মিক সামর্থ্যের তুঙ্গে পৌঁছবে। দৈহিক সামর্থ্য থেকে ৰৌদ্ধিক সামর্থ্যের দিকে অগ্রগতিই প্রাউটের বৈশিষ্ট্য। মানব জীবনের এই অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী, এই অগ্রগতিই ভবিতব্য। ৰৌদ্ধিক জগতের এই অগ্রগতি কুকুর, বাঁদর, গোরু প্রভৃতি পশুর ক্ষেত্রেও হবে। বর্তমানে মানুষের যে ৰৌদ্ধিক স্তর, আগামী এক হাজার বছর পর বাঁদর সেই

স্তরে উন্নীত হতে পারে। সেই সময় মানুষের বুদ্ধির ও বোধির স্তরে প্রভূত প্রগতি হবে।

সেই সময়ের মানুষেরা খুবই অনুভূতি প্রবণ হবে। বহির্মুখী স্নায়ুতন্ত্ব থেকে অন্তর্মুখী স্নায়ুতন্ত্ব বেশী ক্রিয়াশীল হবে, আর এখনকার থেকে তখনকার অভিপ্রকাশ বেশী সূক্ষ্ম হবে। এখন মানুষের সূক্ষ্ম অভিপ্রকাশ খুবই বিরল, কিন্তু ভবিষ্যতে তা হবে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতার পরিধিও যাবে বেড়ে। একইভাবে অনেক পশুও বেশী অনুভূতিপ্রবণ হবে, ও তাদের শব্দসম্ভারও বেড়ে যাবে। ৰৌদ্ধিক প্রগতির সাথে সাথে শব্দভাণ্ডারও বেড়ে যায়, ভাষাও শব্দ সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়। পশুর মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতার পরিধিও বেড়ে যাবে। আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে ভবিষ্যতের মানুষের মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতার পরিধির ক্রম প্রসারে দ্রুতি এসে যাবে।

মানুষ ভাবতে পারে যে, যতক্ষণ না মস্তিষ্কের আয়তন বাড়ছে, ও সেই সঙ্গে করোটির আয়তন বাড়ছে, ততক্ষণ দ্রুতগতিতে আধ্যাত্মিক প্রগতি সম্ভব নয়। কিন্তু এমনটা ভাবা ঠিক নয়। কারণ মানুষ তার চিন্তার পরিধি বাড়াতেই পারে।

বর্তমানে মানুষ বৌদ্ধিক জগতে এগিয়ে চলেছে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র, মহর্ষি অগস্তদের মত সেকালের আধ্যাত্মিক সাধকদের যে ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, আজকের মানুষকে আধ্যাত্মিকতার তুঙ্গে উঠতে ততটা বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। এক হাজার বছর আগের মানুষের গ্রন্থি যতটা মজবুত ছিল, বা তা থেকে যে পরিমাণ গ্রন্থিরস (হর্মোন) ক্ষরিত হত, তার তুলনায় এখনকার মানুষের গ্রন্থি অনেক মজবুত, ও গ্রন্থির রসের ক্ষরণও অনেক বেশী। আগামী এক হাজার বছর পর অবস্থার আরও উন্নতি হবে। এখন থেকে হাজার বছর পর মানুষ এমন অনেক কিছুই বুঝতে পারবে যা বোঝার ক্ষমতাই এখন নেই। প্রাউটের সামাজিক অর্থনৈতিক বাতাবরণেই এই পরিবর্তন সংসাধিত হবে।

মানুষ যেহেতু ক্রমশঃ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে সেহেতু ক্রমশঃই বেশী বেশী করে বুঝতে পারবে যে, সে দেহপ্রধান অপেক্ষা মনপ্রধান। প্রকৃতপক্ষে মানুষও যন্ত্র-তবে সে যন্ত্র শারীর-মানসিক। মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেহের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। ভবিষ্যতের মানুষ বর্তমানের মানুষের শারীরিক সুঠাম দেখে বিস্মিত হবে। একই ভাবে আজকের

মানুষও যদি ভবিষ্যতের মানুষের শারীরিক সুঠাম দেখবার সুযোগ পেত তাহলেও হতবাক হয়ে যেত।

মানব মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ ভবিষ্যতের কথা বেশী চিন্তা করতে চায় না, তারা বরং অতীত নিয়ে মশগুল হতে ভালবাসে। কারণ ভবিষ্যত সম্পর্কে মানুষের যে রঙিন কল্পনা থাকে তা অনেক সময় নাও মিলতে পারে, সেইজন্যেই ভবিষ্যত সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হওয়ার আশঙ্কা সব সময়ই থেকে যায়।

এমন একদিন আসবে যখন মানুষের দৈহিক ও মানসিক সংরচনা দেবোপম হয়ে যাবে। এমনও হতে পারে যে মানুষ এই জাগতিক জগতে থাকতে চাইবে না। এই নশ্বর জগত সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহই থাকবে না। তারা এই জগৎ থেকে চিরকালের জন্যে বিদায় নিয়ে পরমপুরুষে বিলীন হতে চাইবে। আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমেই মানব মনস্তত্ত্বের এই পরিবর্তন সংসাধিত হবে। তাই প্রতিটি মানুষের কাছেই আমার আবেদন যতদিন জীবন আছে ততদিন সেই জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে' তুলতে, জীবনে সম্পূর্ণতা আনতে সচেষ্ট হতে হবে। আর শুধু নিজেকে গড়লেই চলবে না, সমগ্র মানব

সমাজকেও একই ভাবে গড়ে' তুলতে হবে। আর তা সার্থক ভাবে করতে হলে প্রাউটের সাহায্য নিতেই হবে।

মানুষের জাগতিক চাহিদা তৃপ্ত করতে প্রাউটই সর্বাধিক সুখ-সুবিধা প্রগতিশীল ভাবে বিতরণকে সুনিশ্চিত করবে। জাগতিক চাহিদা তৃপ্ত হলে মানুষের জাগতিক অসুবিধা দূর হয়ে যাবে, ও তার ফলে মানব প্রগতি ত্বরান্বিত হবে। বিশেষ করে বৌদ্ধিক স্তরে সার্বিক উন্নতি উপলব্ধ হবে। মানুষ নির্বাধে ৰৌদ্ধিক স্তরকে উন্নত করার সুযোগ পেয়ে যাবে।

মানবতার শুভ অভিপ্রকাশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমবর্দ্ধমান হবে। তাই আমি বলি, সমস্ত মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন পূর্ত্তি ও সর্বাধিক সুখ-সুবিধা প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে হবে, আর তাও ক্রমবর্দ্ধমান হতে হবে। মানুষের জাগতিক ও মানসিক উন্নতিতে এই দুটি বিষয়, এমনকি একটি বিষয়ও, খুবই কার্যকরী হবে।

প্রাউট ও নব্যমানবতাবাদ

যেহেতু জাগতিক আভোগ সীমিত সেহেতু মন ক্রমাগত এক বস্তু থেকে আর এক বস্তুতে ছুটে বেড়ায়। এ এক অশেষ প্রচেষ্টা। কিন্তু বোধির জগৎ অসীম। এই জগতের সংস্পর্শে যাঁরা আসেন তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়। অতএব আধ্যাত্মিক জগতই নিয়ন্ত্ শক্তি। যেহেতু আধ্যাত্মিক জগৎ অনন্ত সেহেতু মানুষ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কিন্তু জাগতিক ক্ষেত্র সীমিত হওয়ায় এই জগতে মানুষ তার কাজের পরিধি ক্রমশঃ বাড়াতে পারে। তার এই প্রচেষ্টা চলতেই থাকে। আর এই প্রচেষ্টার মধ্যে থাকে অসংখ্য রকমফের (পারমিউটেশন ও কম্বিনেশন)। কিন্তু যাই করা হোক-না-কেন, মানুষের অন্তর্নিহিত অনন্ত ক্ষুধার নিবৃত্তি এই স্কুল জগতে হয় না। অনন্ত ক্ষুধা নিবৃত্তির এই প্রচেষ্টা বড়জোর তাকে আধ্যাত্মিকতায় অনুসন্ধিৎসু করতে পারে।

আধ্যাত্মিক জগতে মানুষের অগ্রগতিতে একদিকে ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিয়ে, ও সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধার জোগান দিয়ে প্রাউট যেমন সহযোগিতা করে, অপরদিকে সমস্ত রকমের বিভেদের অবসান ঘটিয়ে নব্যমানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সহযোগিতা করে। মানুষ জাতির প্রগতিতে ও বিবর্তনে এই

দু'টি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরই পরিণতিতে অস্তিত্বিক সত্ত্বা পরম চৈতন্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

প্রাউট মানুষকে সেই আধ্যাত্মিকতার চউকাঠে পৌঁছে দেয়। দৈনন্দিন জীবনে নানা প্রতিবন্ধকতা দূর করতেও প্রাউট সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক নিত্যযাত্রীই তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনপূর্তির উদ্দেশ্যেই সকাল ছ'টায় বাড়ি থেকে বের হতে, আর দশটায় ফিরতে বাধ্য হয়। কিন্তু প্রাউট যেহেতু সকলের ন্যূনতম প্রয়োজন সুনিশ্চিত করবে সেহেতু তাদের দিনগত কর্মের বোঝা অনেক হাল্কা হয়ে যাবে।

যখন প্রাউট ও নব্য মানবতাবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন মানুষের সমগ্র অস্তিত্ব পরম চৈতন্যের প্রাপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠবে।

ভাল-মন্দ নিয়ে এই জগৎ এগিয়ে চলেছে। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে যাত্রাই প্রগতি। জাগতিক ও মানসিক জগতে এই প্রগতির কোনো শেষ বিন্দু নেই। যেহেতু এই দুই জগতই সীমিত সেহেতু এই দুই জগতে মানুষের অন্তর্নিহিত অসীম

ক্ষুধার পরিতৃপ্তি অধরা থেকে যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের চরম স্তরে সেই অনন্ত ক্ষুধা সম্পূর্ণ রূপে তৃপ্ত হয়। প্রাউট ও নব্যমানবতাবাদই জাগতিক ও মানসিক জগতে মানুষের ক্ষুধার পরিতৃপ্তিতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্ম জগতে মানুষের ক্ষুধার পরিতৃপ্তি কীভাবে সম্ভব? এ জন্যেই রয়েছে আনন্দমার্গ দর্শন। প্রাউটের সাহায্যে আধ্যাত্মিকতার চউকাঠ পেরোন সম্ভব নয়, কিন্তু আনন্দমার্গে তা সম্ভব। আমাদের আদর্শ তাই বুদ্ধি ও ৰোধির সুসম সমন্বয়।

প্রত্যেক যুগেই মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। মানুষের জাগতিক ও মানসিক অবস্থা অনুসারে, প্রকৃতি ও পরিবেশের পরিবর্তন সাপেক্ষে এই ন্যূনতম প্রয়োজনও ক্রমশঃই বেড়ে যাবে। অর্থাৎ মানুষের সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাথে ন্যূনতম প্রয়োজনের পরিধিও বিবর্তিত হবে, ক্রমবর্ধমান হবে।

বর্তমানে মানুষ পশু ও উদ্ভিদের ন্যূনতম প্রয়োজন অপেক্ষা নিজের ন্যূনতম প্রয়োজনের চিন্তাই বেশী করে করছে। এমন দিন আসছে যখন অন্তত কিছু পশু আমাদেরই সমাজের সদস্যের অন্তর্গত হয়ে যাবে। এখন আমরা বলছি প্রত্যেকটি

মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনের পূর্ত্তি হবে, সেদিন আমরা বলব কুকুর, গোরু, বাঁদরদেরও যেন ন্যূনতম প্রয়োজনের পূর্ত্তি হয়। আর এই চাহিদা মেটাতে হলে আরও বেশী করে উৎপাদন বাড়াতে হবে।

আমাদের এই পৃথিবীটা শুধু মানুষেরই পৃথিবী নয়, অন্যান্য প্রাণীন সত্তারও পৃথিবী। সেজন্যে তাদের জন্যেও আমাদের কিছু করতে হবে। তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন ও সর্বাধিক সুখ-সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থাও করা উচিত। বর্তমানে গোরু, কুকুর আর বাঁদররা উন্নতি করছে। ভবিষ্যতে আরও বেশ কিছু পশুর এই স্তরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। পশুদের মধ্যেও নানান ধরনের মানস-দৈহিক আভোগের উদয় হচ্ছে, তাই তাদেরও ন্যূনতম প্রয়োজন ও সর্বাধিক সুখ-সুবিধা প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। ওদের জন্যে আমাদের কিছু করতেই হবে। এটাই নব্যমানবতাবাদের দাবী, নব্যমানবতাবাদী ভাবধারার আবেদন। প্রাউটকেই এই দাবী পূরণের দায়িত্ব নিতে হবে।

মানুষের আস্তিত্বিক মূল্যের ও অধিকারের অধিক্ষেত্রের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তার মানস আভোগের পরিধিও বেড়ে যায়। মানস-দৈহিক বিষয়-ভোগের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

প্রত্যেককেই সর্বাধিক সুখ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রগতির এই পথে ছোট-বড় কোনো ধরনের স্থিতি, কোনো ধরনের যতিই রাখা চলবে না।

প্রগতির পথ অশেষ। আভোগও অন্তহীন। এসব বুঝেই আমাদের চলতে হবে। মানব প্রগতির এই যাত্রার কোনো বিরাম নেই। শুধু মানব প্রগতির নয়, জাগতিক ও মানসিক জগতের প্রগতিরও কোনো চরম স্তর নেই। ভৌম-ভাবপ্রবণতা মুখ থুবড়ে পড়বে, সামাজিক-ভাবপ্রবণতা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, সামাজিক-অর্থনৈতিক ভাবপ্রবণতা মুছে যাবে। এমন একদিন আসবে যখন মানুষ সর্বাধিক সুযোগ পাবে, তখন মানুষ তার প্রাপ্তির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যাবে। কিন্তু সর্বোচ্চ সুখ-সুবিধা প্রদান কি তার তুঙ্গে পৌঁছবে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে পৌঁছেছে, কিন্তু যেহেতু পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে যাবে তাই সর্বাধিক সুখ-সুবিধা প্রদানেও পরিবর্তন হবে। সর্বাধিক সুখ-সুবিধা প্রদানের স্তর আপেক্ষিক তুঙ্গে পৌঁছলেও, চরম তুঙ্গে কখনই পৌঁছেছে বলে গণ্য করা চলবে না।

তাই সংশ্লিষ্ট স্থানের পরিস্থিতি অনুযায়ী সর্বাধিক সুখ-সুবিধা প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে হবে, ও তার পরিধিও

ক্রমবর্দ্ধমান হবে। জনগণকে আমাদের এই কর্মসূচী জানাতে হবে, ও এই মহান ব্রত সার্থক করতে আমাদের সাহায্য করার জন্যে তাঁদের উৎসাহিত করতে হবে।

যখনই আমরা কোনো তত্ত্বকে বাস্তবে রূপায়ণে উদ্যোগী হব, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা বাস্তবের বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছি, সেটা বুঝেই আমাদের তত্ত্ব বাস্তবায়নের কাজে ব্রতী হতে হবে। বর্তমান বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগিয়ে চলাই ছিল শিবের নির্দেশ। মার্কসইজম পুরোপুরি এই অমোঘ নিয়মকে অস্বীকার করেছে, আর সেইজন্যেই বর্তমান পরিস্থিতির চাপে মার্কসইজম টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে।

"ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর,
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।"

মনে কর, একটা প্রদীপ থেকে উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হাজার হাজার পতঙ্গ সেই আলোয় ঝাঁপিয়ে পড়বে ও পুড়ে মরবে। কম্যুনিজমও ওই ধরনের এক উজ্জ্বল আলো।

ওরা খুব লম্বা চওড়া কথার ফুলঝুরি ফুটিয়েছে, কিন্তু কোনোদিনই ভেবে দেখেনি যে তাদের আর্থ-সামাজিক চিন্তাধারার বাস্তবায়ন কীভাবে সম্ভব? তথাকথিত আদর্শ রূপায়ণের নামে তারা অগণিত নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে, ও অসংখ্য মানুষকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে (সাইবেরিয়ার হিম-শীতলতায় মৃত্যুর জন্যে প্রতিক্ষায়) পাঠিয়েছে। মানুষের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা না করে ষ্টালিন লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। জনগণের উন্নতির নামে এই নরহত্যা করা হয়েছে। এই কি মানবতা? আজ মানুষ কম্যুনিজমকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সম্প্রতি চীনের জনগণ মানুষের মৌলিক স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছিল। সে দাবীতে আন্দোলন করাকে অপরাধ গণ্য করে সে আন্দোলনকে বিধ্বস্ত করা হয়েছে। এই মৌলিক স্বাধীনতার দাবী জানানোর অধিকার কি জনগণের থাকা উচিত নয়?

যা বাস্তব ও বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব প্রাউটে তাই বলা হয়েছে। মার্কসইজম শূন্যে প্রাসাদ গড়ার চেষ্টা করেছিল, ও জনগণকে অলীক খোয়াব দেখাতে চেয়েছিল। প্রাউট তা

করেওনি, করবেও না। প্রাউট শুধু তাই করবে যা বাস্তব ও বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব।

যদি সাধারণ মানুষ ও গুণসম্পন্ন মানুষকে একইভাবে গণ্য করা হয় তাহলে গুণসম্পন্নরা তাদের অতিরিক্ত যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে বা বাড়াতে উৎসাহিত হবে না। এই কারণেই ভারতের বুদ্ধিজীবীরা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। তারা যে যাচ্ছে আর ফিরছে না। যদি তাদের সর্বাধিক সুখ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে আর এমনটি হ'ত না।

প্রাউট চায় সকলের ন্যূনতম প্রয়োজন পূর্ত্তি সুনিশ্চিত করতে, সর্বাধিক সুখ- সুবিধা সকলকে দিতে, আর বিশেষ গুণসম্পন্নদের জন্যে বিশেষ ধরনের সুখ-সুবিধা প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে। এই উদ্যোগ সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরের চিরন্তন প্রগতির দ্রুতিকে সুনিশ্চিত করবে। পিছিয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনা তো নেইই, এমনকি স্থিতাবস্থা বজায় রাখা বা সাধারণভাবে গতি বজায় রাখারও প্রশ্ন ওঠে না। গতিতে দ্রুতি অবশ্যম্ভাবী। দ্রুতিই জীবনের পরিচায়ক, অস্তিত্বের লক্ষণ, আস্তিত্বিক প্রাণীনতার স্পন্দন। একজন যদি প্রতিভা সম্পন্ন নাও হয়, যদি সমাজের একজন নগণ্য সদস্যও হয়, এমনকি যদি

সকলের কাছে তার কোনো মূল্য নাও থাকে, তবুও তাকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী, যুগের দাবী অনুযায়ী, ন্যূনতম প্রয়োজন ও সর্বাধিক সুখ-সুবিধা ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে হবে।

তাহলে এই নোতুন চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য কি?

- ন্যূনতম চাহিদা পূরণের নিশ্চিততা সকলকেই দিতে হবে।
- বিশিষ্টদের জন্যে বিশেষ সুখ-সুবিধার নিশ্চিততা দিতে হবে। বিশেষ যুগের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী বিশেষ গুণসম্পন্নদের জন্যে বিশেষ সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- সর্বাধিক সুখ-সুবিধা সকলের জন্যেই সুনিশ্চিত করতে হবে। সুনিশ্চিত করতে হবে এমনকি তাদের জন্যেও যাদের কোনো বিশেষ যোগ্যতা নেই- অর্থাৎ সাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন সাধারণ মানুষের জন্যে। প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী সকলের জন্যেই সর্বাধিক সুখ-সুবিধা সুনিশ্চিত করতে হবে। এই সুখ-সুবিধা বরাদ্দ হবে সাধারণ গুণসম্পন্নদের জন্যে, অর্থাৎ সাধারণ

মানুষের জন্যে-এক কথায় যাদের আমরা দলিত বা নিপীড়িত বলি তাদের জন্যে।

- উল্লিখিত তিনটিই হচ্ছে অন্তহীন প্রয়াস, আর সামূহিক সামর্থ্য অনুসারে এর পরিমাণ বাড়তেই থাকবে।

প্রাউটের এই পরিশিষ্টটি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও স্বভাব-চরিত্রে প্রগতিশীল। ভবিষ্যতে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব অনুভূত হবে। তাই আমি আশা করি তোমরা এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করবে।

১৩ অক্টোবর ১৯৮৯, কলিকাতা

প্রাউট ও নব্যমানবতাবাদ্

অস্তিত্বের সকল ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান গতিশীলতার দ্রুতি থাকতেই হবে। গতির দ্রুতিই জীবনের মূল পরিচয় বহন করে। মানুষের দৈহিক সংরচনা পাঞ্চভৌতিক কিন্তু মানব

জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে পরমপুরুষ (Supreme Entity)। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমেই আমাদের যেতে হবে।

প্রাউটের মূলেও রয়েছে এই গতিশীলতা। প্রাউট হচ্ছে একটি সামাজিক- অর্থনৈতিক দর্শন যা মানবজাতিকে অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। পরমপুরুষের দিকে এগিয়ে চলা সকলের পক্ষেই একটা বিরামহীন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার অন্তে তুমি পরমপুরুষের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবে।

প্রাউট হচ্ছে মানবজাতির সামাজিক-আর্থিক মুক্তির পথ। প্রাউটকে চলতে হবে নব্যমানবতাবাদী ভাবধারার পাশাপাশি। নব্যমানবতাবাদী ভাবধারা মানুষকে চলার প্রেরণা জোগাবে। সেগুলো [মানব মনে] সৃষ্টি করবে সূক্ষ্মতর আভোগের এষণা আর সেই আভোগ জোগাবার ব্যবস্থা নেবে প্রাউট। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে বহির্জগত ও মানসিক জগতের মধ্যে একটা ভারসাম্য রাখতে হবে ও মানুষকে নিয়ে যেতে হবে আধ্যাত্মিকতার প্রবেশ দ্বারে।

জাগতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে একটা ভারসাম্য, একটা সন্তুলন অবশ্যই রাখতে হবে। প্রাউট, নব্যমানবতাবাদী ও আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে একটা ভারসাম্য অতি অবশ্য রাখা দরকার। তোমরা অবশ্যই এই তিনটির মধ্যে একটা ভারসাম্য রেখে চলবে। প্রাউট হচ্ছে সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক, নব্যমানবতাবাদ মানসিক-ৰৌদ্ধিক দিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা হচ্ছে অধ্যাত্ম-ৰোধির দিক। এই তিনের সম্মিলিত পথই হচ্ছে মানুষের মুক্তির পথ।

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে পরমপুরুষে পরমাস্থিতি লাভ করা। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণ প্রশান্তি, পূর্ণ আধ্যাত্মিক মিলন। একদিকে রয়েছে প্রাউটের সামাজিক- অর্থনৈতিক [মুক্তির] পথ, অন্যদিকে রয়েছে নব্যমানবতাবাদের মনস্তাত্ত্বিক পথ। মধ্যবিন্দুতে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার পথ। সামাজিক-অর্থনৈতিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে অপূর্ণতা। প্রাউট ও নব্যমানবতাবাদের [পথে] আধ্যাত্মিকতার দ্বারপ্রান্ত অতিক্রম করা যায় না। আধ্যাত্মিক সাধনার পথেই তোমাকে সেই দ্বার অতিক্রম করে আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে।

সামাজিক-আর্থিক নীতি কীভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটাতে সাহায্য করবে? মনে কর, সমাজে উঁচু ও নীচু জাতের মত সামাজিক বৈষম্য আছে। আর, তোমাদের এই বৈষম্য দূর করতে হবে, তার মানে সমাজ থেকে জাতপাতের ভিত্তিতে সৃষ্ট সমস্ত বৈষম্য তোমাদের দূর করতে হবে। সুতরাং জাতি প্রথাটাকেই উচ্ছেদ করতে হবে। হয় সামাজিক-অর্থনৈতিক, মানসিক না হয় আধ্যাত্মিক পথেই সমাজের বিভিন্ন প্রকারের বৈষম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা থাকে। উক্ত জাতিভেদ প্রথার সামাজিক বৈষম্য প্রাউটের অধিক্ষেত্রে পড়ে। সুতরাং সমাজের সমস্ত বৈষম্য ও কৃত্রিম বাধা দূর করে এই সামাজিক-আর্থিক ব্যবস্থা [অর্থাৎ প্রাউট] মানুষকে ক্রমবর্ধমান তীব্রগতিতে অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার সামর্থ্য জুগিয়ে, তার আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটাবে।

নব্যমানবতাবাদ প্রাউটকে সমস্ত বৈষম্য ও কৃত্রিম বিভেদ দূর করতে প্রেরণা ও শক্তি দেবে। প্রাউট নব্যমানবতাবাদ থেকে নব্যমানবিক প্রেরণা থেকে, নব্যমানবীয় ভাবাদর্শ থেকে ও নব্যমানবিক চিন্তাধারা থেকে এগিয়ে চলার প্রেরণা ও প্রত্যয় পাবে।

নব্যমানবতাবাদ অপ্রাণীন জগতের যথোপযুক্ত ব্যবহারের ও উপযোগিতা গ্রহণের গ্যারান্টি দিচ্ছে। তোমরা অবশ্যই যথোপযুক্ত ব্যবহারের গ্যারান্টি দিয়ে অপ্রাণীন জগতের সেবা করবে। ইংরেজী animate শব্দটির সংস্কৃত প্রতিশব্দ হচ্ছে 'চেতন', inanimate-এর 'জড়', movable-এর জঙ্গম, immovable-এর 'স্থাবর', equilibrium-এর সন্তুলন, equipose-এর ওজনগত ভারসাম্য ও balance-এর গতিগত ভারসাম্য। আমাদের সেবার অধিক্ষেত্র শুধুমাত্র চেতন জগতে সীমাৰদ্ধ থাকবে না, তাকে প্রসারিত করতে হবে জড়জগতের বহিঃপ্রান্ত পর্যন্ত। এটাই যুগের দাবী। নব্যমানবতার দৃষ্টিতে আমাদের সেবার অধিক্ষেত্র সবসময় বেড়েই চলবে, তাকে সদা সম্প্রসারণশীল হতে হবে, ও তাতে চেতন জগৎ ও জড় জগৎ উভয়কেই রাখতে হবে।

জড়জগতে সুবিচার দিতে হলে আমাদের নীতি কী হবে? প্রথমে আমাদের মানব জগতের ঊর্ধ্বে যেতে হবে, তারপর যেতে হবে প্রাণীজগতের উর্ধ্বে, তারপর অপ্রাণীন জগতের ঊর্ধ্বে যেতে হবে। উদ্ভিদ কম উন্নত, পশুরা তার থেকে বেশি উন্নত আর মানুষ আরও বেশি উন্নত। নব্যমানবতার পথে

এরা সবাই আছে-এর অধিক্ষেত্রে প্রাণীন জগৎ ও অপ্রাণীন জগৎ উভয়ই রয়েছে।

মানুষ জড়জগতের ঠিকমত যত্ন নেয় নি। যেমন মানুষ অনেক পাহাড় ও পর্বতের ক্ষতি ও ধ্বংসসাধন করেছে। তোমরা অবশ্যই পাহাড়-পর্বত ধ্বংস করবে না। নচেৎ বৃষ্টিপাত বিঘ্নিত হবে। তোমরা ভূ-গর্ভস্থ জল ব্যবহার করবে না বা গভীর-অগভীর নলকূপ ব্যবহারে উৎসাহ দেবে না কারণ এই ধরনের কূপের ওপর অতিনির্ভরতার ফলে জলের স্তর একদম নীচে নেবে যাবে ও তার ফলে ওপরের মৃত্তিকা স্তর শুষ্ক হয়ে গাছপালার মৃত্যু ঘটাবে। বৃষ্টির জল ও নদীর জল ব্যবহার করা সবচাইতে ভাল। ভূ-গর্ভস্থিত জল ব্যবহার না করে জলাধারে সঞ্চিত বৃষ্টির জল ব্যবহার করা উচিত। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলছি, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় গত কয়েক বৎসরে ভূ-গর্ভস্থ জল ১৫ ফুটের মত নীচে নেবে গেছে। যদি এরকম চলতে থাকে তবে আগামী ১০০ বৎসরের মধ্যে নদীয়া জেলা মরুভূমি হয়ে যাবে। নদীয়া জেলায় অনেক নদী আছে, যেমন ভৈরব, খড়ে, ভাগীরথী ইত্যাদি। এই সব নদীর জল খাল ও উপখালের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে তোলা সেচ ও

পাম্পের সাহায্যে ব্যবহার করা উচিত। নদীয়া, খুলনা ও যশোর জেলায় জলসেচ ব্যবস্থা এরকই হওয়া দরকার। অতীতে রাজা, জমিদারেরা জলসঞ্চয় করতে বড় বড় সায়র ও জলাধার তৈরী করতেন। গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে এখনও এরকম অনেক জলাধার দেখতে পাওয়া যায়। নদীর জল ও ভূতলের উপরস্থ জল ব্যবহার করার যথাসাধ্য চেষ্টা তোমরা করবে।

কীভাবে মানুষ এই জড়জগতকে ধ্বংস করছে তার আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে পারমাণবিক বোমার ক্রমাগত বিস্ফোরণ। পারমাণবিক বিস্ফোরণ ভূত্বকের ওপরে ও অভ্যন্তরে সৃষ্টি করছে বিশাল বিশাল গহ্বর। আবহমণ্ডলে সৃষ্টি করছে ধূসর মেঘ (black clouds) ও পরিবেশের বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য (ecological bal- ance) নষ্ট করে দিচ্ছে। এই জড়জগতও পরমপুরুষের সৃষ্টি। পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষ পরমপুরুষের মানস কল্পনাকে আহত করছে, আর এটা পৃথিবীর বাস্তুতান্ত্রিক তথা পরিবেশগত ভারসাম্যকে (ecological balance) সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

সমগ্র সৃষ্টির মঙ্গল সাধনে নব্যমানবতাবাদী নীতি হ'ল মানুষের কল্যাণ করতে হবে প্রথমে, তারপর মনুষ্যেতর জীবের, তারপর উদ্ভিদ জগতের ও তারপর অপ্রাণীন বস্তুর। একমাত্র আমিই বাঁচব এই উদ্দেশ্যে জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীদের হত্যা করা মানুষের উচিত হবে না। নিজে বাঁচবে বলে মানুষ যদি একটি গোরুকে হত্যা করে তাহলে একটা মানুষকে মেরে একটা গোরুকে কেন বাঁচতে দেওয়া হবে না? মানুষের জন্যে গোরু কেন মরবে? গো যদি মাতা হয় তাহলে যেসব মানুষ গোদুগ্ধ পান করে তারা কি গোবৎস? মহিষী ও ছাগদুগ্ধ তো অনেক মানুষ পান করে তা বলে তারাও কি মাতৃপদবাচ্য হবে? গোহত্যা বন্ধ করা উচিত কারণ গোরু উন্নততর জীব, গোমাতা এই জাতীয় ভাবাবেগের কারণে নয়। এই একই কারণে মহিষ ও ছাগ হত্যা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত।

মানুষ অন্য মানুষের দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করতে শিখেছে কিন্তু যখন একটি কুকুর কষ্ট পায় তখন কেউ তার দিকে নজর দেয় না। মানুষ ভাবে কুকুরের যেন কোনো দুঃখ-কষ্ট বোধ নেই। যেদিন মানুষ বুঝতে শিখবে যে অন্যান্য প্রাণীরাও

আনন্দ ও কষ্ট অনুভব করে, সেদিন তার সামনে প্রজ্ঞার এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হবে। মানবিক কর্ত্তব্যবোধ ও আমাদের উচ্চতর ভাবনার কারণেই সকল প্রাণীদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল হতে হবে।

সাধারণ নিয়মে কোনো অবস্থাতেই মানুষ জীবহত্যা করবে না। তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রম মানুষের জীবন বিপন্ন হলেই হবে। যেমন, যদি তুমি কোনো বাঘের সম্মুখীন হও ও তোমার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে তবে আক্রান্ত হওয়ার আগেই তুমি তাকে অনন্যোপায় হয়ে হত্যা করতে পার। সেই রকম সিংহ, সাপ, হাতি প্রভৃতি তোমাদের লোকালয়ে ঢুকে পড়লে মানুষদের জীবনের নিরাপত্তার জন্যে তোমাদের সর্বশেষ উপায় হতে পারে এই সব জীবদের হত্যা করা। কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতেই পশুদের হত্যা করা উচিত, নতুবা নয়। এর থেকে এটাই সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে পশুদের স্বাভাবিক বাসস্থানে তাদের তোমরা হত্যা করবে না। জঙ্গলে সিংহ, বাঘ, সাপ প্রভৃতি কত রকম জীবই না আছে কিন্তু তাদের সেই স্বাভাবিক বাসস্থানে তাদের হত্যা করা উচিত নয় কারণ সেখানে তারা মানুষের জীবন বিপন্ন করছে না। যদিও

কোনো কোনো বাঘের মানুষকে আক্রমণ করার স্বভাব আছে তবুও শুধুমাত্র এই কারণেই সব বাঘকে হত্যা করা উচিত নয়। আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাব না যে লুপ্তপ্রায় পশুদের ও বিপন্ন প্রাণী– উদ্ভিদ প্রজাতিদের সংরক্ষণ করতে পরিবেশ সহকার কানন (sanctuaries) তৈরী করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। এটাই নব্যমানবতাবাদের বাস্তবসম্মত জীবন দর্শন। পশু ও উদ্ভিদ জীবনের প্রতি এটাই হচ্ছে নব্যমানবতাবাদের গৃহীত নীতি।

নব্যমানবতাবাদ মনের অধিক্ষেত্র, বুদ্ধির অধিক্ষেত্র প্রসারিত করে। নব্যমানবতাবাদের চিন্তাধারা বাস্তব জীবনে রূপায়িত করার দায়িত্ব প্রাউটের।

প্রাউট, নব্যমানবতাবাদ ও আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবেই। এই ত্রয়ীর ভারসাম্য মানবীয় সংরচনাকে সত্ত্বাগত পরমাস্থিতিতে (highest existintial status) উন্নীত করবে। আমরা প্রাউটকে, নব্যমানবতাবাদকে কিংবা আধ্যাত্মিক সাধনা কোনোটাকেই অবহেলা করতে পারি না। এই ভারসাম্য সকলের জন্যে বজায় রাখতে হবে। এতে শুভচেতনা

জাগবে ও মানুষের (নৈতিক) মান আরও উন্নত হবে, যার ফলে মানুষ আরও সেবাকাজ করতে পারবে।

আধ্যাত্মিকতার পথ জাগতিক ও মানসিক জগতের চউকাঠকে অতিক্রম করে চলে। এটা দর্শনের একটি নূতন দিক, মানুষের প্রজ্ঞাসম্পদের একটা নূতন শাখা। আধ্যাত্মিকতা একটা মধ্যবর্তী পথ যা দক্ষিণ ও বামদিক-প্রাউট ও নব্যমানবতাবাদের মধ্যে সন্তুলন রক্ষা করে চলেছে। প্রাউট, নব্যমানবতাবাদ ও আধ্যাত্মিকতাকে তন্ত্রের পক্ষীরূপের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তন্ত্রের একটা ডানা নিগম ও অপরটি আগম। আধ্যাত্মিকতা এই তন্ত্রপক্ষীর তুল্য যার একটা ডানা প্রাউট আর অপরটি নব্যমানবতাবাদ। এই পাখি তার ডানা মেলে উড়ে চলেছে আনন্দের পথ ধরে পরমপুরুষের পানে।

২৫ অক্টোবর ১৯৮৯, কলিকাতা

প্রদমন, অবদমন ও দমন

বিগত দুইশত বৎসরে কিছু ব্যষ্টি, কিছু মতাদর্শ ও কিছু ঘটনা মানবসমাজকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। এতে সমাজজীবনে এসেছে প্রদমন, অবদমন ও দমন (suppression, repression and oppression)। আমরা এই প্রদমন, অবদমন ও দমনের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি আলোচনা করব। এই তিনটি মানসিক পীড়নের জন্যে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মানুষকে যথেষ্ট দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে।

গত দুই শতকে ক্যাপিটালিজম (পুঁজিবাদ) ও কম্যুনিজম (সাম্যবাদ) মানুষের সমাজে যথেষ্ট দুঃখকষ্ট নিয়ে এসেছে। ইতোমধ্যে মধ্য গগনেই কম্যুনিজমের অকাল মৃত্যু হয়েছে। ক্যাপিটালিজমের কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যুই হবে। এই কম্যুনিজমের মৃত্যু কী জন্যে হ'ল? কম্যুনিষ্ট শাসনব্যবস্থায় মানুষের ওপর জোর করে একটা অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে অসংখ্য নিরীহ মানুষের ওপর যে অকথ্য অত্যাচার ও অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা নেবে এসেছিল তারই পুঞ্জীভূত প্রতিক্রিয়ার ফলে এর অকালমৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সন্ত্রাস ও গণহত্যার তাণ্ডবলীলা চালাতে গিয়েই কম্যুনিজম মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হয়।

শান্তিপ্রিয় এই পৃথিবীতে ক্যাপিটালিজম ও কম্যুনিজম জল, বাতাস ও পরিবেশ দুষিত করে দিয়েছে। মানুষ স্বভাবতই শান্তিকামী, যুদ্ধবাজ নয়। এই ক্যাপিটালিজম ও কম্যুনিজম দু' দু'টো বিশ্বযুদ্ধ ও সাম্প্রতিককালে অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও ঘটিয়েছে।

এই দুইটি ব্যবস্থাই মানুষের মনে, অবদমন ও দমন সৃষ্টি করেছে। তবে ক্যাপিটালিজম মানুষকে যেখানে ক্রীতদাস বানায় কম্যুনিজম সেখানে মানুষকে ক্রীতদাসেরও অধম করে তোলে। ফারসী ভাষায় ক্রীতদাসকে বলে "বান্দা", আরবী ভাষায় "গুলাম"। ভারতে তোমরা গুলামযুক্ত অনেক নাম পাবে–যেমন রামগুলাম। এই গুলাম শব্দটি ক্রীতদাসের সমার্থক। তোমরা "পদ" শব্দটি অনেক নামের সঙ্গেই পাবে। এর মানে পা। পদ বলতে rank-ও বোঝায়, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও। এই কম্যুনিষ্ট শাসন ব্যবস্থায়, অবদমন ও দমনের ফলে মানুষ শুধুমাত্র ক্রীতদাসেই পরিণত হয় না, তার মনটাও জড় হয়ে যায়। সেই জন্যই কম্যুনিজমে মানবিক মূল্যবোধ বলে কিছু থাকে না। মানুষের মন জড়ের মত সংবেদশূন্য হয়ে যায়। এই অবস্থায় মানুষ তার আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে।

কম্যুনিজম স্ববিরোধিতায় ভরা। যেসব দেশে কম্যুনিষ্টরা সরকারে আসতে পারে নি সেখানে তারা গণতন্ত্রকে সমর্থন করে। অথচ কম্যুনিষ্ট শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্র বলে কিছু নেই- রয়েছে শুধুমাত্র একনায়কতন্ত্র। কম্যুনিষ্টরা বলতে পারে তারা গণতন্ত্রকে সমর্থন করে কিন্তু একবার ক্ষমতা পেলে তাতে টিকে থাকার জন্যে যে- কোনো অগণতান্ত্রিক পথ তারা নিয়ে থাকে। তারা কমিউন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা' বলে কিন্তু আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোথাও কমিউন ব্যবস্থা সফল হয় নি। তারা শ্রেণীহীন সমাজের কথা বললেও বাস্তবে কিছু বুদ্ধিজীবী লোক পার্টির শাসন চালিয়ে থাকে। কম্যুনিজম বিচারবুদ্ধিহীন ও অমানবিক মতবাদ যা মনুষ্যচেতনার পরিপন্থী।

কম্যুনিজম মানে দ্বিচারিতায় ভরা। কীভাবে? একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কমিউন ব্যবস্থা অনুযায়ী জমির মালিকানা থাকে রাষ্ট্রের হাতে কিন্তু রাঙলায় তে-ভাগা আন্দোলনে কম্যুনিষ্ট নেতারা জমির উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ কর্ষকদের জন্যে, এক-তৃতীয়াংশ ভাগ জমির প্রকৃত মালিকদের জন্য দাবী করেছিল। স্বাধীনতার আগে বাঙলার দুই জেলায়- ফরিদপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়- ভূমিহীন শ্রমিকেরা বহু

নিরীহ জমির মালিককে হত্যা করে এই তেভাগা আন্দোলনকে এক বিপজ্জনক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতার পরে কিন্তু কম্যুনিষ্ট নেতারা তাদের অবস্থান (strategy) একদম বদলে দিল। তারা প্রচার চালাল যে, জমির মালিকানা পাবে বর্গাদারেরা বা ভাগচাষীরা। বাঙলার ভাগচাষীদের তো জমি চাষ করার অধিকার ছিলই, জমি থেকে তাদের উচ্ছেদও করা যেত না। ভূমিহীন শ্রমিকদের চাইতে তাদের অবস্থা অনেক ভাল ছিল। কম্যুনিষ্টরা এই ভূমিহীন শ্রমিকদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ভাগচাষীদের জমির অধিকার সমর্থন করল। যদিও তারা ভালভাবেই জানত কমিউনিজমে একমাত্র রাষ্ট্র ছাড়া আর কারো হাতে জমির মালিকানা থাকে না। দেখলে তো কীভাবে কম্যুনিষ্টরা তাদের মূল নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে দ্বিচারিতা করেছিল।

কম্যুনিজমের শ্লোগান হচ্ছে "প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী নিতে হবে ও তার প্রয়োজন অনুযায়ী দিতে হবে", কিন্তু সমবায় ব্যবস্থায় বলা হচ্ছে "প্রত্যেকেই তার সামর্থ্য অনুযায়ী পাবে।" সমবায়ের শ্লোগানে মানুষ আরও বেশী করে কাজ করার চেষ্টা করবে। লোকে তাদের সমস্ত

প্রতিভা ও উৎসাহ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়াবে। অথচ কম্যুনিজমে নেতারা নিজেরাই কাজ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। তারা কঠোর পরিশ্রমের চাইতে অফিস ঘরে বসে থাকতেই বেশী পছন্দ করে। আর তার ফলে উৎপাদন শ্লথ হয়ে যায়। সমবায় ব্যবস্থায় কৃষিসমবায়ে চাষী যে পরিমাণ জমি চাষ করে, সেই অনুযায়ী তাকে উৎপাদনের অংশ দেওয়া হয়। কম্যুনিষ্ট শাসনে এই ধরনের উৎপাদনে অংশ নেবার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে লোকে নিজের কর্মের সঙ্গে একাত্ম হয় না। তাদের এটাই বিশ্বাস করানো হয় যে তাদের সমস্ত প্রয়োজন মেটাবে রাষ্ট্র। কাজেই তাদের কর্মে কোনো উৎসাহ বা আগ্রহ থাকে না।

প্রাউটের জন্যে সারা বিশ্ব জুড়ে একটা অনুকূল ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ এখন ভাবতে শুরু করেছে যে তাদের আর কম্যুনিজমের বস্তাপচা দর্শনে উৎপীড়িত হতে হবে না। তারা বুঝেছে বলদের মত তারা শুধু চীনী বইবে না, তাদেরও চীনী খাওয়ার অধিকার আছে। যতদিন কম্যুনিষ্ট নেতাদের হাতে ক্ষমতা ছিল তারা জনসাধারণকে দমিয়ে রেখেছিল। কিন্তু আজ জনসাধারণ শিক্ষা ও যুক্তিভিত্তিক চিন্তার ফলে তাদের

নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠছে। শিক্ষা ও যৌক্তিক চিন্তা এ দু'টোই যদি থাকে তবে জনসাধারণ অতি অবশ্যই দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। এমনকি এদের মধ্যে কোনো একটির অস্তিত্ব থাকলেও জনসাধারণ অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়বে।

ইতোমধ্যেই জনসাধারণ বস্তাপচা কম্যুনিজম দর্শনকে বাতিল করে দিয়েছে, ও এর ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ করতে উদগ্রীব হয়ে আছে। আমাদের আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এই শূন্যতাকে শীঘ্রাতিশীঘ্র প্রাউট দিয়ে পূরণ করতে হবে।

যদি প্রাউট দর্শন না আসত তা হলে কম্যুনিজমকে অপসারণ করতে আরও তিরিশ বৎসর লেগে যেত। যেদিন আমি প্রাউটের পাঁচটি মূল সিদ্ধান্ত তৈরী করেছি সেই দিনই আমি বুঝেছিলুম যে এটাই হবে কম্যুনিজমের মৃত্যুবাণ। কম্যুনিজমের আয়ু কম করেও তিরিশ বৎসর হ্রাস পেয়ে তার অকাল মৃত্যু হ'ল। প্রাউট এসেছে ১৯৫৯ সালে আর কম্যুনিজম ভেঙ্গে পড়ে ১৯৮৯ সালে। প্রাউট না এলে কম্যুনিজম আরও

৩০ থেকে ৩৫ বৎসর বেঁচে থাকতে পারত। কিন্তু এখন কম্যুনিজমকে জায়গা ছেড়ে সরে যেতে হবে।

কম্যুনিজম নেতারা পাশবশক্তির সাহায্যে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় কিন্তু প্রাউটে আমরা নিঃস্বার্থ সেবা দিয়ে মানুষকে উদ্দীপিত করব। কম্যুনিষ্টরা নিঃস্বার্থ সেবা করা সমর্থন করে না। তারা বিশ্বাস করে যে জনসাধারণকে নিঃস্বার্থ সেবা দিলে তারা বর্তমান অবস্থাতেই তৃপ্ত থাকবে, বিপ্লব আর করবে না। কিন্তু এই বিশ্বাস ভুল। বাঙলার মহামন্বন্তরে অনাহারে ৫০ লক্ষেরও বেশী মানুষ মারা গিয়েছিল কিন্তু তারা [বাঙলার মানুষেরা] বিদ্রোহ করেনি। যদি তোমরা সেবা দাও, যদি তোমরা মানুষকে শিক্ষা দাও ও তাদের বিচারবুদ্ধি জাগিয়ে তুলতে উৎসাহ দাও, তবে তারা যে-কোনো অমানবিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। অসংগঠিত ও বিচারবুদ্ধিহীন মানুষ কখনও বিপ্লব করতে পারে না।

ভাল মানুষেরা যেখানে অত্যাচারিত হয় ও যে শাসনব্যবস্থা সেটা সমর্থন করে তা ধ্বংস হতে বাধ্য। পৃথিবীতে অনেক শুভচেতনা সম্পন্ন মানুষ আছেন যাঁরা ভাল কাজ করতে চান।

তোমাদের উচিত সেইসব মানুষকে বুঝিয়ে সংঘৰদ্ধ করে নিপীড়িত মানবতার সর্বাধিক সেবায় নিয়ে আসা।

মার্ক্স ভাল মানুষ ছিলেন। নিপীড়িত মানবের জন্যে তাঁর মনে প্রবল সহানুভূতি ছিল ও সেই ৰাধ্যবাধকতায় তিনি তাঁর তত্ত্ব লিখেছিলেন। অবশ্য তাঁর সেই তত্ত্ব বাস্তবানুগ ছিল না। এই তত্ত্ব প্রচারের সময় তিনি বোঝেন নি তাঁর তত্ত্ব কতদূর পর্যন্ত বাস্তবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। মার্ক্সের লেখা বইগুলিতে নিপীড়িত মানবতার প্রতি তাঁর প্রবল সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে ও বহু মানুষ তাতে প্রভাবিত হয়েছে। লেনিন ও মাও-এর মত নেতারা সমাজে তাঁর তত্ত্বকে রূপায়িত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁরা লোক হিসেবে খারাপ ছিলেন না। কিন্তু মার্ক্সের তত্ত্ব বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁদের অনেক বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তত্ত্বটি ত্রুটিপূর্ণ বুঝতে পেরে তাঁরা মরিয়া হয়ে ওঠেন ও বলপ্রয়োগ শুরু করেন। **ষ্ট্যালিন লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিলেন। তিনি একটা দানব হয়ে উঠেছিলেন।** এ সব কিছুই হয়েছিল মার্ক্সবাদের অন্তর্নিহিত ত্রুটির জন্য।

মার্ক্সবাদ এখন সারা পৃথিবীতে থেকে উৎখাত হচ্ছে। শুধুমাত্র ভারতের পশ্চিম বাঙলায় কম্যুনিজম এখনও টিকে আছে। কম্যুনিজমের আদি, মধ্য ও অন্ত সবটাই ত্রুটিপূর্ণ। এটা একটা বিশেষ ধরনের মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এতে আক্রান্ত ব্যষ্টিরা সবকিছু করতে পারে। যে-কোনো কারণে এরা অন্যকে খুন করতে পারে। এমনকি তারা আত্মঘাতীও হতে পারে।

কম্যুনিজমে ভাল কিছু থাকলেও-আমি বলছি না আছে তবুও ধরে নিচ্ছি আছে-লোকে কিন্তু গণতন্ত্রকেই চায় কারণ কম্যুনিজমকে তারা সহ্য করতে পারে না। আজকে চেকোশ্লোভাকিয়ার উদাহরণটাই দেখ না কেন। গণতন্ত্রে ত্রুটি আছে সন্দেহ নেই ও জনসাধারণ এই ত্রুটিগুলি ৰোঝেও কিন্তু তবুও তারা গণতন্ত্রকেই চায় কারণ কম্যুনিজম থেকে সেটা ভাল। প্রাউট সীমিত অর্থে গণতন্ত্রকে সমর্থন করে। আমরা সীমিত (restricted) গণতন্ত্রকে সমর্থন করি কারণ ভবিষ্যতে আরও উন্নত ধাঁচের সরকার আসবে। কিছু কিছু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সাময়িকভাবে অন্য সব চাইতে ভাল।

কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে তোমরা প্রদমন, অবদমন ও দমনের একটা ত্রিভুজ পুরোপুরি কার্যকরী দেখতে পাবে। এই তিনটি ত্রুটির ওপর কম্যুনিজম আধারিত। কিন্তু এই তিনটি ত্রুটির মধ্যে সব চাইতে বেশি ঘটেছে দমন, তারপর ঘটেছে অবদমন ও সব চাইতে কম ঘটেছে প্রদমন। এই প্রদমন, অবদমন ও দমনের ফলে সৃষ্ট শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে জনসাধারণকে অবশ্যই মুক্তি দিতে হবে। এই তিনটি মানসিক পীড়ন মানুষের মনকে ভেঙ্গে চুরে তছনছ করে দিয়েছে।

মানুষের মনের স্বভাবই হচ্ছে সে বিস্তার লাভ করতে চায়। কিছু বিরুদ্ধশক্তি আছে যা মনের বিস্তারে বাধা দেয় তবুও মন বিস্তারের চেষ্টা করবেই। মানুষের মনের এই বিস্তার লাভের আকাঙ্ক্ষাকে আটকে বন্ধ করে দিতে যে শক্তির প্রয়োগ হয় সংস্কৃতে তাকে বলা হয় "প্রদমন”।

যখনই তুমি নিজের অনুভূতিকে ব্যক্ত করার স্বাধীনতা চাইবে অথবা যখনই তুমি একটা ভয়শূন্য মুক্ত পরিবেশ চাইবে তখনই তাতে হুমকী ও ৰাধা আসে। উদাহরণ- স্বরূপ বলা যায় ইশ্লামিক দেশে মেয়েরা খেলাধুলায় অংশ নিতে চায় কিন্তু তাতে তাদের বাধা আছে। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে অনেক লোক আছে

যারা কম্যুনিজমের সমালোচনা করতে চায় কিন্তু তা করা সম্ভব হয় না কারণ তারা জানে যে তা করতে গেলেই তাদের শ্রম শিবিরে (concentration camp) পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এমন অনেক জায়গাও আছে যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে গান-বাজনা করতে চায় কিন্তু তা করতে গেলেই শাস্তি পেতে হয়। সংস্কৃতে এই ধরনের বাধাপ্রয়োগকে বলা হয় "অবদমন"।

অবদমন সরাসরি অবচেতন মনকে প্রভাবিত করে। এতে মানুষের মানসিক সংরচনা ধীরে ধীরে ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও শেষ পর্যন্ত মনটা পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়। এর ফলে মানুষের মনে পরাজিত মনোভাব ও হীনম্মন্যতা ঢুকে যায়। তোমাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কোনো এক হরিজন স্কুলের প্রধান শিক্ষক একদিন একটি ছাত্রকে খাবার জল আনতে বললেন কিন্তু ছেলেটি গেল না। সে তার হরিজন নয় এমন এক বন্ধুকে নিচু গলায় সেই জল আনতে বলল। কিন্তু প্রধান শিক্ষক তাতে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন সে নিজে জল আনতে যাচ্ছে না। উত্তরে ছেলেটি বলল, "স্যার, আমি অস্পৃশ্য জাতির ছেলে। আমার ছোঁয়া জল আপনি কেমন করে

খাবেন?" অবদমন মনকে কীভাবে বদলে দেয় এটা একটা উদাহরণ।

এই মনস্তত্ব দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষে রয়েছে। তথাকথিত নিচুজাতির লোকেরা ভয়ে তোমাকে এক গ্লাস জল দিতে অস্বীকার করবে কারণ হীনম্মন্যতার মনস্তত্ব শত শত বৎসর ধরে তাদের মনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তথাকথিত অন্তজ শ্রেণীর মানুষেরা লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা পেয়েছে। ফলে তাদের মন অসাড় হয়ে গিয়েছে। মর্মান্তিক ভাবে এই দশাকে তারা নিজেদের ভাগ্যফল বলে মেনে নিয়েছে।

যখন তুমি কোনো কিছু কাজ করে ফেলেছ বা করার চেষ্টা করেছ তখন তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হয়, যার ফলে তোমার কিছু করার মানসিকতা চিরকালের মত হারিয়ে যায়। সংস্কৃতে এই ধরনের ৰাধাকে বলা হয় "দমন"।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রদমন, অবদমন ও দমন ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। আর্যেরা প্রচুর পরিমাণে দুধ, ঘি, চাল প্রভৃতি দিয়ে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করত। এই সব খাদ্যদ্রব্য অনার্যদের কাজ থেকে জোর করে আদায় করা হত

বলে তারা খাদ্যাভাবে কষ্ট পেত। ফলে অনার্যরা খাদ্যদ্রব্য উদ্ধার করার জন্যে আর্যদের যজ্ঞস্থলে আক্রমণ চালাত। অনার্যরা কি অন্যায় কিছু করত? না। কিন্তু আর্যেরা এই ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছিল যে অনার্যরা রাক্ষস-দানব। এইভাবে অনার্যদের মধ্যে হীনম্মন্যতা ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

পৌরাণিক মহাকাব্য রামায়ণের রাম ছিলেন আর্যশ্রেষ্ঠতার প্রতিভূ আর রাবণ ছিলেন অনার্যদের প্রতিনিধি। রামকে বলা হয় "মর্যাদা পুরুষোত্তম"। "মর্যাদা পুরুষোত্তম" কী? যখন পরমপুরুষ এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন তখন মানবদেহ ধারণ করলেও তাঁর ধর্ম ও আচরণ পরমপুরুষের সমানই হয়। "মর্যাদা পুরুষোত্তম"-এর এটাই অর্থ। তা হলেও রাম কিন্তু পরমপুরুষের মত আচরণ করেন নি। তিনি সেই মানে পৌঁছান নি। **অনার্য শূদ্রক যখন তপস্যা করছিল, তাকে তিনি হত্যা করেছিলেন।** আর্য শ্রেষ্ঠত্বাভিমানেই তিনি শূদ্রককে বধ করেছিলেন। তৎকালীন যুগে লোকে বিশ্বাস করত যে অনার্যরা নয়, আর্যরাই একমাত্র পুজো- পাঠ করার অধিকারী। কিন্তু এই গোঁড়ামি সমর্থন করা যায় না। অনার্যরাজ রাবণকে

রামায়ণে রাক্ষস বলা হয়েছে কিন্তু তাঁর আচরণ মোটেই রাক্ষসসুলভ অশিষ্ট ছিল না। তিনি সীতাকে অপরহরণ করে নিজের প্রাসাদে নিয়ে যান নি। বরং কিছু অনুচরীসহ সীতাকে একটি স্বতন্ত্র জায়গায় রেখেছিলেন। তিনি সত্যসত্যই খারাপ লোক হলে এ রকমটা করতেন না। তা সত্ত্বেও রাম তাঁকে হত্যা করেছিলেন। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে রাম পরমপুরুষ ছিলেন না।

প্রদমন, অবদমন ও দমননীতি আর পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের তাণ্ডবের ফলে সারা বিশ্বের মানুষকে প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। যেখানেই প্রদমন, অবদমন ও দমন থাকে সেখানেই মানুষকে জড়তা বা অন্ধ কুসংস্কারের (dogma) পথ ধরতে বাধ্য করা হয়। কম্যুনিজম ভাবজড়তা (dogma) প্রচার করে, ক্যাপিটালিজমও ভাবজড়তা প্রচার করে, ও শাস্ত্রনির্ভর তথাকথিত ধর্মমতগুলি ভাবজড়তা প্রচার করে। এখন মানবমনে একটা তৃতীয় মানসশক্তির অভ্যুদয়ের সময় এসেছে যেখানে প্রদমন, অবদমন ও দমন আর থাকবে না। মানবমনের ইপ্সিত উন্নতি হোক, মন হোক ভয়মুক্ত। সমন্বয় ও সহযোগিতা ভিত্তিক মানবসমাজ গড়ে উঠুক।

মানবসমাজের এটাই পরিণত অবস্থা। আমরা সেই অরুণোদয়ের অপেক্ষা করছি। এখন সেই রশ্মির দেখাও পাওয়া যাচ্ছে। সে আলোকরশ্মি প্রাউটেরই।

১৩ নবেম্বর ১৯৮৯, কলিকাতা

হিম যুগ আসছে

ইতিহাস এগিয়ে চলে তরঙ্গায়িত ছন্দে উহ-অবোহের দোলায়। সে চলে আর চলে তারপর দেয় একটা লাফ, আবার সে চলে, আবার দেয় লাফ। এই গতিতেই সে চলতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ এক সময় তার এই চলনটা যায় বদলে। তার গতিতে, আসে অতিরিক্ত দ্রুতি। সে তখন চলতে থাকে লাফিয়ে লাফিয়ে। শুরু হয় নোতুন যুগের সূচনা। আমরা

এখন এ রকমই এক বিরাট পরিবর্তনের প্রবেশদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছি। না, আমরা শুধুমাত্র এক নোতুন যুগের প্রবেশদ্বারেই উপস্থিত হইনি। আমরা সেই প্রবেশদ্বার অতিক্রম করেও ফেলেছি। বস্তুতঃ আমরা এখন একটা নোতুন যুগের মধ্য দিয়ে চলেছি। তোমরা কি তা অনুভব করতে পারছ? এখন তোমাদের বিরাট বিরাট পরিবর্তনের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। নতুবা ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে।

চলার পদ্ধতিতে গতি কখনও একটানা থাকতে পারে না। গতি সবসময়েই সঙ্কোচাত্মক ও বিকাশাত্মক হয়। গতি কখনও দ্রুত-আরও দ্রুত হয়। আবার কখনও বিলম্বিত-আরও বিলম্বিত হয়। এই ত্বরণ ও অবত্বরণের সঙ্গে থাকে উল্লম্ফন। এই উল্লম্ফনের আগে ও পরে জীবদেহে, ইতিহাসে, কৃষিকার্যে ও মানুষের মানসভূমিতে পরিবর্তন ঘটে থাকে।

প্রাণের বিকাশের দিক থেকে বিচার করলে পৃথিবীর ইতিহাসে দুইটি হিম যুগ উল্লেখযোগ্য। প্রথম হিম যুগের আগে পৃথিবীতে উন্নত প্রাণী প্রায় ছিলই না। শুধুমাত্র অনুন্নত প্রাণী ছিল। তারপর সব কিছু ঢাকা রইল বরফ আর তুষারে। প্রথম হিম যুগ শেষ হওয়ার পর অনেক বছর ধরে বিরাট

পরিবর্তন চলল। প্রাণীরা সব হয়ে গেল বিশালকায়। আবার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য হিম যুগের পর বিশালকায় প্রাণীরা সব অবলুপ্ত হ'ল–এল ক্ষুদ্র আকৃতির প্রাণী। প্যালিওসিন (Paleocene), অলিগোসিন (Oligocene) ও মায়োসিন (Miocene) যুগ এল।

আমরা জানি পৃথিবীতে আরেকটা হিম যুগ আসছে। এটা পৃথিবীর পরিকাঠামোর পুরো পরিবর্তন আনবে। এই হিম যুগ আসার আগেই মানুষ ও পশু, প্রাণীন ও অপ্রাণীন সকল সত্তার বৌদ্ধিক ও শারীরিক বিরাট পরিবর্তন হবে। ঋতুর পরিবর্তন, মানসিক পরিবর্তন, সামাজিক–অর্থনৈতিক–রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, জীবদেহে পরিবর্তন–এসব তোমরা দেখবে। সব কিছুরই রূপান্তর ঘটছে। **দুই মেরুর অবস্থানের পরিবর্তন শুরু হয়েছে। তোমরা কি এ সবের জন্যে প্রস্তুত?**

আগামী হিম যুগের পর ক্রান্তিবলয়ের অঞ্চলগুলির পরিবর্তন হবে ও বিপুল পরিমাণে জৈবিক পরিবর্তন হবে–একটা বিশেষ বর্গের সৃষ্টি হবে। তোমরা কি অনুভব করতে পারছ যে ঋতুচক্রের পরিবর্তন হচ্ছে ও তাতে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে? উত্তর মেরু পূর্ব গোলার্ধে বিপরীত ক্রান্তি

অঞ্চলের দিকে সরছে আর দক্ষিণ মেরু পশ্চিম গোলার্ধে বিপরীত ক্রান্তি অঞ্চলের দিকে সরে, আসছে।

যদি পূর্ব গোলার্ধে উত্তর মেরু উত্তর থেকে দক্ষিণে সরে ও পশ্চিম গোলার্ধে দক্ষিণ মেরু উত্তর দিকে সরে তবে পৃথিবীর জলস্তরের ওপর তার কী প্রভাব পড়বে? মেরু অঞ্চলের সমস্ত বরফ গলে যাবে ও সমুদ্রের জলস্তরের উচ্চতা বাড়বে। সারা পৃথিবী জুড়ে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ওপর এর প্রভাব পড়বে। প্রশান্ত মহাসাগর ঠাণ্ডা হতে থাকবে ও তারপর একদম জমে যাবে। বর্তমানে চালু অনেক সামুদ্রিক বন্দর বন্ধ হয়ে যাবে। ঋতুর অনুক্রম বদলে যাবে। বৃষ্টিপাত ও আবহাওয়ার পরিবর্তন উদ্ভিদ ও জীবকূলে বিরাট প্রভাব ফেলবে। এইসব কিছু মিলে একত্রে চিন্তনের ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব ফেলবে। সৌরবর্ষে দিনের সংখ্যা ইতোমধ্যে ৩৬৫ থেকে ৩৬৬ হয়েছে কিন্তু চান্দ্রবর্ষে দিনের সংখ্যা সেই ৩৫৪- ৩৫৫-তেই অপরিবর্তিত রয়েছে।

বুদ্ধিমান ব্যষ্টি হিসেবে অবশ্যই এ ধরনের অবশ্যম্ভাবী বিপুল পরিবর্তনের জন্যে তোমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। আগে কলকাতায় (কালবোশেখী) ঝড় হত সন্ধ্যা ছটা থেকে নটার

মধ্যে। কিন্তু এখন বিকেল মাত্র ৪-১৫ মিনিট অথচ ঝড় উঠেছে। ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে আর তাই আবহাওয়ারও বিরাট পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে।

কোনো একসময় পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত মানুষের এটাই ধারণা ছিল যে সাম্যবাদই (communism) তাদের সমস্ত সমস্যার একমাত্র সমাধান। কিন্তু কম্যুনিষ্ট নেতারা মনুষ্যত্ব, বিচারবোধ ও মানসিক মনস্তত্ত্বের বিরুদ্ধাচরণ করেছে ও মানবসভ্যতার মূল ভিত্তিতে আঘাত হেনেছে। ফলে জনসাধারণ এখন লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। কম্যুনিষ্ট শাসকদের পতনের ফলে আদর্শের ক্ষেত্রে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এই শূন্যতাকে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও আদর্শ দিয়ে পূরণ করতে হবে। এটা তোমরাই করবে, আর তা হবে প্রাউটের দ্বারা। এ কাজ অদূর ভবিষ্যতেই করতে হবে। দেরী করার সময় আর নেই- নেই কোনো বিকল্পও।

মার্কসবাদ কেন পরিবর্তিত হচ্ছে? জীবনের সর্বক্ষেত্রে রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। রূপান্তর শুধুমাত্র বস্তুজগতেই ঘটছে না, মানসিক স্তরেও সেটা ঘটছে। মানসিক স্তরে ও জীবনের

অভিপ্রকাশের সকল স্তরে পরিবর্তন অত্যন্ত দ্রুত আসছে। তারা শুধু আসছে না, তারা এসেও গেছে। আমরা এক নোতুন যুগের প্রবেশদ্বার পার হয়েও গিয়েছি।

প্যালিওজোয়িক (Paleozoic) যুগে কোনো বৃষ্টিপাত ছিল না। বৃষ্টির জলও ছিল না। গ্যাসীয় পৃথিবীতে ছিল না কোনো গাছপালা। তোমাদের সরকার–সমাজ ছিল না, রয়্যালসীমা সমাজ ছিল না। অন্ধ্র ভূখণ্ডটাই ছিল না। অনেক পরে অন্ত্রের একটা অংশ ও ছোট প্রাণীরা এল। কিন্তু তখনও কোনো সৈকতভূমি ছিল না আর বিশাখাপত্তন ছিল না। মেডাক কিন্তু ছিল। এরপর প্রচুর বৃষ্টিপাত হ'ল। ক্রমে পাহাড়গুলি তুষারে ঢেকে গেল ও নদীগুলো বরফজলে পুষ্ট হ'ল। গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীগুলি বরফজলে পুষ্ট ছিল। নদীগুলি স্থায়ী জলের উৎস ছিল। কিন্তু তখন কোনো মানুষ ছিল না। এই হচ্ছে একনজরে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস। ডাইনোসোরাস, ব্রুন্টোসোরাস প্রভৃতি অনেক বড় বড় প্রাণী এসেছিল। তারপর এল অলিগোসিন (Oligocene) ও মায়োসিন (Miocene) যুগ। এরপরে প্লায়োসিন (Pliocene) যুগের শেষ ভাগে এল মানুষের পূর্বসূরী। মানুষের প্রথম জন্ম হয়েছে প্রায় দশ লক্ষ বৎসর

আগে। প্রায় দশ লক্ষ বৎসর পরে এই গ্রহে কোনো মানুষই থাকবে না। ভবিষ্যতের প্রজন্মের বর্তমান প্রজন্মেরা শুধুমাত্র কঙ্কালের জীবাশ্ম দেখতে পাবে।

এই পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস পরিব্যক্তি (mutation) ও উপস্কৃতির (transmu- tation) মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। পরিব্যক্তি (mutation) ও উপস্কৃতি (transmutation) শুধুমাত্র বস্তুজগতেই হয় না, জীবিত প্রাণীর মানসিক ক্ষেত্রেও হয়। অজৈব পদার্থের বিকাশোন্মুখ সুপ্ত মানসসত্তারও পরিবর্তন হয়। প্রাণীন ও অপ্রাণীন বস্তু অভিপ্রকাশের অপেক্ষায় আছে। প্রথম হিম যুগের পর মানস ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন হয়েছিল। বৃহৎ প্রাণীদের আবির্ভাব হয়েছিল। আবার দ্বিতীয় হিম যুগের পর আরেকটা বিরাট পরিবর্তন হ'ল। বৃহৎ প্রাণীদের অস্তিত্ব আর রইল না। ছোট জন্তুরা এল। ম্যামথ হয়ে গেল হাতি।

বর্তমান যুগটা বড় জন্তু আর ছোট রাষ্ট্রের জন্যে নয় কারণ বড় জন্তুদের খাদ্য পাওয়া কঠিন হবে আর ছোট রাষ্ট্রের সংহতি রাখা মুস্কিল হবে। দ্বিতীয় হিম যুগের পর ম্যামথ অবলুপ্ত হ'ল ও হাতির আবির্ভাব হ'ল। কৃষ্ণা, কাবেরী ও তুঙ্গভদ্রা নদী আজ ভারতীয় অন্তরীপের অংশ কিন্তু আজ

থেকে ৩০ কোটি বৎসর আগে তারা গণ্ডোয়ানা ভূখণ্ডের অংশ ছিল। মানুষ পৃথিবীর বুকে এসেছে আজ থেকে প্রায় দশ লক্ষ বৎসর আগে। এ সবই পরিব্যক্তি (mutation) ও উপস্কৃতির (transmutation) উদাহরণ।

বর্তমানে সাম্যবাদ (communism) অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। উন্নততর চিন্তাধারা ও উন্নততর মানসিক লব্ধির সুযোগ এসেছে। এই পরিবর্তনটা সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক। এটা কোনো বিপর্যয় নয়। অন্য দর্শনগুলোও নিশ্চিতরূপে পরাভূত হবে। কয়েক বৎসর আগে বলেছিলুম যে সাম্যবাদকে (communism) অবশ্যই সরে যেতে হবে। তখন মনে হয়েছিল যে এটা একটা স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু সেই স্বপ্নই আজ বাস্তবায়িত হয়েছে। এই পরিবর্তনটা স্বাভাবিক। এটা কোনো আকস্মিক বিপর্যয় নয়। আগামী পরিবর্তনের জন্যে প্রস্তুত হও ও তার প্রস্তুতি নাও। এটাই স্বাভাবিক। এদের কখনও নজিরবিহীন দুর্যোগ বা বিরাট বিপর্যয় অথবা ভীষণ প্রতিকূল অবস্থা বলে ভাববে না।

২৪ মার্চ ১৯৯০, কলিকাতা

দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলো

এই পৃথিবীতে সারা বিশ্বে হাওয়া আমাদের অনুকূলে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবতার জন্যে কোনো কিছু করার এটাই উপযুক্ত সময়। এই সন্ধিক্ষণে এক মুহূর্ত একশত বৎসরের সমান। তাই বর্তমান পরিস্থিতিকে কাজে লাগাও। প্রবল উৎসাহের সঙ্গে তোমার কর্তব্য করে যাও। তোমাদের কাজের গতিকে দ্রুততর করতেই হবে।

বুদ্ধি আর জাগতিকতা–এই দু'টির মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক; একটি ছাড়া আর একটির অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। আরকোনো জড় বস্তু যেমন জল, তার নিজস্ব বুদ্ধি নেই। জড়বস্তু ভূমাসত্তার ইচ্ছায় পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রতিটি জীবিত সত্তার অণুমন আছে। তাই মানুষ পরমপুরুষ ছাড়া থাকতে পারেনা।

জড়বাদী তত্ত্ব কম্যুনিজম আজ মৃতপ্রায়। এই শূন্যস্থান পূরণ করতে না পারলে অন্য কোনো দানবীয় তত্ত্ব তার স্থান দখল

করে নেবে। এটা নিশ্চয়ই কাম্য নয়। তাই তুমি অলস হয়ে বসে থাকতে পার না। তোমাকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলতে হবে। কম্যুনিজমের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে তার অবিবেচনাপূর্ণ, অমানবিক ও মনস্তত্ত্ববিরোধী তত্ত্ব।

তোমার অধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমিকে সুদৃঢ় করতে হবে। বেদোত্তর যুগে জড়বাদী চার্বাক দর্শন আসলে আধ্যাত্মিকতাকেই শক্তিশালী করেছে। ঠিক তেমনি গত তিনশ বছরে যে আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমি হারিয়ে যেতে বসেছিল তাকে শক্তিশালী করার জন্যেই কম্যুনিজমের আগমন। কোনো প্রকৃত ঈশ্বরকেন্দ্রিক দর্শনের (God- Centred Philosophy) অস্তিত্ব ছিলনা। যা কিছু তত্ত্ব বা দর্শন ছিল তারা অধিকাংশই ছিল ভাবজড়তা কেন্দ্রিক (Dogma-Centred) বা আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক (Self-centred)। কিছু কিছু দর্শন আবার ভৌম–ভাবাবেগ (Geo-Sentiment) বা ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক ভাবাবেগ (Socio-sentiment) বা রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবার ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছে। তাদের অনতিবিলম্বে চলে যেতে হয়েছে। এই ধরনের সব তত্ত্ব বা দর্শনকেও চলে যেতে হবে। তাই তোমরা গতিশীল হও। মনে রাখবে গতিই বিশ্বের বিধান।

বৈদিক যুগে সামাজিক সাম্য ছিল কি? না, সে যুগে বিভিন্ন গোত্র, tribes-এর অস্তিত্ব ছিল। বেদোত্তর যুগেও কি সামাজিক সাম্য ছিল? না, কেননা সেই সময় জাত–ব্যবস্থা (Cast-system) বজায় ছিল। বুদ্ধের পূর্বে মহাভারতের যুগে জাত–ব্যবস্থা ছিল যদিও তার কঠোরতা ছিল না। তবুও বিদূর সিংহাসন পেলেন না কেননা তাঁর মা ছিলেন বৈশ্যকুলের। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন নিয়মমাফিক রাজা কিন্তু তিনি জন্মান্ধ হওয়ায় কার্যতঃ রাজকার্য চালাতেন পাণ্ডু। জারজ সন্তান হওয়ায় কর্ণকেও রাজা হতে দেওয়া হয়নি যদিও সে ব্যাপারে তাঁর কোনো অন্যায় ছিল না।

বুদ্ধের সময় ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে সমতা যদিও বজায় ছিল কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থায় অসাম্য ছিল। বুদ্ধ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দীক্ষিত করার পরেও তারা জাতিগত পরিচয় ত্যাগ করেনি। এমনকি বুদ্ধের মৃত্যুর পরে তার চিতাভস্মের অধিকার নিয়ে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছিল। তৎকালীন মগধরাজ দাবী করলেন, যেহেতু বুদ্ধ ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশজাত, তাই তাঁর চিতাভস্মের অধিকার একমাত্র ক্ষত্রিয়দেরই আছে।

বুদ্ধের পরে, পৌরাণিক ব্যবস্থায় জাতিভেদ অত্যন্ত প্রবল ছিল; আজও জাতপাত দূর হয়ে যায় নি। আমরাই প্রথম তীব্রতর ভাবে এর বিরোধিতা করেছি। প্রতিটি মানুষের মধ্যে দোষগুণ থাকবেই। তাই জাতপাতের পেছনে কোনো যৌক্তিকতাই নেই। যারা এই জাতিবিভাজন জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল তারা ছিল পাপী ও বিকৃত মনোভাবসম্পন্ন দৈত্যবিশেষ।

যখন মানসিক বিকাশ ও আধ্যাত্মিক বিকাশ এই দুইয়ের কোনো একটির চেয়ে জড়শক্তির গতি বেশী হয় তখন সমাজ চরম নিষ্পেষণের কবলে পড়ে। যার একটি উদাহরণ কম্যুনিজম। আবার যখন আধ্যাত্মিকতার চেয়ে মানসিক বিকাশের গতি বেড়ে যায় তখন বুদ্ধিবৃত্তির কোনো অবলম্বনই থাকে না। উদাহরণস্বরূপ পৌরাণিক যুগে যদিও কিছুটা ৰৌদ্ধিক বিকাশ ছিল কিন্তু সমাজ ভাবজড়তায় দীর্ণবিদীর্ণ, ছিল। তাই যখন মুসলিম শক্তি ভারত আক্রমণ করল, তা ঠিকমত প্রতিহত করা সম্ভব হল না।

পৃথিবী দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। মানসিক বিকাশও তেমনি দ্রুততর হয়েছে। এটা বুঝে তোমাদের কর্তব্য

সম্পাদনের দ্রুতিও বাড়িয়ে দাও। আর নিজেরা এই পরিবর্তিত দ্রুতির সঙ্গে উপযুক্ত সঙ্গতিবিধান করে চল। সর্বক্ষেত্রেই মানবীয় মনস্তত্ত্ব পরিচালিত হবে স্থিরবুদ্ধি ও বিচারশীলতা দ্বারা। বিশ্ব চলবে মানবিকতার বিধানে।

২৫ মার্চ ১৯৯০, কলিকাতা

ভারতীয় ভাষাসমূহের ক্রমবিবর্তন

অনেকদিন আগে আমি বলেছিলুম যে মানুষের জীবন একক একটি ফুলের মত হওয়া উচিত নয়। হওয়া উচিত গন্ধেভরা নানা বর্ণের ফুলের একটি স্তবকের মত। প্রতিটি ফুল তাতে যেন পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হওয়ার সুযোগ পায়। নানা গুণে ও বৈচিত্র্যে ভরা এই জীবনও ওই বর্ণময় ও গন্ধযুক্ত ফুলগুলির মতই।

আমি বলেছিলুম যে শিল্পকলা হচ্ছে সেবা ও কল্যাণের জন্যে (Art is for service and blessedness), শুধু নিজের মধ্যেই তার চরিতার্থতার জন্য নয় (not merely for Art's sake)। বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি সেই একই কথা বলি। কিন্তু তোমরা জান যে, বিজ্ঞানে কিছু কিছু অভিব্যক্তি আছে যা মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের চেয়ে বস্তুজগতের সঙ্গে বেশী সম্পর্কিত। যেখানে বিজ্ঞানে মানুষের ভাবাবেগ, ভাব অথবা আদর্শগত বিষয় সম্পর্কিত হয় সেখানে এর প্রয়োগ হবে সংশ্লেষণাত্মক। কিন্তু যেখানে এটা বেশী পরিমাণে জাগতিক জীবন সম্পর্কিত হয়, জড়াত্মক হয় সেখানে প্রয়োগটা হওয়া উচিত সংশ্লেষিত- বিশ্লেষণাত্মক। তার মানে চরিত্রগতভাবে বিশ্লেষণাত্মক হলেও বিজ্ঞান কখনই মানুষের মৌলিক স্বার্থবিরোধী হবে না। তা মনুষ্যসত্ত্বার মূল ভরকেন্দ্রের বিরুদ্ধে যাবে না।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণটাই নেওয়া যাক্। চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রাচীনতম রূপ হচ্ছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র ও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রচলিত দেশীয় পদ্ধতি। **বিভিন্ন পদ্ধতির চিকিৎসা-বিধানগুলির (therapies) একটি সাধারণ**

মিলনবিন্দু বা ভূমি (common point) আছে। কাজেই থেরাপীগুলির ক্ষেত্রে আমাদের সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী নিতে হবে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে থেরাপীগুলিকে একটি সাধারণ মঞ্চে, একটি বিদ্যার পরিভূতে নিয়ে আসা যায়। নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এগুলিকে সংশ্লেষিত-বিশ্লেষণাত্মক ক্রমে (order) আনা দরকার। চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি এটাই বলতে চাই।

অন্যান্য বিজ্ঞান বা অর্ধ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গী নিতে হবে। যেগুলির ভাবাবেগের অংশ (sentimental portion), ভাব বা আদর্শের অংশটুকু (idea or ideological portion) হবে সংশ্লেষণাত্মক আর বাকী অংশটুকু হবে ক্রমানুসারী সংশ্লেষিত-বিশ্লেষণাত্মক। এই পদ্ধতি (approach) জীববিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান (Geology), পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞান (Astro- Physics) ও জ্যোতিরঙ্কশাস্ত্রের (Astro-Mathematics) মত বিদ্যার ক্ষেত্রেও অনুসরণ করতে হবে।

ধ্রুপদী ভাষাগুলির ক্ষেত্রে তাদের ঋদ্ধভাষা অথবা অতীত ইতিহাসের ঘটনাবলী শুধুমাত্র 'ঘটনাপঞ্জী' হিসেবে না শিখিয়ে

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার যোগসূত্র হিসেবে, মানবতার উদ্বোধক হিসেবে শেখানো উচিত। কিছু কিছু প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের মত ধ্রুপদী পর্যায়ে উঠতে পারে নি। সংস্কৃত ধ্রুপদী অথচ অতি প্রাচীন ভাষা-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত ভাষাগুলির মূল ভাষা। উত্তর ভারতের সমস্ত ভাষা ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের ওড়িয়া, মারাঠী, কোঙ্কনী ভাষাগুলির মূল উৎস হচ্ছে সংস্কৃত। কন্নড়, তামিল, মালয়ালম ও তেলেগু সহ পাঁচটি ভাষায় সর্বনাম, ক্রিয়ারূপ ও শব্দরূপ দ্রাবিড়ীয় কিন্তু তাদের শব্দসম্ভার অর্ধ-সংস্কৃত। এই ভাষাগুলিতে প্রাচীন দ্রাবিড়ীয় ও সংস্কৃত শব্দসম্ভাবের ব্যবহার আছে। তবে সংস্কৃত শব্দসম্ভার সব চাইতে কম আছে তামিল ভাষায় (৭%) ও সব চাইতে বেশী আছে মালয়ালম ভাষায় (৭৪%)। প্রাচীন তামিল ভাষা ৫০০০ বৎসরের পুরনো। এটা খুবই প্রাচীন ভাষা।

কাজেই দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ীয় অথবা অর্ধ-দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলির ক্ষেত্রে আমরা সংস্কৃত শব্দ ও তার পাশাপাশি দ্রাবিড়ীয় ভাষা, শিক্ষক ও ছাত্রদের সুবিধার্থে ব্যবহার করতে পারি। 'নারিকেল'-এই সংস্কৃত শব্দটি মালয়ালমে ব্যবহার করা

যেতে পারে; "তেঙ্গাই" শব্দটি প্রাচীন দ্রাবিড়ীয়। আধুনিক তামিলেও "তেঙ্গা"। এই "তেঙ্গা" শব্দটি শিক্ষক ও ছাত্রদের সুবিধার্থে পাশাপাশি ব্যবহার করা উচিত। এটাই নীতি (policy) হওয়া উচিত।

ৰাঙালী অষ্ট্রিকো–মঙ্গলো–নিগ্রয়েড জনগোষ্ঠী। তারা আর্য নয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় ৯২% সংস্কৃত শব্দসম্ভার। ওড়িয়া ভাষায় একই অবস্থা। বাঙালী, ওড়িয়া ও অঙ্গিকা ভাষীরা গোষ্ঠীগতভাবে (racially) এক। এদের সকলের মধ্যেই রয়েছে দ্রাবিড়ীয় রক্ত, কিন্তু তাদের ভাষার উদ্ভব হয়েছে পূর্বী অর্ধ–মগধী থেকে সংস্কৃত শব্দসম্ভার নিয়ে।

হিন্দী ভাষা সম্পর্কে বলা যায় যদি হিন্দী ভারতীয় ভাষা হয় তাহলে তাকে সংস্কৃতের মূল ধারায় চলতে হবে। নতুবা তার অকালমৃত্যু হবে। আমরা তার অকালমৃত্যু হতে দোব না। কাজেই হিন্দীর সর্বনাম, ক্রিয়ারূপ ও শব্দরূপের কিছু পরিবর্তন করতে হবে। হিন্দী উর্দুকে অনুসরণ করবে না কারণ উর্দুর সর্বনাম, ক্রিয়ারূপ ও শব্দরূপ সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হয়নি ও উর্দু শব্দসম্ভারের বেশিরভাগ ফারসী ও তুর্কী

সঙ্গাত। এটাই হবে আমাদের সিদ্ধান্ত (principle) ও নীতি (policy) 1

তোমরা জান যে এক একটি ভাষার গড় আয়ু ১০০০ বৎসর। হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে কাশীয় মতানুযায়ী মানুষের গড় আয়ু ১২০ বৎসর ও বঙ্গীয় মতানুযায়ী ১০৮ বৎসর। কিন্তু ভাষার গড় আয়ু হয় ১০০০ বৎসর। বলা হয় যে, যখন বৈদিকভাষী লোকেরা আফগানিস্তানের দিক থেকে ভারত আক্রমণ করেছিল তখন তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল বৈদিকভাষা। তাই বৈদিকভাষা প্রাচীন ভারতে উদ্ভুত ভাষার মধ্যে পড়ে না। না, এই সিদ্ধান্ত ভুল। বৈদিকভাষার (পাণিনি যখন ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন তখন তাঁকে বৈদিকভাষায় সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হয়েছিল) উদ্ভব বাইরে হলেও সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব কিন্তু ভারতেই। এর চরিত্র পুরোপুরি ভারতীয়। রাঢ়ের মেয়েরা বলে "বিনা তেলে রেন্ধেছি"। "বিনা" সংস্কৃত শব্দ, "তৈল" এসেছে সংস্কৃত শব্দ "তৈলম" থেকে আর "রেন্ধেছি" এসেছে সংস্কৃত শব্দ "রন্ধনম্" থেকে। তাহলে আমার এটা মানা কি উচিত হবে যে সংস্কৃত ভাষা ভারতের বাইরে থেকে এসেছিল? সংস্কৃতের পশ্চাৎভূমি

হ'ল সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, সমগ্র উত্তর ভারত, সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত, আর যেখানে জনসাধারণ দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর (stock) সেখানেও সংস্কৃতর উপস্থিতি রয়েছে অর্ধ-সাংস্কৃতিক (demi-cultural) ভাষা হিসেবে।

রাঢ়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সারা পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বেশি পুরনো, আর বাঙলার রাঢ় অঞ্চলের ভাষায় শতকরা ৯২% ভাগেরও বেশী সংস্কৃত শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ এটা বাঙলার যে-কোনো অংশের চাইতে বেশী। রাঢ়ের অধিবাসীরা অস্ট্রিকো-নিগ্রোয়েড সঞ্জাত। তাদের মধ্যে মঙ্গোলরক্ত যৎকিঞ্চিত রয়েছে। মগহী লোকেরাও অষ্ট্রিকো-নিগ্রয়েড। তারা "কেরব" শব্দটি ব্যবহার করত যা সংস্কৃত শব্দ "কার্য" থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সেইরকম, ভোজপুরী ভাষায় "কপার" শব্দটি ব্যবহৃত হয় যার মানে মাথা। এটা এসেছে সংস্কৃত শব্দ "কপাল" থেকে। যখন অস্ট্রিকো-নিগ্রোয়েড জনগণের মধ্যে এইসব শব্দ ব্যবহৃত হয় যেগুলো সংস্কৃত থেকে এসেছে তখন কীভাবে আমরা বলতে পারি যে সংস্কৃত ভাষা বিদেশাগত? কিছু লোক বলে থাকে যে সংস্কৃত ভাষা ভারতের বাইরে

থেকে এসেছে। এটা অযৌক্তিক। সংস্কৃত বিদেশাগত ভাষা নয়, এটা আমাদেরই ভাষা।

যখন সংস্কৃত ভাষার মৃত্যু হ'ল তখন সে সাতটি কন্যা রেখে গেল। (১) মাগধী, প্রাকৃত, (২) শৌরসেনী প্রাকৃত, (৩) পৈশাচী প্রাকৃত, (৪) পাশ্চাত্য প্রাকৃত, (৫) সৈন্ধবী প্রাকৃত, (৬) মালবী প্রাকৃত ও (৭) মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত। প্রাকৃত মানে জনগণ-সম্পর্কিত। প্রাকৃত ভাষা জনসাধারণের ভাষা। ভারতের সাধারণ লোকেরা যারা আর্য, আসুরী, দ্রাবিড়ী, নিগ্রো বা অস্ট্রিক জাতির সংমিশ্রণ তারা সংস্কৃতের সঠিক উচ্চারণ করতে পারত না; তারা সংস্কৃতের বিকৃত উচ্চারণ করত। লোকে সংস্কৃত বলত নানা রকম উচ্চারণে। এইভাবে উচ্চারণে বিভিন্নতা থাকার ফলে ভাষাটা ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন রূপে বদলে গিয়েছে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে, প্রয়াগের (ত্রিবেণীর) পূর্বদিকে সংস্কৃতের পরিবর্তিত রূপ হয়ে গেল মাগধী প্রাকৃত। প্রয়াগ থেকে যমুনোত্রী অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত্ত (গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল) ও উদয়ন (অর্থাৎ হিমালয়ের নিম্নাঞ্চল, গাঢ়োয়াল হিমালয়) অঞ্চলের ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃত নামে পরিচিত হ'ল। বৈদিক যুগের ব্রহ্মর্ষি

দেশ বা ব্রহ্মাবর্ত্ত মহাভারতের যুগে শূরসেন নামে পরিচিত ছিল। বৈদিকযুগে ব্রহ্মাবর্তের বা ব্রহ্মর্ষিদেশের রাজধানী ছিল বৃষ্ণিপুর। বৃষ্ণিপুর বৃদ্ধিপুর > বিষ্টিপুর বা বিঠৌর-কানপুরের নিকটে একটি ছোট শহর। মহাভারতের যুগে এই অঞ্চলের নাম ছিল শূরসেন (রাজধানী ছিল মথুরা)। সেইজন্যে ভাষাটা শৌরসেনী প্রাকৃত নামে পরিচিত হ'ল। ভারতের উত্তর-মধ্য-অঞ্চলে অর্থাৎ আজকের পঞ্জাব, পাকিস্তানের পশ্চিম পঞ্জাব, সিন্ধু ও জম্মুর অন্যান্য অংশের ভাষার নাম ছিল "পৈশাচী প্রাকৃত”। পুরাণে বলা হয়েছে যে এই অঞ্চলের আদি অধিবাসীরা ছিল "কশ্” নামে এক জনগোষ্ঠীর। কশ্> কশ্মীর। তারা ছিল অসুর জনগোষ্ঠীর। পৈশাচী প্রাকৃতের উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল "পাশ্চাত্ত্য প্রাকৃত" ভাষা। এর অন্তর্গত ছিল কশ্মীর, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান ও দক্ষিণ রাশিয়া। এই ভাষাকে বলা হয়েছে পাশ্চাত্ত্য প্রাকৃত যার অর্থ হ'ল পশ্চিমের প্রাকৃত। পাশ্চাত্ত্য প্রাকৃত ভাষা থেকে এসেছে "পশতো" ভাষা যা আফগানিস্তানের ভাষা। আর সিন্ধু অববাহিকার নিম্নভাগে (পাকিস্তানে) প্রাকৃত ভাষা পরিচিত হ'ল "সৈন্ধবী প্রাকৃত” নামে (বর্তমান রাজস্থানের প্রাচীন ভাষা)। মধ্যপ্রদেশের

পশ্চিমাংশে ছিল "মালবী প্রাকৃত” আর গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকের পশ্চিমাংশ ও গোয়ায় প্রচলিত ছিল "মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত"। এই ছিল সাতটি প্রাকৃত ভাষা।

এক একটি ভাষার গড় আয়ু ১০০০ বৎসর। সুতরাং এক হাজার বৎসর পর মাগধী প্রাকৃতের মৃত্যু হ'ল। কিন্তু সে রেখে গেল দুইটি কন্যা-(১) পূর্বী অর্ধ- মাগধী ও (২) পশ্চিমী অর্ধ-মাগধী। পূর্বী অর্ধ-মাগধীর মৃত্যু হ'ল ১০০০ বৎসর পর। সে রেখে গেল ছয় কন্যা- (১) ওড়িয়া, (২) বাংলা, (৩) অসমীয়া, (৪) অঙ্গিকা, (৫) মৈথিলী ও (৬) কোশল। এই ভাষাগুলিতে বর্তমানকালে ক্রিয়ার শেষে "ছ” ধ্বনিটির ব্যবহারের বিশেষত্ব দেখা যায়-আমি যাচ্ছি, মু জাউছি, হম জায়েছে-সব সময়ই 'ছ'। আবার এদের অতীতকালের ক্রিয়ারূপে "ল" থাকে: আমি গেলাম, হম গায়েলা, হম গৈলা, মঁ গয়লীয়ে....ল। আবার ভবিষ্যৎকালে "ব" ব্যবহৃত হয়: আমি যাব, মু যাবি, আমরা যাব, হম জায়বে....ব। এরা হচ্ছে পূর্বী অর্ধ-মাগধীর কন্যা।

মাগধী প্রকৃতির আরেকটি কন্যা ছিল পশ্চিমী অর্ধ-প্রাকৃত। সে রেখে গেছে চারটি কন্যা: (১) মগহী, (২) ভোজপুরী,

(৩) ছত্তিশগড়ী ও (৪) নাগপুরিয়া (রাঁচীর ভাষা)। তারা অতীতকালে ক্রিয়ার শেষে "ল" ব্যবহার করে আর ভবিষ্যৎ কালে "ব" ব্যবহার করে। কিন্তু বর্তমান কালে "ছ"-এর ব্যবহার করে নাঃ হম জাহী-মগহী, হম জাওতানি-ভোজপুরী। ক্রিয়ার শেষে "ছ" নেই। এটাই বিশেষত্ব।

যখন মহারাষ্ট্রী প্রকৃতের মৃত্যু হ'ল তখন সে রেখে গেল অর্ধ-মহারাষ্ট্রী। সে আবার রেখে গেল পাঁচ কন্যা: (১) ডাঙ্গী (গুজরাটী ও মারাঠী মিশ্র) (২) নেওয়ারী (নেপালী-মারাঠী মিশ্র) (৩) বঢ়ারী (মারাঠী-ওড়িয়া-ছত্তিশগড়ী মিশ্র) (৪) শুদ্ধ মরাঠী (পুণে অঞ্চলের) ও (৫) কোঙ্কনী (ভারতের কোঙ্কন উপকূলের ভাষা)।

সৈন্ধবী প্রাকৃতের মৃত্যুর পর সে রেখে গেল অর্ধ-সৈন্ধবী। অর্ধ-সৈন্ধবীর মৃত্যুর পর তিনটি ভাষা এল: (১) আধুনিক সিন্ধী (২) বালুচী ও (৩) ব্রাহুই। বালুচী ও ব্রাহুই (ব্রোহী) ভাষায় দ্রাবিড়ীয় তামিলের কিছু প্রভাব, কিছু মিশ্রণ আছে। আর পূর্ব ভারতে নাগপুরিয়া ও ছত্তিশগড়ী এলাকায় দ্রাবিড়ীয় কথ্য ভাষার (tongue) ছোট ছোট ছিটমহল আছে। এগুলিতে চলে কুরুক ভাষা যা ছোটনাগপুরের ওরাঁও-রা বলে

থাকে। কুরুক হচ্ছে দ্রাবিড়ীয় ভাষা–আর্য–ভারতীয় নয়। ওরাঁওদের কুরুক ভাষা মুণ্ডাদের কথ্য ভাষা মুণ্ডারী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

পাশ্চাত্ত্য প্রাকৃতের মৃত্যু হ'ল। তার দৌহিত্রীরা হ'ল–(১) পন্থা: এ ভাষা চলে আফগানিস্তানের পূর্বাংশে, পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে, পেশোয়ার ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্রদেশে। আটক জেলা বাদে। সেখানে পা চলে না, চলে পাঞ্জাবী ভাষা, এছাড়া (২) কাশ্মীরী ভাষা, (৩) কুরদিস ইত্যাদি, (৪) দক্ষিণ রাশিয়ার সমস্ত ভাষাগুলি পাশ্চাত্ত্য প্রাকৃতের অন্তর্গত।

যখন পৈশাচী প্রাকৃতের মৃত্যু হ'ল তখন তার দুই কন্যা রইল–(১) উত্তরী অর্ধ–পৈশাচী ও (২) দক্ষিণী অর্ধ–পৈশাচী ভাষা। তাদের মৃত্যুর পর আমরা বর্তমানে পাচ্ছি পাঁচটি ভাষা–(১) মুলতানি (সিন্ধী ও পাঞ্জাবীর মিশ্র ভাষা), (২) পূর্বী পাঞ্জাবী, (৩) পশ্চিমী পাঞ্জাবী (লিপি–লানদেই। এখন পর্যন্ত পঞ্জাবের হিন্দু ব্যবসায়ীরা এই ভাষায় তাঁদের হিসাবপত্র রাখেন।), (৪) পাহাড়ী পাঞ্জাবী (হিমাচল প্রদেশের ভাষা) ও (৫) ডোগরী (জম্মুর ভাষা)।

যখন মালবী প্রাকৃতের মৃত্যু হ'ল তখন সে রেখে গেল দুই কন্যা–পূর্বী অর্ধ– মালবী ও পশ্চিমী অর্ধ–মালবী। পূর্বী অর্ধ–মালবী ভাষা রেখে গেল তিন কন্যা: (১) পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ ও অংশত রাজস্থানের মালবী, (২) গুজরাটী ও (৩) কচ্ছী। কচ্ছী ভাষা মালবী–প্রাকৃত ও সৈন্ধবী–প্রাকৃত অর্থাৎ গুজরাটী ও সিন্ধী ভাষার সংমিশ্রণে হয়েছে। কচ্ছী ভাষার নিজস্ব কোনো লিপি নেই। গুজরাটী লিপিতে এটা লেখা হয় অথচ ভাষাটা গুজরাটী ও সিন্ধী ভাষার সংমিশ্রণ। এদিকে পশ্চিমী অর্ধ–মালবী ভাষা রেখে গেল এই কন্যাদের: (১) মারোয়ারী, (২) মেওয়ারী, (৩) হরাউতি ও (৪) চুনঢারু (জয়পুরের ভাষা)।

অবিশিষ্ট রইল শৌরসেনী ভাষা। যখন শৌরসেনী প্রাকৃত ভাষার মৃত্যু হ'ল তখন সে রেখে গেল অর্ধ–শৌরসেনী ভাষাকে। এই ভাষার পাঁচটি কন্যা: (১) অবধী, (২) ব্রজভাষা, (৩) বুন্দেলী, (৪) বাঘেলী ও (৫) হরিয়ানবী। দিল্লী শহর ও তার আশপাশ অঞ্চলের লোকেরা হরিয়ানবী ভাষায় কথা বলে।

এখন পাঠান যুগের প্রথম পর্যায়ে ফারসী ভাষা ছিল ভারতের সরকারী ভাষা। কিন্তু ফারসী ভাষা ভারতীয় ভাষা ছিল না। ঠিক যেমন ইংরেজী ভাষা ভারতীয় ছিল না। কিন্তু দিল্লীর প্রতিবেশী অঞ্চলের সাধারণ লোকেরা হাটে-বাজারে ও সামরিক ছাউনীতে একটা কৃত্রিম ভাষায় কথা বলত। ভাষাটা সৃষ্ট হয়েছিল হরিয়ানবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষার মিশ্রণে। তার শব্দসম্ভার ছিল ফারসী ও তুর্কী ভাষার আর সর্বনাম, ক্রিয়ারূপ ও শব্দরূপ ছিল হরিয়ানবীর।

সম্রাট শাহজাহানের আমলে এই বাজারী ও ছাউনীর ভাষা হিন্দুস্তানী বা উর্দু উপভাষা (dialect) নামে পরিচিত হ'ল। সামরিক শিবিরে সৈন্যেরা এই ভাষা ব্যবহার করত বলে তাদের সামরিক পোশাকের "উর্দী" নাম থেকে এই ভাষার নাম হয়েছে উর্দু। বিভিন্ন বড় বড় শহরে সৈন্যদের আবাস (military cantonment) ও শিবির (camp) ছিল। শহরের সেইসব অঞ্চলকে উর্দুবাজার বলা হত। আমরা গোরখপুর শহর ও ডাকা শহরে উর্দুবাজার নাম পেয়েছি। উর্দুবাজারের সঙ্গে উর্দুভাষার কোনো সংস্রব নেই। উর্দুবাজার মানে সেনা বাজার।

এদিকে সম্রাট শাহজাহান অনুভব করলেন যে ফারসী ভাষা অভারতীয় সঙ্গাত বলে সাধারণ লোকেরা এটাকে আয়ত্ব করতে পারছে না। কাজেই তিনি এর ব্যাকরণটার একটু পরিমার্জনা করে ফারসী ভাষার জায়গায় উর্দুকেই সরকারী ভাষা – করলেন। তারপর থেকে মোগল সাম্রাজ্যের সরকারী ভাষা হ'ল উর্দু।

যাই হোক, কালক্রমে স্থানীয়ভাষা ও উর্দুভাষা চলতে শুরু করল। বাঙলায় আদালতের ভাষা ছিল বাংলা কিন্তু ওপরমহলে উর্দুই ছিল সরকারী ভাষা। বিহারে মাড়োয়ারী ভাষার মউরী লিপির মত আদালতের ভাষায় কায়েথী লিপি চলত। মউরী লিপির তিনটি প্রকারভেদ আছেঃ (১) মারাঠী মউরী, (২) মাড়োয়ারী মউরী ও (৩) গুজরাটী মউরী (গুজরাটী লিপি)। মুঘল সাম্রাজ্যের আমলে বিহারে সরকারী ভাষা ছিল মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরী।

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্যায়ে বাংলাকে সরকারী ভাষা করা হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে লর্ড মেকলে ও রাজা রামমোহনের মত অনেক নেতাই বললেন–

না, ইংরেজীকেই সরকারী ভাষা করা উচিত কারণ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই আমরা পৃথিবীর বাকী অংশের সঙ্গে যোগ রাখতে পারব। আধুনিক শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিক্ষা আমরা এই ভাষাতেই লাভ করতে পারব।

বিহার ও উত্তর প্রদেশের ক্ষেত্রে (সেই সময় উত্তরপ্রদেশে ছিল দুইটি প্রদেশঃ (১) আগ্রা প্রদেশ ও (২) অবধী প্রদেশ)। বিচারপতি সারদা চন্দ্র মিত্র হিন্দী ভাষার পক্ষে মত দিলেন অর্থাৎ দেবনাগরী লিপিতে উর্দুভাষার পক্ষে তিনি মত দিলেন। তার আগে হিন্দী ভাষার কোনো সাহিত্য ছিল না। উর্দুর সাহিত্য ছিল, হিন্দীর ছিল না। তখন থেকে কাশী নাগরী প্রচারণী সভার উৎসাহে (বিচারপতি সারদা চন্দ্র মিত্র এই সভার একজন অগ্রণী ব্যষ্টি ছিলেন) লিখিত হিন্দীসাহিত্য শুরু হয়েছিল। ফলে বিহারে সাধারণ মানুষের ভাষা মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরী দেবনাগরী হরফে লিখিত উর্দু অর্থাৎ হিন্দীভাষার দ্বারা অবদমিত হয়ে গেল। ভোজপুরী, মৈথিলী ও মগহী ভাষা নিজের দেশ থেকে নির্বাসিত হ'ল। কায়েথী লিপি কিন্তু তখনও চলছিল। সে লিপিও স্বাধীনতার পর বিহারের আদালতে আর রইল না। দেবনাগরী লিপি তাকে স্থানচ্যুত

করল। উত্তরপ্রদেশ আদালতের ভাষা ছিল উর্দু। স্বাধীনতার পরে উর্দুভাষার জায়গায় এল হিন্দী ভাষা। দেবনাগরী লিপিতে আমাদের দরকার আরও দুইটি অক্ষর: দীর্ঘ "ং" ও দীর্ঘ "ঃ"।

হিন্দীভাষার, অন্ততপক্ষে হিন্দীসাহিত্যের সূচনা ব্রিটিশযুগে। কিন্তু যদি হিন্দীর কাব্যসাহিত্যে হরিয়ানবী, ব্রজভাষা, অবধী, ভোজপুরী ও মগহীকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তবে তার সাহিত্য প্রায় ১০০০ বৎসরের বেশি পুরনো হতে পারে। সেই হিসেবে তথাকথিত পুরনো হিন্দী কাব্যসাহিত্যে সমৃদ্ধ কিন্তু আধুনিক হিন্দী মোটেই তা নয়। হিন্দীসাহিত্যের প্রথম পর্যায়ে ৰাংলা সাহিত্যের মত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী প্রভৃতি থেকে অনুবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন হিন্দীসাহিত্য নিজের পায়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য ব্যাকরণের জটিলতার জন্যে তার চলার গতি সহজ হচ্ছে না। এই চলার গতি আরও স্বচ্ছন্দ করতে হবে। আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে ও আরও বিজ্ঞানসম্মত করতে হবে। তাই আর দেরী না করে তার ব্যাকরণকে আরও সংশোধিত ও পরিমার্জিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের এটাই সবচাইতে উপযুক্ত মুহূর্ত।

তোমাদের জীবনব্রত

মানুষ শুধুমাত্র তার জ্ঞান, বুদ্ধি অথবা সামাজিক মর্যাদা দিয়ে একটা মহান আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। একমাত্র নিজের আচরণের মাধ্যমেই সে এটা করতে পারে। আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারাই মানুষের আচরণের পরিশুদ্ধতা আসে। এর জন্যে তার তথাকথিত উঁচু বংশে জন্মগ্রহণ করার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নেবার দরকার নেই। এতে বরং তার মনে একটা মিথ্যা অহংবোধ তৈরী হতে পারে যা শেষপর্যন্ত তার আচরণের পরিশীলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

আমাদের এই বিশ্বে দু'টো শক্তি পাশাপাশি সক্রিয় রয়েছে– একটা সাত্ত্বিকী ও আরেকটি তামসিকী। কখনও সাত্ত্বিকী শক্তি প্রবল হয় আবার কখনও তামসিকী শক্তি প্রবল হয়। এদের মধ্যে কোনোদিন কোনো সমঝোতা হবার জো নেই। এই বিপরীত শক্তি দু'টির অন্তহীন সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই মানুষকে সামনের দিকে চলতে হবে। এই সমাজে একদিকে আমরা

দেখছি সমাজদ্রোহীদের হাতে সঞ্চিত বিপুল ধনসম্পদ আর অন্যদিকে লক্ষ্য করছি নীতিবাদীদের মধ্যে জমে থাকা এক গভীর হতাশা। কাজেই এই সব নীতিবাদীদের মধ্যে সংসার ত্যাগ করার প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। ধনসম্পদ ও প্রতিপত্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করে সমাজদ্রোহীরা বুক ফুলিয়ে আছে আর নীতিবাদীদের মনে হচ্ছে তারা যেন মস্ত অপরাধী। এই অবস্থাটা বাঞ্ছনীয় নয় আর শোভনীয়ও নয়। এটা আর চলতে দেওয়া যায় না।

তোমাদের কর্তব্য হবে সমস্ত নীতিবাদীদের ঐক্যবদ্ধ করা। গড়ে উঠুক দু'টো শিবির। সামনাসামনি একটা লড়াই হয়ে যাক। নীতিবাদীরা এতদিন ছড়িয়ে থাকার ফলে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারেনি। পাঁচজন নীতিবাদীর ঐক্যবদ্ধ শক্তি একশ' জন নীতিবর্জিত ব্যষ্টির শক্তির চাইতে অনেক বেশী কারণ নীতিবর্জিত ব্যষ্টিদের জোট হয় অসাধু উদ্দেশ্যে। দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে শুধু সাধনায় মগ্ন হলে চলবে না। আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে শক্তি সংগ্রহ করো ও নীতিবর্জিত মানুষদের বিরুদ্ধে নিজেদের সংঘবদ্ধ করো।

সুতরাং তোমাদের ত্রিস্তরীয় কর্ত্তব্য রয়েছে–**প্রথম কর্তব্যটি হচ্ছে নৈতিকতা পালন করা ও আধ্যাত্মিক সাধনা করা। এটা না করলে মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করতে পারবে না। তোমাদের পরবর্তী কর্তব্য হচ্ছে বিশ্বের সমস্ত নীতিবাদীদের ঐক্যবদ্ধ করা, না হলে ধর্ম স্থায়ী হবে না। শোষিত জনসাধারণ যারা নৈতিকতার মূল বিধি 'যম–নিয়ম' মানে না তারা তাদের অন্তরের হতাশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে না।** সেইজন্যে সমস্ত নীতিবাদীদের সংঘৰদ্ধ করার প্রয়োজন আছে। এটাই হবে তোমাদের প্রকৃত ধর্ম। এটা করলে তোমরা মহান হয়ে উঠবে কারণ বৃহতের ভাবনাই মানুষকে বৃহৎ করে **তোলে। তৃতীয় স্তরে পৃথিবীর যেখানেই পাপশক্তি শিকড় গেড়ে বসেছে সেখানেই তোমাদের ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।**

ঘরে ঘরে তোমাদের এই আদর্শ সম্প্রচার করতে হবে। কোনো রাজনৈতিক দল অথবা তথাকথিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মানুষের মুক্তি আনতে পারবে না। শুধু খোল করতাল বাজিয়ে ভগবানের নাম কীর্ত্তনে সমাজের মুক্তি আসবে না কারণ এতে

পাপীরা বশীভূত হয় না। পাপশক্তির তাণ্ডবলীলা স্তব্ধ করতে খোল করতালের চাইতে অস্ত্রেরই প্রয়োজন বেশী।

মনে সামান্যতম দুর্বলতা থাকলেও পাপশক্তির বিরুদ্ধে বেশীদিন সংগ্রাম করা যায় না। এই সংগ্রামে পাপ অথবা পাপীরা কিন্তু তোমাদের মূল লক্ষ্য নয়, তোমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছেন পরম চৈতন্য সত্তা। চলার পথে যেসব বাধা আসবে তাদের নির্মমভাবে সরিয়ে দিতে হবে। মেঘ যখন ধ্রুবতারার চারপাশে জড় হয়ে তাকে ঢেকে ফেলে তখন তোমাদের কর্তব্য হবে সেই মেঘকে সরিয়ে দেওয়া, ও মেঘ কোথায় গেল সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ধ্রুবতারার পানে এগিয়ে চলা। যদি তুমি সর্বদাই শত্রুর কথা চিন্তা কর তাহলে তোমাদের মনে তোমাদের সেই ধ্যেয় বস্তুর খারাপ গুণাবলী এসে যাবে। কিন্তু যদি পরমপুরুষ তোমাদের লক্ষ্যবস্তু হন তাহলে তোমাদের মন পরমপুরুষেই রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

মনে রাখবে–তোমাদের মানবতার সেবা করতে হবে। সমগ্র মানবজাতির স্বার্থে তোমাকে আত্মোৎসর্গ করতে হবে। তোমাদের জীবন মূল্যবান, তোমাদের সময় আরও মূল্যবান। এক মুহূর্ত সময় তোমাদের নষ্ট করা চলবে না। তোমাদের

কর্তব্যকর্ম গৌরবময়। তোমাদের কর্তব্যকর্ম অভিনব। যোদ্ধার জীবনযাপন করো আর অশুভশক্তির বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাও। জয়ী তোমরা হবেই হবে। তাই এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

ডিসেম্বর, ১৯৬৬

সদ্বিপ্র বোর্ড

আগে আমি বহুবার বলেছি যে যাঁরা আধ্যাত্মিক নীতিবাদ তথা "যম-নিয়ম" পালন করেন আর যাঁরা পরম চৈতন্য সত্তার প্রতি অনুরক্ত তাঁরাই হলেন সদ্বিপ্ল। মানুষ সদ্বিপ্লকে চিনে নেবে তাঁর আদর্শ আচরণ, নিঃস্বার্থ সেবা, কর্তব্যপরায়ণতা আর নৈতিক দৃঢ়তার মধ্যে দিয়ে। একমাত্র সদ্বিপ্ররাই নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবা করতে পারে আর সকলকে সর্বাত্মক প্রগতির পথে নিয়ে চলতে পারে। এই সদ্বিপ্ররা-যারা সঠিক জীবনাদর্শকে অনুসরণ করে আর যথাযথ

সাধনা পদ্ধতির অনুশীলন করে–তারাই ভবিষ্যতে মানবসমাজের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকবে।

আজ পৃথিবীতে সরকার পরিচালন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রই অধিকতর পছন্দ–যোগ্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে গণতন্ত্র আদর্শ ব্যবস্থা নয় কেননা এতে অনেক ত্রুটি আছে। বুদ্ধিমান মানুষেরা সেইজন্যেই এখন এই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি দূর করার উপায় খুঁজতে শুরু করেছেন। বর্তমান পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাউট 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে। ভবিষ্যতে আরো ভাল কোনো সরকার পরিচালন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই গড়ে উঠবে।

প্রাউটের মতে সদ্বিপ্রদের শাসনই হ'ল আদর্শ ব্যবস্থা। এজন্যে অনেক উন্নত মানসিকতার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। তাঁদের মিলিত ভাবে, বিধিৰদ্ধ ও বিচারসম্মত পদ্ধতিতে প্রাউটের বাস্তব প্রয়োগের জন্যে চেষ্টা করে যেতে হবে। তবেই সদ্বিপ্রদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্ধ জড়শক্তির দ্বারা অথবা কর্মবিমুখ ৰৌদ্ধিক অমিতাচারের (intellectual extravaganza) দ্বারা এই আদর্শ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

সদ্বিপ্রেরা সবরকম দুর্নীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে বিরামবিহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। তারা নীতিহীনতা ও বিভেদমূলক প্রবণতার বিরুদ্ধে সর্বদা যুঝে চলবে। শান্তি আর মানবপ্রগতির প্রতিষ্ঠা পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে সদ্বিপ্রের সামূহিক প্রচেষ্টার ওপর।

গণতন্ত্র মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারে না, কেননা এই ব্যবস্থায় একটি বিশেষ শ্রেণী সমাজে প্রভুত্ব করার সুযোগ পায়, যার ফলস্বরূপ অন্যান্য শ্রেণী তাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়। সমাজের সর্বাত্মক কল্যাণকে সুনিশ্চিত করবার জন্যে সদ্বিপ্রের কল্যাণমূলক একনায়কত্বের (benevolent dictatorship) প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজনীয়। একমাত্র সদ্বিপ্ররাই সাধারণ মানুষের প্রকৃত আশা- আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতিভূ হতে পারে।

এই যে সদ্বিপ্রদের একনায়কত্ব তার রূপটা কী ধরনের হবে? প্রাউট রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণকে সমর্থন করে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের অর্থ এই নয় যে, একজন ব্যষ্টি বা একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকবে।

শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন শাখায় যাঁরা যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন ও এ ব্যাপারে যাঁরা অভিজ্ঞ, তাঁদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত লোক নির্বাচন করে নিয়ে সদ্বিপ্ররা বিভিন্ন বোর্ড গঠন করে দেবে। এই বোর্ডগুলি হবে নিম্নরূপ:–

(১) সদ্বিপ্রদের সর্বোচ্চ বোর্ড

এই সর্বোচ্চ বোর্ড তৈরী হবে সদ্বিপ্রদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে। নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে ও সমাজের অন্যান্য বোর্ডের কাজকর্মকে উপযুক্তভাবে তত্ত্বাবধান করবার জন্যে এই বোর্ড হবে সর্বোচ্চ স্তরের সামূহিক প্রতিষ্ঠান।

(২) সদ্বিপ্রদের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বোর্ড

যেসব সন্দ্বিপ্ররা আইন প্রণয়নের ব্যাপারে অভিজ্ঞ, তাদের নিয়ে এই বোর্ড গঠিত হবে। প্রাউটের মূল নীতি অনুযায়ী সর্বোচ্চ বোর্ড যে কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দেবে সেই অনুসারে আইন প্রণয়ন করাই হবে এই বোর্ডের কাজ।

(৩) সদ্বিপ্রদের শাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত বোর্ড

যেসব সদ্বিপ্র শাসনব্যবস্থার কাজে অভিজ্ঞ তাদের নিয়ে এই বোর্ড গঠিত হবে। সদ্বিপ্রদের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বোর্ড যে আইন ও শাসন-নীতি প্রণয়ন করবে তাদের কার্যে রূপায়িত করবার দায়িত্ব থাকবে এই বোর্ডের ওপর। যারা আমলাতান্ত্রিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন তাদের উপযুক্ত ভাবে বাছাই করা ও মনোনয়ন দেওয়ার কাজকে তত্ত্বাবধান করবে এই বোর্ড। শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন শাখায় যেসব সাব-বোর্ড গঠিত হবে তাদের কাজকর্মেরও তত্ত্বাবধান করবে এই বোর্ড।

(৪) সদ্বিপ্রদের বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত বোর্ড

যেসব সদ্বিপ্র বিচারব্যবস্থার কাজে অভিজ্ঞ তাদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে এই বোর্ড গঠিত হবে। বিচারকদের নিযুক্তি ও বিচারব্যবস্থার অন্যান্য কর্মচারীদের নিযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন নিয়ম ও পদ্ধতি নির্ধারণ করবে এই বোর্ড।

(৫)শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন শাখার জন্যে সদ্বিপ্রদের সাব-বোর্ড

শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন কাজে যাঁরা দক্ষ সেই সব সদ্বিপ্রদেরই এই সাব-বোর্ড- গুলিতে নিযুক্ত করা হবে।

সদ্বিপ্রদের শাসনকার্য সংক্রান্ত বোর্ড এই সাব- বোর্ডগুলির প্রতিনিধিদের সম্ভাব্য নামের তালিকা প্রস্তুত করে আইন সংক্রান্ত বোর্ডে পাঠাবে। আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বোর্ড আবার প্রয়োজনীয় সংশোধন করে সেই তালিকা সন্দ্বিপ্রদের সর্বোচ্চ বোর্ডের কাছে সুপারিশ করে পাঠাবে। সর্বোচ্চ বোর্ড এই তালিকার চূড়ান্ত অনুমোদন দেবে।

অবশ্য সদ্বিপ্রদের সর্বোচ্চ বোর্ড যদি তালিকা অনুমোদন না করে, তাহলে প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ তা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বোর্ডের কাছে ফেরত পাঠাবে। সেক্ষেত্রে সেই বোর্ড হয় সংশোধনীগুলিকেস্বীকৃতি দিয়ে সংশ্লিষ্ট তালিকা আবার সর্বোচ্চ বোর্ডের কাছে পাঠিয়ে দেবে, অথবা সর্বোচ্চ বোর্ডের কাছে সংশোধনীগুলি সম্পর্কে তাদের মতামত জানিয়ে দেবে। এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ বোর্ডই চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার অধিকারী। তাই সাব-বোর্ডের সদস্যদের নিযুক্তির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে এই বোর্ড।

১৯৬৯, রাঁচী

প্রাপ্তবাক্য ও আপ্তবাক্য

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক আপেক্ষিক সত্য। তাই তা নিরন্তর পরিবর্তনশীল অজস্র অসংখ্য ঘটনার এক চলমান প্রবাহমাত্র। স্থান, কাল ও পাত্র–এই তিনটি আপেক্ষিক তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব। স্থান নিয়ত পরিবর্তনশীল। অগণিত জড় অণুপরমাণু দিয়ে স্থান তৈরী হয়। অণু- পরমাণুর গতি–বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানেরও পরিবর্তন ঘটে। তাই প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের কত সুসমৃদ্ধ জনপদ, কত রাজ্য–রাজধানী আজ মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। কত সুরম্য অট্টালিকা, কত বিহার–মন্দির–মসজিদ–চার্চ–সিনাগগ্, কত পিরামিড আজ কালের অতল তলে বিলীন হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে সৃষ্টির ঊষা থেকে আজ পর্যন্ত কত কালই না বয়ে গেছে, কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের কত পরিবর্তনই না সংসাধিত হয়েছে। স্থান ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে পাত্রেরও হয় অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন। দুই তিন বৎসরের কচি শিশু পঁচিশ বৎসরে হয় এক কর্মঠ বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত যুবক,

আবার সেই যুবকই চল্লিশ বৎসর পরে হয় কর্মক্ষমতাহীন এক শক্তিহীন বৃদ্ধ। তাই বলা হয়, বিশ্বের কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। অতীতের কত সবলকায় জীবজন্তু আজ পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। অতীতের কত রাজ ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব; কত-বিদ্বানের বিদ্যা-বুদ্ধি-সমস্ত আজ অতীতের বস্তু, ইতিহাসের ডাষ্টবিনে পড়ে আছে। অতীতে বহু-সত্তার জন্ম হয়েছে। ধরাপৃষ্ঠে কিছুদিন তারা থেকেছে, আবার প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী তারা এখান থেকে মুছে গেছে। বিশ্বের বুকে চিরস্থায়ী সত্তা কেবল এক আর তিনি হলেন পরমাত্মা। তিনি অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী, স্থান-কাল-পাত্রাদি আপেক্ষিক তত্ত্বের বহির্ভূত এক সত্তা-তাই তিনিই কেবল শাশ্বত, অজর, অব্যয়, অপরিণামী-সত্তা। এই এক সত্তা থেকেই এই জড়-জগৎ, উদ্ভিদ-জগৎ, প্রাণী-জগতের উৎপত্তি। তিনি সব কিছুরই উৎস, আবার তিনিই সকলেরই পরাগতি। তাই বুদ্ধিমান জীবের উচিত-সর্ব-প্রতিসংবেদী এই পরমাত্মাকে জানার জন্যে বা 'তিনি' হবার জন্যে তাঁর দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগানো। বিশ্বের মানুষ এ যাবৎ পরিবর্তনশীল আপেক্ষিক জগৎ ও পারমার্থিক জগৎ সম্বন্ধে যে

পরিমাণ জ্ঞান আহরণ করেছে তাদের মূলতঃ দুইভাবে ভাগ করা যায়-প্রাপ্তবাক্য ও আপ্তবাক্য।

প্রাপ্তবাক্য-বাইরের কোনো মাধ্যম থেকে-তা সে তথ্যসমৃদ্ধ বা তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থই হোক বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবচনই হোক বা জ্ঞানার্জনের অন্য কোনো উৎসই হোক-মানুষ যা শেখে তাই তার প্রাপ্তবাক্য। এই প্রাপ্তবাক্য অনেক সময় নির্ভুলও হতে পারে, আবার ক্ষেত্র-বিশেষে তা নাও হতে পারে।

আপ্তবাক্য-মানুষ যখন মানসাধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা তার মনকে ব্রহ্মমনের মত বিস্তৃত করতে পারে তখন সর্বজ্ঞ ব্রহ্মমনের সান্নিধ্য-নিৰন্ধন জীবমন সরাসরি ব্রহ্মামনের কাছ থেকে অনেক বিষয়ে প্রত্যাদেশ, নির্দেশনা পেয়ে থাকে। এ ধরনের অর্জিত জ্ঞানকে আপ্তজ্ঞান বা আপ্তবাক্য বলা হয়। মানুষ যেহেতু সরাসরি পরমপুরুষের কাছ থেকে এই ধরনের জ্ঞান লাভ করে থাকে, তাই তা সকল দেশেই, সকল যুগেই, সকলের পক্ষেই সত্য ও কল্যাণকর। আপ্তবাক্যকে **ঈশ্বরের নির্দেশ বলা হয়।**

প্রাপ্তবাক্যের প্রমাণ ত্রিবিধ–(১) প্রত্যক্ষ (Direct Perception), (২) অনুমান (Inference), ও (৩) আগম (Authoritative document)। এখন দেখা যাক্, পূর্বোক্ত প্রমাণগুলোর মধ্যে কোন্টি কতখানি নির্ভরযোগ্য। প্রত্যক্ষবাদীরা বলে থাকেন যে কেবল ইন্দ্রিয়জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান; আর যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মধ্যে আসে না তাকে সত্য বলে মানা যায় না, যাকে চোখে দেখা যায় না, কাণে শোণা যায় না, যা নাসিকার দ্বারা আঘ্রাণ করা যায় না, যাকে জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন করা যায় না বা যাকে স্পর্শ করা যায় না তা কী করে সত্য হয়? কিন্তু প্রশ্ন হল, যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা জ্ঞান আহরণ করছি, সেই ইন্দ্রিয়টাই যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে ঠিক জ্ঞান লাভ সম্ভব কী করে হয়? অনুরূপভাবে জ্ঞেয়সত্তার মধ্যেও যদি ত্রুটি থাকে বা তান্মাত্রিক তরঙ্গ উৎপাদনে অসুবিধা ঘটে থাকে তা হলেও যথার্থ জ্ঞানার্জন সম্ভব হবে না। তাই রাত্রির আলো–অন্ধকারে পথের রজ্জুকে আমরা সর্প বলে ভুল করি। দিনের বেলায় একই পাত্রে টম্যাটোর বীজ, লঙ্কার বীজ, বেগুনের বীজ হাতে নিয়ে আমরা কোন্টা কিসের বীজ নির্ণয় করতে ভুল করি। বহুদিনের পরিচিত ঝাঁকড়া

তেঁতুলগাছ বা খেজুরগাছকে রাত্রির অন্ধকারে ভূত মনে করে ভয় পাই। কাজেই দেখছি যে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও মধ্যেকার সংযোগস্থাপক মাধ্যম জ্ঞান-এদের কোনো একটার মধ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটি থাকলে মানুষের যথার্থ জ্ঞান হয় না। অনুমানের দ্বারা সত্যজ্ঞান লভ্য কি? "পর্বতো ৰক্তিমান্ ধূমাৎ"। কোনো পাহাড়ের ওপর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। সকলেই অনুমান করল-পাহাড়ের ওপর নিশ্চয়ই আগুন আছে। কিন্তু পরে অনুসন্ধান নিয়ে যখন দেখা গেল যে পাহাড়ের কোলে যে গ্রামটি রয়েছে সন্ধ্যার দিকে সেই গ্রামটির পরিবারগুলোর রন্ধনশালা থেকে যে ধোঁয়া ওপরে উঠছে, পাহাড়ের কোলে তাই জমা হয়েছে, কাজেই এক্ষেত্রে অনুমান মিথ্যে হয়ে গেল। দিন দুপুরে মরুভূমির দিকে তাকালে দেখবে-অনতিদূরে এক বিরাট জলাশয়, কিন্তু আসলে তা জলাশয় নয়-মরীচিকা। দু-চার জন মানুষ যা দেখৰে দু-চার কোটি মানুষ তাই দেখৰে। এক্ষেত্রে অনুমান সকলেরই ভুল প্রমাণিত হ'ল। কিন্তু তৃতীয় প্রমাণ-আগম বা শাস্ত্রবাক্য মানুষকে যথার্থ জ্ঞানই দান করে। কিন্তু সেই শাস্ত্রবাক্য যদি আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসঞ্জাত না হয়, সুবিধাবাদী বিপ্রের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত প্রক্ষিপ্ত অংশ হয় তা

মানুষকে যথার্থ জ্ঞান তো দেবেই না, বরং মানুষের সমাজে বিভেদ ও বিধ্বংসের বীজ এনে দেবে। যেমন কোনো কোনো সম্প্রদায়ের শাস্ত্রে লেখা আছে, পৃথিবীটা স্থির আর সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে অথচ এই মতটা বৈজ্ঞানিক বিচারে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। পরবর্তীকালে উন্নতধী বিজ্ঞানীরা যখন এই ভুলটা ধরিয়ে দিলেন, তখন গোঁড়া শাস্ত্রজ্ঞের দল তাঁদের নাস্তিক বলে মুণ্ডপাত করতে কসুর করেনি। আবার কোনো কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রে আছে যে একমাত্র সেই সম্প্রদায়ের ধর্মমতাবলম্বীরাই ঈশ্বরের সন্তান, বাকী লোকেরা কাফের। তাদের হত্যা করলেও পাপ তো হয়ই না, বরং মৃত্যুর পর তারা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করবে। এ ধরনের আগম মানুষের সমাজে ভয়ংকর বিপজ্জনক। তা হলে দেখা গেল, প্রাপ্তবাক্য কম ক্ষেত্রেই মানুষের সত্যকার কল্যাণ করতে পারে। কিন্তু আপ্তবাক্য মানুষের পক্ষে সর্বদাই কল্যাণকর।

মানুষের সমাজে কল্যাণ করার সর্বজনস্বীকৃত উপায় মূলতঃ তিনটি: (১) শাসনের নির্দেশ (Dictation of Brute Force), (২) যুক্তির নির্দেশ (Dictation of reason), (৩) শাস্ত্রের নির্দেশ (Spiritual Guidance)।

(ক) শাসনের নির্দেশ–কখনো কখনো দেখা যায়, সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ঊর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষের নির্দেশে কর্মপথে পরিচালিত হয়। কিন্তু যেহেতু এই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমাজের যথার্থ কল্যাণকামী নয়, বরং সমাজকল্যাণের দোহাই পেড়ে নিজেদেরই সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, নিজেদের স্বার্থ–সুখ–সবিধার দিকে নজর থাকে বেশী, তাই এদের দ্বারা সমাজের কল্যাণ সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ব্রিটিশ শাসন ভারতের বুকে দুই শতাব্দীকাল স্থায়ী হলেও ভারতীয় সমাজ জীবনে কতটুকুই বা প্রগতি হয়েছে? বিভিন্ন রাষ্ট্রে যাঁরাই একনায়কত্বের ক্ষমতা পেয়েছেন, তাঁরাই সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাষ্ট্রগুলোকে যুদ্ধের মুখে বা বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। জার্মানী, ইতালী, স্পেন, পাকিস্তান, চীন–এ সকল দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস সেই একই সত্যের ইঙ্গিত দেয়। নিজেদের দেশের হাজার হাজার নাগরিক যখন ভালভাবে খেতে– পরতে পায় না, তখন সেইসব দেশের রাষ্ট্রনায়করা সামরিক অস্ত্র–শস্ত্রের জন্যে জলের মত অর্থের অপব্যয় করে চলেছেন। ইতিহাসের পাতায় মহামতি অশোক, আলফ্রেডের মত

গোণা দু-চারজন রাজা জনসাধারণের কল্যাণ করলেও হাজার হাজার তৈমুর, চেঙ্গিস খাঁর তরবারি শ্যামল ধরিত্রীর বুকে রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছে, অত্যাচার-জর্জরিত মানুষের ক্রন্দন ও হাহাকার আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করেছে। তাই বলা হচ্ছে যে শাসকের রক্তচক্ষু দিয়ে সমাজের কল্যাণ হয় না।

(খ) যুক্তির নির্দেশ-এখন দেখা যাক্, যুক্তি কাকে বলে। যুক্তির তিন ধাপ- বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। যুদ্ধক্ষেত্রের একটা সাধারণ উদাহরণ নিলে জিনিসটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। একজন সুদক্ষ সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েই যুদ্ধ শুরু করে দেন না। প্রথমতঃ তিনি চর মারফৎ নিপুণভাবে শত্রুপক্ষের কোথায় কোথায় ছিদ্র ও দুর্বলতা তা জেনে নেবার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি সৈন্যসামন্তকে এমনভাবে সমাবেশ করবেন যাতে করে শত্রুপক্ষের দুর্বল স্থানগুলোতে অতর্কিতে প্রবল আঘাত হানা যায়। তৃতীয়তঃ, সুযোগ পাওয়া মাত্রই জোর আঘাত হেনে শত্রুপক্ষকে ছিন্ন ভিন্ন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নেন। তর্কযুদ্ধেও তেমনই প্রথমেই বিচক্ষণ নৈয়ায়িক বা তার্কিক প্রতিপক্ষের বক্তব্যের মধ্যে মধ্যে কোথায় ছিদ্র বা দুর্বলতা বা যুক্তিগত ত্রুটি তা ভালভাবে জেনে নেন।

তর্কের এই অংশটুকুর নাম 'বাদ'। পরবর্ত্তীস্তরে তার্কিক স্বপক্ষের তীক্ষ্ণ ও জোরালো বক্তব্যগুলোকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে নেবেন। এই অংশটুকুর নাম 'জল্প' ও তৃতীয় ধাপে তিনি নিজের জোরালো বক্তব্যগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যাতে প্রতিপক্ষ সহজেই পরাস্ত হয়। এই শেষ ধাপটার নাম হল 'বিতণ্ডা'। তর্কের বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা– এই তিনটি স্তরের সঙ্গে মন যখন নিজেকে সম্পূর্ণ খাপ খাইয়ে নেয়, তখন তাকেই বলি যুক্তি।

'যুক্তি' হল প্রাপ্তবাক্য। অনেকে এই যুক্তির পথ ধরে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছতেও পারে। কারণ তর্কের প্রথম ধাপটা (First Premise) যদি হয় ভুল তাহলে সিদ্ধান্তগুলোও ভুল হয়ে যাবে। যেমন, পুরনো আমলের ভূগোলের বই পড়ে কেউ যদি বলে বসে যে এলাহাবাদ বর্তমান উত্তর প্রদেশের রাজধানী বা কটক ওড়িষ্যার রাজধানী, তাহলে তা হবে চরম এক হাস্যকর ব্যাপার। আমরা ভাত খাই। ভাত হ'ল প্রাপ্তবাক্য কারণ, আমরা ভগবানের কাছ থেকে সরাসরি ভাতটা পাই না, পাই পরোক্ষভাবে। কিন্তু কেউ যদি এই মুহূর্তে সঙ্কল্প নেয় যে এই মুহূর্ত থেকে সে সৎ জীবনযাপন করবে, তা হবে আপ্তবাক্য

কারণ আপ্তবাক্য সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসে মানুষের মনে চেতনা জাগায়। শাস্ত্রের নির্দেশ–'শাসনাৎ তারয়েৎ যস্তু সঃ শাস্ত্রঃ করিকীর্তিতঃ'। এ ধরনের শাস্ত্রবাক্য অভ্রান্ত, তাই তা অবশ্যই মানুষের কল্যাণ করে থাকে। অতি সাধারণ মানুষ আপ্তবাক্যের নির্দেশ অনুযায়ী চলে জীবনে মহান ও বরেণ্য হয়। তাই দেখতে পাই কবীর, রামকৃষ্ণ পড়াশুণা না করেও লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বস্তুতঃ সমাজের ব্যাপক প্রগতি ও কল্যাণ যতখানি এঁরা করতে পারেন, প্রগাঢ় পণ্ডিতের দল তার সহস্রাংশও করতে পারেন কিনা সন্দেহ। শাসনের নির্দেশে সমাজের যে পরিমাণ কল্যাণ হয় তা বড়ই অকিঞ্চিৎকর, যেমন হয়েছিল ব্রিটিশ আমলের ভারতবর্ষে। শাসনের নির্দেশ কোনো নির্দেশই নয়, এটা মানুষের মনে কোনো প্রেরণা বা কর্মৈষণা না জাগিয়ে মানুষের মনে কেবল ভয়বৃত্তি জাগায়। এই ধরনের শাসকেরা শাসিতের কাছ থেকে কিছুই পায় না। একবার সেই সমস্ত শাসকের দল ক্ষমতার আসন থেকে সরে গেলে আর তারা সমাজে কোনো স্থান পায় না।

প্রাপ্তবাক্যের দ্বারা সমাজের প্রগতি কিছুটা হয় বটে কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রাপ্তবাক্য ও আপ্তবাক্যের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে। প্রাপ্তবাক্য মানুষের মধ্যে ভেদভাব প্রচার করে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিশেষের মহত্ত্ব ঘোষণা করে, জাতিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, জাতীয়তাবাদ প্রচার করে অপর জাতি, সম্প্রদায়, বর্ণ, ধর্মমতকে দাবিয়ে রাখতে চায় বা সমূলে বিনষ্ট করতে চায়। পক্ষান্তরে আপ্তবাক্য মানুষকে শিক্ষা দেয়-সকল মানুষের ধর্ম এক, পরম পিতা সকলেরই পিতা, দুনিয়ার মানুষ সকলেই ভাই-ভাই, সকলে সমান, কেউ ছোট, কেউ বড় নয়। প্রাপ্তবাক্য হয়তো যুক্তির অবতারণা করে প্রমাণ করলেও করতে পারে যে ভগবান বলে কেউ বা কিছু নেই, এটা মানুষের শুধু কল্পনা মাত্র। দুর্বল মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের লড়াই বাধলে হৃদয়ের আবেদনেই বুদ্ধিমান লোকের সাড়া দেওয়া উচিত। (আনন্দমার্গের "সুভাষিত-সংগ্রহ" গ্রন্থাবলী সবই আপ্তবাক্য)। আপ্তবাক্যের স্বরূপপরিচিতি হ'ল-তা হবে চিরন্তন সত্য, বিশ্বজনীন, সর্বজনগ্রাহ্য, যুক্তিসঙ্গত ও মনোবিজ্ঞান সম্মত (Uni- versal, Rational and Psychological)। আপ্তবাক্যের কতকগুলো উদাহরণ হ'ল-মানুষের

জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বরপ্রাপ্তি; মানুষ ঈশ্বরের সন্তান। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মমানসের কল্পনামাত্র। জড় ভূমামনের স্থূলীভূত রূপ। সাধনার দ্বারা মানুষ ক্রমে ক্রমে দেবতা হয়, জন্মিলেই মরতে হবে, মুক্তি-মোক্ষে জীবের জন্মগত অধিকার, মানব সমাজ এক ও অবিভাজ্য, বৈচিত্র্য প্রাকৃতিক ধর্ম, বিশ্বের দুটো কোনো সত্তাই সমান নয় ইত্যাদি।

প্রাপ্তবাক্য মানব-সমাজে কতদূর সমর্থনীয়?- যতদিন প্রাপ্তবাক্য আপ্তবাক্যের বিরোধিতা না করছে ততদিন প্রাপ্তবাক্য সমাজে চলতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এই আপ্তবাক্য সমাজের হিতের পরিবর্তে অহিত করতে শুরু করে, সেই মুহূর্ত্তে প্রাপ্ত-বাক্যকে সমাজে চলতে দেওয়া উচিত হবে না। কারণ এই প্রাপ্তবাক্যের সুযোগ নিয়ে একদল সুবিধাৰাদী মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতাগুলোর সুযোগ নিয়ে শোষণ চালাবার সুযোগ নেয়। যেমন, গীতার নিষ্কাম কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদির এমন অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সমাজে চালু করে দেয় যা মানুষের সমাজের বড় ক্ষতি করে। বৈশ্যের পদলেহী বিপ্র বুভুক্ষু শূদ্রকে এই বলে বোঝায় যে সে যে গরীব হয়ে জন্মেছে সেটা হ'ল তার পূর্বকৃত কর্মের ফল। অতএব এ জীবনে অখণ্ডনীয়

বিধিলিপিকে মেনে নিয়ে পরকালের জন্যে প্রস্তুত থাকতেই হবে। এটা একদিকে একদল মানুষকে যেমন পৌরুষহীন ভাগ্যবাদী করে তোলে, অপরদিকে ধনতান্ত্রিক শোষণের পথটাকে নিষ্কণ্টক করে রাখে। কলকাতার কোনো একজন নামকরা অধ্যাপক ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন, যে জাতি গোমাংস খায় তারা স্বাধীন রাষ্ট্র জীবন ভোগ করে। বহু উৎসাহী তরুণ ছাত্র এর ফলে বিপথগামী হন। আজ পৃথিবীর সাম্যবাদী দেশগুলোতে সাম্যবাদের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। তাই মানবধর্ম্মের কষ্টিপাথরে বিচার করে প্রাপ্ত-বাক্যের স্থান নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। যতদিন পর্যন্ত তা বৃহত্তর মানবধর্মের পরিপন্থী না হবে, ততদিন তা সমাজে চলবার অনুমতি পাবে কিন্তু যদি তা কখনও মানব-ধর্ম্মকে আঘাত হানে, মানবজাতিকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে, তখন তাকে আর সমাজে চলবার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না।

২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০, রাঁচী জাগৃতি

শোষণের বহুবিধ রূপ

লোকে প্রায়ই বলে থাকে যে বিশেষ কোনো ব্যষ্টি অথবা বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা ভীষণভাবে শোষিত হচ্ছে। শোষণ বলতে তারা এটাই বোঝে যে এইসব লোকেরা অর্থনৈতিক স্তরে শোষিত হচ্ছে। কিন্তু যদি আমরা এই বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করি তাহলে আমরা উপলব্ধি করব যে শোষণ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্তরেই সংঘটিত হচ্ছে না, মানবাস্তিত্বের অন্যান্য স্তরেও বিভিন্ন রূপে বিচিত্র ভাবে তার অস্তিত্ব রয়েছে। যখন আধিভৌতিক স্তরে (physical stra- tum) শোষণ হয় তখন সেটা যে সব ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক হবে এমন নয়; এটা প্রায়ই সামাজিক ও অনেক ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষভাবে সামাজিক হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত– স্বরূপ বলা যায় কায়েমী স্বার্থবাহকেরা কোনো একটা পর্যায়ে জনমানসে গূঢ়ৈষ (complex) ঢুকিয়ে দেয় ও বেশ কিছুকাল পরে তারা সেই অবদমিত জনমানসকে শোষণ করে। সেই সময়ে শোষণ অর্থনৈতিক না হয়ে আধিভৌতিকও (physical) হতে পারে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আধিভৌতিক শোষণ অর্থনৈতিক শোষণে পর্যবসিত হয় সেটা এর চেয়ে ভাল বা খারাপ যাই হোক না কেন।

মানসিক স্তরের শোষণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রথম পর্যায়ে ভাবজড়তার (dogma) মাধ্যমে সংঘটিত বা সঞ্চারিত হয়। এই ভাবজড়তাগুলি অর্থনৈতিক শোষণ বা সামাজিক শোষণের সূত্রপাত করে। কখনো কখনো কিছু ধরনের ভাবজড়তার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও শোষণ চালানো হয়। আধিভৌতিক স্তরের মতই আধ্যাত্মিক স্তরে শোষকেরা ভাবজড়তা দিয়ে প্রথমে লোকের মনে হীনমন্যতা বা মহাম্মন্যতা সৃষ্টি করে ও পরে অর্থনৈতিক বা সামাজিক শোষণ কায়েম করে। যখন আধিভৌতিক স্তরে শোষণ চরিত্রগতভাবে অর্থনৈতিক হয় তখন সাধারণ লোকেও সেটা ধরে ফেলে ও সেটাকে বুঝতে তাদের কোনো কষ্ট করতে হয় না। এর কারণ অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্রে শোষিত জনসাধারণ সহজেই বুঝে যায় কারা তাদের শোষক। কিন্তু অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে শোষিত জনসাধারণেরা তারা যে শোষিত হচ্ছে সে ব্যাপারে মোটেই সচেতন নয়। এই জন্যই সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের শোষণ করা খুবই সহজ। তাই

দীর্ঘদিন ধরে যদি তাদের নিজেদের শাসনাধীন রাখতে ও শোষণ চালিয়ে যেতে চাও তাহলে তাদের মনে হীনমন্যতা সৃষ্টি করে দাও; ধূর্ত শোষকেরা এটা খুব সহজেই করে থাকে। আর ট্র্যাজেডিটা হচ্ছে যে শোষিত জনসাধারণ এটা বোঝার চেষ্টা করে না–তারা বুঝতে পারে না, এমনকি তারা বুঝতে চায় না যে তারা শোষণের শিকার। সেই জন্যই এটা আরও বেশী মারাত্মক।

যখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে শোষণ চলে তখন সেটা জনসাধারণ সহজেই ধরে ফেলে। কিন্তু যখন সামাজিক–অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিংবা মানস– অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণ গেড়ে বসে তখন পরিস্থিতি জটিল হয়ে যায়। সামাজিক–অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্রে জনগণ সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে কিছুটা সরব হয় বটে কিন্তু অর্থনৈতিক শোষণটাকে চিনে নিতে ব্যর্থ হয় যা কিনা সামাজিক–অর্থনৈতিক শোষণের শেষ পরিণতি। আর, মানস–অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্রে জনসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক অবদমনে কিছুটা ক্ষুব্ধ হলেও এর অন্তিম ফল যে অর্থনৈতিক শোষণ সেটা বুঝতে পারে না।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে জনসাধারণের অর্থনৈতিক সচেতনতা আগের চাইতে অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সেই জন্যেই ধূর্ত শোষকেরা হয় সামাজিক- অর্থনৈতিক, না হয় মানস-অর্থনৈতিক শোষণের পথ অবলম্বন করেছে। শোষকেরা বিপুল লাভের ফসল ঘরে তুলতে বিশ্বময় জাল বিছিয়ে রেখেছে। এখানে এইসব নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা করব না কারণ আসলে ভবিষ্যতে আমি এই বিষয়ে একটা বই লিখব ভেবেছি। [পরবর্ত্তীকালে শ্রী পি, আর, সরকার 'বুদ্ধির মুক্তি- নব্যমানবতাবাদ' নামে একটি বই লিখেছেন।]

মানসিক ক্ষেত্রের ব্যাপারে আমি এটা বলতে পারি যে মনস্তাত্ত্বিক স্তরে অজস্র প্রকারের শোষণ হতে পারে। আর এগুলিকে অনুধাবন করতে হলে জনসাধারণকে আরও বেশী শিক্ষিত হতে হবে ও আরও বেশী বুদ্ধিমান হতে হবে। সামাজিক ক্ষেত্রে শোষকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে শোষণের মনস্তাত্ত্বিক স্বরকে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে গুলিয়ে দেয় ও দীর্ঘস্থায়ী শোষণের পথ মসৃণ করে। এই ভাবেই অতীতে ভাবজড়তা এসেছিল আর আজও এই ভাবজড়তাকে এইভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। আনন্দমার্গই সর্বপ্রথম ভাবজড়তার বিরুদ্ধে শুদ্ধ আধ্যাত্মিকা

প্রতিষ্ঠা করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যারা এ পর্যন্ত ভাবজড়তার ওপরেই ভর দিয়ে বেঁচে আছে তারা আনন্দমার্গের বিরুদ্ধে প্রবল সরগোল তুলেছে। তারা বুঝতে পারছে যে তাদের শোষণের দিন সমাপ্ত হয়ে গেছে। জনগণ আর মুর্খের স্বর্গে বাস করতে রাজী নয়।

যতদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষ ভাবজড়তার বিরুদ্ধে মাথা তুলতে না শিখছে ততদিন পর্যন্ত প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। একদিকে বলা হচ্ছে "বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, দর্শনের সেখানে শুরু", আবার অন্যদিকে বলা হচ্ছে "দর্শনের যেখানে শেষ, বিশ্বাসের সেখানে শুরু"। এটা একেবারেই বাজে কথা। মানুষের মহার্ঘ সম্পদ হচ্ছে তার বুদ্ধি। যখন মানুষকে যুক্তিতর্কের রাস্তা থেকে সরে আসতে উপদেশ দেওয়া হয় তখন তার অর্থ হয় এটাই যে কায়েমী স্বার্থবাদীরা ভাবজড়তার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানব মনীষাকে কিনে ফেলতে উঠেপড়ে লেগেছে।

"এটা কোরো না, করলে পাপ হবে" বললেই চলবে না। যদি তুমি বল "এটা কোরো না" তবে তোমাকে বলতে হবে এটা কেন করা উচিত নয়। সেইরকম ভাবে যদি তুমি বল

"এটা কর" তা হ'লে তোমাকে বলতে হবে, কেন করতে হবে। বুদ্ধির মুক্তির জন্যে আন্দোলন, বুদ্ধির মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা করার মাধ্যমে মানুষ আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রচেষ্টায় ঘাটতি থাকলে মানুষ, ধর্মান্ধে পরিণত হয় আর তার ফল হয় ধর্মের নামে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা।

আমি ইতোপূর্বে বলেছি যে আধ্যাত্মিকতাকে ভাবজড়তার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার প্রথম আন্দোলন হচ্ছে আনন্দমার্গ। কাজেই তোমরা কোনোমতেই ভাবজড়তাকে প্রশ্রয় দেবে না। বরঞ্চ তোমরা ভাবজড়তার বিরুদ্ধে অন্তহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। আর, যখন তোমরা ভাবজড়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে থাকবে তখনই তোমরা সত্যের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করতে পারবে। সত্যের সংস্পর্শে এলেই তোমরা প্রকৃত আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত হবে। মনে রেখো, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতায় তোমাদের প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে। কারণ একমাত্র আধ্যাত্মিকতাতেই মানবজীবনের চরম সার্থকতা ও প্রাপ্তি নিহিত রয়েছে। নতুবা, মানুষ ও পশুতে প্রভেদ তো সামান্যই। মানুষ যে পশু নয় এটা চরম সত্য ও বাস্তব। সেইজন্য মানুষকে মানবজীবনের চরম উৎকৃষ্টতায় প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে আর

[সেইজন্য] ভাবজড়তার বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

আধ্যাত্মবাদীরা যারা আধ্যাত্মিকতাকে ভালবাসে, যাদের এতে সত্যকারের আগ্রহ আছে ও যারা প্রকৃত মানবতার পথে চলতে ইচ্ছুক তাদের অচল হয়ে বসে থাকলে চলবে না। নিষ্ক্রিয় হলে চলবে না। বরং তাদের খুবই সক্রিয়, উৎসাহী ও কর্মদক্ষ হতে হবে। কর্মযোগী না হলে ভক্তিযোগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না, ভক্তিযোগী হওয়া যায় না। আর ভক্তিযোগে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে, প্রকৃত ভক্তিযোগী হতে না পারলে পরমপুরুষের নিকটতম সান্নিধ্য পাওয়া যায় না।

১৯ আগস্ট ১৯৮০, কলিকাতা

মানুষের সার্বভৌমিক কল্যাণের জন্যে নিরন্তর প্রয়াস-১

বলা হয়, মানুষের যে অগ্রগতির পথ সেটা মুখ্যতঃ চারটে স্তরে বিভক্ত। এই স্তরগুলো আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক–তিন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আধিভৌতিক মানে, পঞ্চভূত–সঞ্জাত জগৎটা (material world); আধিদৈবিক মানে হ'ল যে জগৎটা মন সংক্রান্ত (psychic world); আর বাকী রইল আধ্যাত্মিক জগৎ (Spiritual world, Abstract world, Metaphysical stratum)। স্তর চারটের একটাকে বলা হয় যতমান, দ্বিতীয়টাকে ব্যতিরেক, তৃতীয়টাকে একেন্দ্রীয় আর চতুর্থটাকে বশীকার। 'যতমান' শব্দটা সংস্কৃত 'যত্' ধাতুর উত্তর 'শানচ্' প্রত্যয় করে আসছে। এর মানে হ'ল, যেখানে মানুষ চেষ্টা করে চলেছে, চেষ্টাটা চলছে, চেষ্টার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

এর আগেও কোনো একটা ধর্মমহাচক্রে আমি বলেছিলুম–যতমান জিনিসটা কী। যতমান জিনিসটা কি কেবল মনের দ্বারাই চেষ্টা হবে? না, কেবল শরীরের দ্বারাই চেষ্টা হবে? না, মনের ঊর্ধ্বে কোনো একটা স্তর থেকে এই প্রচেষ্টা উৎসারিত হয়ে আসবে? মানুষ জেনেশুণে যখন কোনো কাজ করে তার পিছনে তার মনের সমর্থন অবশ্যই থাকে। আর

যেক্ষেত্রে মনের সমর্থন-আছে সেক্ষেত্রে আত্মার সমর্থন যে থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। মন যদি উপযুক্ত দর্শনের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে কাজ করে সেক্ষেত্রেও আত্মার সমর্থন যে থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। এমন অনেক দর্শন আছে যা মানুষের মনকে জড়ে পরিণত করে দেয়, মানুষকে হিংস্র করে দেয়, মানুষকে অবিবেচক করে দেয়। মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যে তোমরাই ঈশ্বরের বরপুত্র, আর সবাই অভিশাপ- ভাজন। এগুলোতে দর্শনের সমর্থন থাকলেও আত্মার সমর্থন নেই।

মন যা চিন্তা করে তাতে পরমপুরুষের সমর্থন আছে এটা বোঝা যায় কেবল একটি অবস্থায়। সেটা কী? মন যখন কোনো ভেদাভেদ না রেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি মানুষের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত হয় অর্থাৎ যা করব সকল মানুষের জন্যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণের জন্যে করব-এই ভাবধারায় অভিষিক্ত হয়ে চলে নিষ্ঠা রেখে, কেবল তাতেই আধ্যাত্মিকতার, পরমপুরুষের সমর্থন আছে, ও এই ভাবধারায় প্রেষিত হয়ে মন যখন কোনো কাজ করে ও শরীরও

তদনুযায়ী কাজ করতে থাকে বুঝতে হবে, সেইটাই সঠিক যতমান পর্যায়ভুক্ত। অন্যটাকে যতমান বলতে পারি না।

অনেক সময় এমনও হয় যে শরীর কাজ করছে কিন্তু মনের সমর্থন নেই। একটা ডাকাত বা হিংস্র মানুষের ভয়ে মানুষ কাজ করছে। মানুষ অনেক কাজ স্বেচ্ছায় করে না, ভয়ে করে। সেক্ষেত্রে সে ভয়ের দ্বারা প্রেষিত হয়ে কাজটা করছে। যেমন আগেকার দিনে ক্রীতদাস প্রথা ছিল। ক্রীতদাস খুবই কাজ করত কিন্তু সে তার যে মালিক, তাকে যে কিনেছিল তার নির্দেশে তার ভয়ে তাকে তুষ্ট করবার জন্যে কাজ করে চলেছে। এই যে কাজগুলো হয় সেগুলো শুধু ভৌতিক স্তরেই হয়। এগুলো কাজ ঠিকই, তবে তাদের পেছনে মনের সমর্থন থাকে না। তাই আত্মার, পরমপুরুষের সমর্থনও সেখানে থাকছে না। তাই সেই সকল কার্যের দ্বারা ওই ক্রীতদাসের কোনো কল্যাণ হয় না। এটা তাই যতমান পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। তাই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার মতে মানুষকে ক্রীতদাস করে রাখা চলবে না, চলতে পারে না।

তোমরা বলতে পার, আজ তো আর পৃথিবীতে ক্রীতদাস প্রথা (slave sys- tem) নেই। কথাটা তোমরা আপাতদৃষ্টিতে

বলতে পার, ও কথাটা ঠিকই কাগজে কলমে ক্রীতদাস নেই। কিন্তু অর্থের বলে কিছুসংখ্যক লোক–যাদের বলা হয় intellectual satan-মানুষের মধ্যে ক্রটিজনক ক্ষতিকর দর্শন প্রচার করে মানুষকে বিপথগামী করে তুলেছে, ক্ষতিকর করে তুলেছে। মানুষ ঘুরে ফিরে তাদের ক্রীতদাস নয়তো কি? বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে খুইয়ে বসে, যুক্তির কথা শুণে বলে, "না, শুণব না, শুণব না"। তারা ক্রীতদাস নয়তো কি? বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে তার ক্রীতদাস। তাই জড় জগতেও (material world) তারা ক্রীতদাস। সুতরাং তারা যে কাজ করে সে কাজটা যতমান পর্যায়ভুক্ত নয় অর্থাৎ এতে তাদের কোনো কল্যাণ হয় না। মানুষের কল্যাণের পথে যে প্রথম স্তর–যতমান, এতে তা সিদ্ধ হয় না। তাই যেটা প্রথম স্তর–যতমান স্তর, সেই পথে এগোতে গেলে মানুষকে কী করতে হবে? না, উপযুক্ত ব্যষ্টির কাছ থেকে প্রকৃত দর্শন শিখতে হবে আর প্রকৃত দর্শন কোনটা আর কোনটা নয় তা বিচারের মাপাকাঠিই হচ্ছে–যেখানে মানুষ সব কিছুকে এক করে দেখে, সক কিছুকে এক করবার সাধনায় রত হয়ে জগতের কোনো কর্তব্য করতে যায়, জাগতিক কাজ করতে চায়–তখনই সেটা হবে যতমান ও

তখনই সেই ধরনের দর্শনই মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য। অন্য দর্শন মানুষের মানস-সম্পদকে নষ্ট করে দেবে যার ফলে মানুষ হাত-পা-চোখ-কাণে মানুষ হলেও আসলে সে পশুত্বের পর্যায়ে অবনীত হবে অথবা পশুর চেয়েও নীচে নেমে যাবে। কারণ পশু খাদ্যান্বেষণেই অন্যের সঙ্গে লড়াই করে, ঝগড়া করে। কিন্তু এরা সে ধরনের কোনো প্রয়োজন না থাকলেও নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে তাকে খর্ব করতে চায়, ধ্বংস করতে চায়। তা আজকের মানুষের এ জিনিসটা ভালভাবে বুঝে নিয়ে intellectual satan-দের কাছ থেকেও সতর্ক থাকতে হবে ও রক্তমোক্ষক শোষকদের কাছ থেকেও সতর্ক থাকতে হবে। এই দুই ফ্রন্টে লড়াই করে আজকের মানুষকে এগিয়ে চলতে হবে। একদিকে তার শত্রু হ'ল তার রক্ত- মোক্ষকরা, যারা সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরে শোষণ করছে। আর একদল intel- lectual satan যারা মানুষকে শুধু শোষণ নয়, তাকে তার অবস্থান্তর ঘটিয়ে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি আজকের মানুষকে বলব, তারা যেন সীমাহীনভাবে এই দুইটি ফ্রন্টে লড়াই চালিয়ে যায়। মনে রাখবে দুইটি ফ্রন্টেই তাদের বৌদ্ধিক সমর্থন থাকে ভাবজড়তার

(dogma) পিছনে, অর্থাৎ যুক্তির বালাই তাদের কাছে নেই, তারা ভাবজড়তার দ্বারা প্রেষিত। কারণ, তারা জানে যাদের আমরা শোষণ করছি, সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অথবা ৰৌদ্ধিক- সামাজিক ক্ষেত্রে ও আধ্যাত্মিক-ৰৌদ্ধিক-সামাজিক ক্ষেত্রে (spirituo- intellectuo-social field) তাদের মধ্যে ভাবজড়তা-বিরোধী ভাব জেগে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে এই শোষণও শেষ হয়ে যাবে। শোষণের বিরাট বিরাট দানবও মুহূর্তে মধ্যে শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে।

১৯ নবেম্বর ১৯৮০, কলিকাতা

মানুষের সার্বভৌমিক কল্যাণের জন্যে নিরন্তর প্রয়াস-২

'যতমান সম্বন্ধে বলেছিলুম যে অগ্রগতির চারটে চরণের মধ্যে প্রথমটা যতমান। আর একথাও বলেছিলুম যে জাগতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক-তিনটে স্তরেই এ জিনিসগুলো প্রযোজ্য। আরও বলেছিলুম যে বুদ্ধির মুক্তি মানুষ যতক্ষণ না পাচ্ছে ততক্ষণ স্থূল জগতে সে কতটুকু যতমানের কাজ করতে পারে!

মানুষকে যে সকল জাগতিক ৰন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হয়-যে ৰন্ধনগুলোর জন্যে প্রতিভার ও সামর্থ্যের সম্যক স্ফূরণ হতে পারে না সেই ৰন্ধনগুলোকে বলা হ'ল আধিভৌতিক। আধিভৌতিক ৰন্ধন থেকে মুক্তির জন্যে যে যতমান, যে প্রয়াস, যে প্রচেষ্টা সেটা ব্যর্থ হয়ে যায় যদি আধিদৈবিক স্তরে ৰন্ধন থেকে যায়। আধিদৈবিক ৰন্ধন হ'ল মানসিক স্তরের যে ৰন্ধন সেইটা। হ্যাঁ, প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি যে, মানুষের ৰন্ধন ত্রিবিধ-আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। এই তিনটে বন্ধন থেকে মানুষ যখন স্থায়ী মুক্তি লাভ করে তাকে বলা হয় 'পরমার্থ', আর অস্থায়ী মুক্তি লাভ করলে তাকে বলা হয় 'অর্থ'। আমাদের পাঞ্চভৌতিক এই যে জগৎ, আধিভৌতিক জগৎ, এর অনেক ৰন্ধন-ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাসস্থান, রোগ, চিকিৎসা-এগুলোও সমস্ত আধিভৌতিক ৰন্ধন। এই ৰন্ধন থেকে

আমরা যখন সাময়িক মুক্তিলাভ করি যে বস্তুর সাহায্যে, যে ভাবের সাহায্যে সেটার নাম দেওয়া হ'ল অর্থ। যেমন ক্ষুধা পেয়েছে, সঙ্গে টাকা থাকলে দোকান থেকে রুটি কিনে খেয়ে নিতে পার। সুতরাং টাকার জন্যে বা টাকার দ্বারা তোমার এই ক্ষুধার বন্ধন থেকে সাময়িকভাবে তুমি তো মুক্তি পেলে। স্থায়ী মুক্তি পেলে না, স্থায়ীভাবে পেলে না, সাময়িকভাবে তো পেলে। তাই টাকাকে সংস্কৃত ভাষায় অর্থ বলা হয়, কারণ একটা বন্ধন থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি দিচ্ছে। আর যে সত্তা স্থায়ীভাবে মানুষকে মুক্তি দেয় সে হল পরম অর্থ বা পরমার্থ। মানুষকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা ততকাল করতে হবে যতকাল সে পরমার্থ না পাচ্ছে। যারা মানুষকে শেখায় যে এই দুনিয়ার সবই বাজে, সবই মিথ্যা, 'সব ঝুট হ্যায়', তারা কিন্তু দুনিয়াকে নিজেরা 'ঝুট' বলে মনে করছে না। তোমাকে শেখাচ্ছে, 'দুনিয়া ঝুট হ্যায়' যাতে এই দুনিয়া ঝুট হ্যায়' বলে তোমাকে ঠকিয়ে নিজের কিছু কাজ গুছিয়ে নিতে পারে। অবশ্য আমি বলছি না যে সবাই তাই করছে, তবে অনেক তথাকথিত মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্তরের বড় বড় নেতা, তাগড়া তাগড়া নেতা যথেষ্টই মানুষকে ঠকিয়েছেন। হ্যাঁ, আমি

আবার বলছি যে আমি সবাইকার সম্বন্ধে বলছি না, কেউ কেউ যে করছেন সে কথাই বলছি।

'তা, আমি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছি, মানুষকে ততদিন অর্থ অর্থাৎ জাগতিক কাজকর্ম করতে হবে, যতদিন না পরমার্থ জনসাধারণের করায়ত্ত হচ্ছে। আমরা সেই প্রয়াসেই রত হয়েছি, রত রয়েছি ও রত থাকব। এখন দেখ, এই যে যতমান, এই যতমানটা আসলে লাগা উচিত পরমার্থের কাজে, কিন্তু পরমার্থ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থের কাজে লাগানো হচ্ছে। কিন্তু তোমরা আরও এক ধাপ নীচে গিয়ে দেখ, অর্থের কাজেও যতমানকে লাগানো যাচ্ছে না। কারণ যতমানের পিছনে যে আধিদৈবিক সত্তা অর্থাৎ বুদ্ধি রয়েছে সেটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। আমরা বলি না যে টিকি বাঁধা রয়েছে। এক্ষেত্রে আমি বলছি, বৌদ্ধিক স্তরে তোমার বুদ্ধিরও টিকি বাঁধা রয়েছে। অর্থাৎ তুমি স্বাধীনভাবে চিন্তাও করতে পারছ না, সে সামর্থ্য তুমি হারিয়ে ফেলেছে। অনেক দিনের আকাশের উড়ন্ত পাখিকে ধরে এনে অনেক দিন খাঁচায় রাখলে তার ওড়বার সামর্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। আর তখন যদি দৈবাৎ খাঁচার দরজা খুলেও দেয় সে ভাবে বেশ আছি, আরও ঝুঁকি নিয়ে মহাকাশে

নীল আকাশে উড়ে লাভটা কী? এখানে এই ছোট্ট খাঁচার মধ্যে বসে বসেই ছোলা কাটি। এখন ভৌতিক স্তরে পরমার্থকে দূরে রেখে–অর্থের ব্যাপারেই যদি দেখি–এমনভাবে মানুষকে ভুল শেখানো হয়েছে, এমনভাবে তাদের মনকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে যে তারা আধিভৌতিক জগতেও স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পায় না। এই যে দীর্ঘকাল 'বুমিং' চলেছে, কাণে শোণানো হয়েছে যে এইটা করতে নেই, ওইটা করতে নেই, এইটা করার তোর অধিকার নেই, ওইটা করার তোর অধিকার নেই, তুই এটা করিসনে, করিসনে, করিসনে, –এই শুণতে শুণতে তার মানসধাতু এমনভাবে তৈরী হয়ে গেছে যে স্বাধীনভাবে কিছু করবার সুযোগ পেলেও সে হঠাৎ সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে পারছে না। সামাজিক স্তরেও ঠিক এই ব্যাপারটা ঘটে চলেছে। সামাজিক স্তরটাও তো আধিভৌতিক। যুগ যুগ ধরে নিরীহ ভাল মানুষকে, নির্দোষ মানুষকে শেখানো হয়েছে, "তুই ছোট জাত, তুই ছোট জাত, তুই ছোট জাত", ও তারপরে যদি তোমার পাশে চেয়ারটাতে বসাতেও চাও সে বলবে, 'না বাবু, আমি ঠিক আছি' –বলে মাটিতেই বসে পড়বে। অর্থাৎ মন সুযোগ পেলেও আর কাজ করতে পারে

না; খাঁচায় থেকে পাখির ডানায় যেমন বাত হয়ে যায় এদের মনেও তেমনি বাত হয়ে যায়। দীর্ঘকাল ধরে নিম্ন বর্ণ তৈরী করেছে যারা তারা তথাকথিত উচ্চ বর্ণেরই যে মানুষ তা নয়; নিম্ন বর্ণের মানুষেরাও ওই খাঁচার পাখির মত সেটাকে স্বীকার করেছে' অনেক সময় প্রোৎসাহিতও করেছে, এটা কি কম দুঃখের কথা, মানবতার পক্ষে কি কম গ্লানির কথা?

"ব্রাহ্মণোऽস্য মুখমাসীৎ বাহুরাজন্যোऽভবৎ।
মধ্যতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্র অজায়ত।"

সেই পরমপুরুষ, সেই নিরাকার সর্বানুস্যূত সর্বব্যাপী-পরমব্রহ্ম-যিনি সব মানুষের সমান আপনার, সবাইকার প্রাণের প্রাণ, সবাইকার একান্ত ঘরের লোক তাঁকেও দূরে রেখে দিয়েছে। বলা হচ্ছে যে বুদ্ধিজীবীরা হ'ল তাঁর মুখ, মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। আর হাত থেকে বেরিয়েছে ক্ষত্রিয়, মানে যুদ্ধজীবী, সাহসজীবী। উরু থেকে বৈশ্য, আরপা থেকে শূদ্র। আমি তো বলব, তাহলে শূদ্রই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ

পরমপুরুষের পা ধরবার জন্যে সবাই লালায়িত, আর সেই পা থেকে যখন শূদ্র এসেছে তখন শূদ্র সবচেয়ে পূজ্য। সতরাং যদি জাতিভেদ মানতেই হয় তাহলে বলতে হবে শূদ্র সর্বশ্রেষ্ঠ। আর যদি বল–না, না, না, কাউকে শ্রেষ্ঠ করব না, তবে সবাই সমান, কিন্তু জাতিভেদ যদি কেউ সামান্যতমও মানতে চাও তাহলে শূদ্রকে তার পূজা করা উচিত। কারণ–

'পদ্ভ্যাং শূদ্র অজায়ত'।

পা দু'টি থেকে শূদ্র বেরিয়ে এসেছে। যাই হোক এইভাবে মনকে বিকল করে দেওয়া হয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেওয়া দরকার যে, সামাজিক–অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ যদি স্থায়ী মুক্তি বা শাশ্বতী মুক্তিও চায়, মানস–অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদি চিরন্তন সত্তা অর্থাৎ পরমার্থ অথবা স্থায়ী মুক্তি চায়, তাহলে তার আগে বৌদ্ধিক মুক্তির (intellectual liberty) প্রয়োজন রয়েছে।

তুমি যদি সামাজিক–অর্থনৈতিক মুক্তি পাও, মনে রাখতে হবে তুমি সেক্ষেত্রে মানস–অর্থনৈতিক মুক্তি পেতেও পার, নাও পেতে পার অর্থাৎ স্বীকার করে নেওয়া হ'ল যে সমাজের সবাই সমান, আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সবাই সমান। পেট

ভরে গোরুকে জাব খাওয়ানো হচ্ছে, আবার তেমনি হাড় ভেঙ্গে গোরুকে দিয়ে জমি চাষ করিয়েও নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং গোরুর কী হ'ল? না, সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা (liberty) পেয়ে গেছে। খেতে পাচ্ছে কিন্তু মানস-অর্থনীতির ক্ষেত্রে হ'ল একথা জোর করে বলা যায় না। অর্থাৎ তার স্বাধীন চিন্তার পথকে তো প্রশস্ত করে দেওয়া হ'ল না। এক কথায় ক্রীতদাস হিসেবে রাখা হ'ল, পেট ভরে খাওয়ানো হ'ল কিন্তু ৰৌদ্ধিক জগতে ক্রীতদাস করে রেখে দেওয়া হ'ল। আর মানসিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে মুক্তি সেটা পেট ভরে খেতেও পাচ্ছ আর স্বাধীনভাবে চিন্তাও করতে পারছ। কিন্তু মানসিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তি পেতে গেলে তোমাকে তারও আগে, তার চেয়ে সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক মুক্তি পেতে হবে, বুদ্ধির মুক্তি চাই। আর বুদ্ধির মুক্তি না হলে স্থূল জগতে যেমন তোমার যতমান ব্যর্থ হয়ে যায়-সে আর্থিক হোক, বা পারমার্থিক হোক-বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হয়ে যায়, কারণ তোমার বৌদ্ধিক সমর্থন নেই, চিন্তা করবার স্বাধীনতা নেই, ৰৌদ্ধিক মুক্তি নেই। তাই বুদ্ধির স্তরে-যে বুদ্ধি দিয়ে মানুষ বড় বড় কাজগুলো করে যায়, সেগুলো করতে পারবে না,

কারণ ৰৌদ্ধিক স্তরের যে প্রারম্ভিক প্রয়োজনীয়তা (fundamental necessity) যা হচ্ছে ৰৌদ্ধিক মুক্তি, সেটা তোমার নেই।

যারা মানুষকে শোষণ করে, মানুষকে ঠকিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করে তারা গোড়ার দিকে চায় যে মানুষ যেন সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তি না পায়। আর সেটা যাতে তারা না পারে সেজন্যে তারা মানসিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সূক্ষ্মভাবে শোষণ করে। সোজাসুজি সামাজিক ক্ষেত্রেও শোষণ করছে না, সোজাসুজি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও করতে পারছে না। আবার তুমি তোমার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও উন্নতি করতে পারছ না, সঠিকভাবে যতমানের কাজও করতে পারছ না। আবার তুমি তোমার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও উন্নতি করতে পারছ না, কারণ সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রে অর্থনীতিটাও তারা নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। যখন সেই সুবিধাবাদীরা দেখে যে মানস-অর্থনৈতিক স্তরে আর আটকে রাখতে পারছি না, কারণ এই শোষিতের দলের মধ্যে বেশ কয়েকটা বুদ্ধিমান মানুষ বেরিয়ে গেছে, তারা ফন্দিটা ধরে ফেলেছে-হ্যাঁ, তাদের হাতে [সুবিধাবাদীদের হাতে] মুদ্রাযন্ত্র, পত্র-পত্রিকা থাকতে পারে কিন্তু তারা [শোষিতেরা]

ধরে ফেলতে পারছে। তার ফলে তারা এক ধরনের whispering campaignও করে যাচ্ছে, তারও তো একটা দাম আছে। তখন তারা উঠেপড়ে লেগে যায় ৰৌদ্ধিক ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যাতে মানুষ ৰৌদ্ধিক মুক্তি না পায়। সেই বৌদ্ধিক মুক্তি যাতে মানুষকে না দেওয়া যায় সেইজন্যে তারা কী করে? শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে, মুদ্রণ যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, বিভিন্ন ধরনের প্রচার-যন্ত্র, জনসংযোগ বিভাগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, শেষ চেষ্টা করে যাতে বালির বাঁধ দিয়ে দামোদরের বানকে আটকে দেওয়া যায়। কিন্তু তার পরে চরম দিন আসে। এই যে চরম দিন যাকে আমি বলেছি বিক্ষুব্ধদের বিপ্লব, বিক্ষুব্ধদের বিক্ষোভ যখন ফেটে পড়ে তখন এই বন্যায় বালির বাঁধ ভেসে যায়, আর তখন মানুষ সঠিকভাবে ও স্বাধীনভাবে বিচার করতে বসে যে অতীতে তার ওপর কী ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক শোষণ চলেছিল, আর [অন্য] কী ধরনের শোষণ চলেছিল। তার আগে এটা সে স্বাধীনভাবে আলোচনা করতে পারে না। নিজেদের মধ্যে গোপনে আলোচনা করতে পারে, তার বেশী করতে গেলে তার জিবও খসে যাবে। তোমরা তো জান, ৰৌদ্ধিক ক্ষেত্রে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে মানুষের

মনে জোর করে ভীতমন্যতা (fear complex) ঢুকিয়ে দিতে হয়। আধ্যাত্মিক জগতে প্রচার করা হত যে 'বিনু ভয় হোই না পীরিত'।

ভয় না থাকলে প্রেম হয় না। তুমি যদি পরমপুরুষকে ভালবাসতে চাও তাহলে একটু ভয়ও পেতে হবে তোমাকে। যুক্তিতে এটা সিদ্ধ নয়। হ্যাঁ, ঠিক কথাটা হ'ল যে পরমপুরুষকে ভয়ও পেতে হবে, পরমপুরুষকে ভালও বাসতে হবে কিন্তু তার মানে এ কথাটা ঠিক নয় যে পরমপুরুষকে ভালবাসতে গেলে ভয় পেতেই হবে অর্থাৎ এ দু'টো আলাদা জিনিস, দু'টো এক জিনিস নয়, মানে পরমপুরুষকে ভয়ও করতে হবে আবার ভালও বাসতে হবে কিন্তু 'বিনু ভয় হোই না পীরিতি'-এ কথাটা ঠিক নয়। পরমপুরুষ শাসক, ভয় পাবে বৈ কি। আর পরমপুরুষ তোমার একান্তভাবে নিকট, নিজের লোককে ভালবাসবে বৈকি! তা এই যে মানুষের মনে সুবিধাবাদীরা অতীতে ৰৌদ্ধিক ক্ষেত্রে ভাব-জড়তা ঢুকিয়ে দিয়ে তার মানসিক- অর্থনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধ্বস্ত করবার প্রচেষ্টায় রত হয়েছিল -অসফল প্রচেষ্টা একে বলব, কারণ মানুষ এগিয়ে যাবে, কেউ আটকাতে পারবে না।

তা এটা করতে নেই, এটা নিষেধ, এটা করলে নরকে যেতে হয়-এই সমস্ত বলে ভয় দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উঁচু জাতরা ঈশ্বরের মুখ থেকে বেরিয়েছে সুতরাং উঁচু জাতরা যে পাড়ায় আছে নিচু জাতরা সেই পাড়ায় জুতো পরে বা ছাতা মাথায় দিয়ে যাবে না। তারা মেনে নিলে-হ্যাঁ, ঠিকই তো। তাদের বলা হ'ল রাজা। রাজা তো বিষ্ণুর অবতার, স্বয়ং ভগবানের অবতার। সুতরাং রাজা যা বলেন মেনে নাও। সুতরাং রাজাও তার শাসন, শোষণ আর উৎপীড়নের বিজয় রথ চালিয়ে দিলে। অতীতে তেমনটিই হয়ে এসেছে।

মেয়েছেলেদের তো হাজার গণ্ডা নিষেধ-নিগড়। এই করলে পাপ হয়, ওই করলে পাপ হয় ইত্যাদি। পুরুষরা সব জিনিস খেতে পারে, মেয়েরা খেলে পাপ হয়- এসব কিছু মেয়েরা মেনে নিয়েছে ও তারা যাতে এগুলোর প্রতিবাদ করতে পারে তাই মেয়েদের মুখ্যু করে রাখ, লেখাপড়া শিখিওনা। ড্রিংকওয়াটার বেথুন যখন ৰাঙলায় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করছিলেন তখন একদল লোক 'গেল, গেল, গেল' করে চীৎকার জুড়ে দিয়েছিল। মেয়েছেলে যদি লেখাপড়া শেখে, যদি ইংরেজী অক্ষর শেখে তাহলে মেয়েরা তো নরকে

চলে যাবে। তাহলে কী হবে! মেয়েরা যদি নরকে চলে গেল তাহলে ঘর-গৃহস্থালি সব নরক হয়ে যাবে। জনৈক কবি লিখলেন-

"আগেকার সব মেয়েগুলো ছিল ভাল
ধর্মকর্ম দ্রুত সবে।
একা বেথুন এসেই শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে?
"এ, বি, শিখে বিবি সেজে
বিলিতি বোল করেই কবে।"

আচ্ছা, বিলিতি বোল যদি বলেই বা, তাতে কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে? আর মেয়েরা শিক্ষিত হওয়ার ফল সবদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। শতকরা একশ' ভাগ ভাল হয়েছে, নিরানব্বই ভাগ নয়, একশ' ভাগ। কিন্তু এই বাধা দেওয়া হয়েছিল কেন? না, যাতে বৌদ্ধিক শোষণটা বলবৎ থাকে। মেয়েরা মুখ্যু হয়ে থাকলে তাদের ওপরে socio-economic, psycho-economic শোষণ আরও ভালভাবে চলতে পারবে।

অর কিছু মেয়েরা জড়-ভরত, লিবিং লাগেজ হয়ে যদি বসে থাকে, পুরুষরা যেমন ইচ্ছে তাদের শোষণ করবে। একটা পুরুষ দেড়শ', দু'শ বিয়ে করতে পারত কিন্তু একটা নারী-সে স্বামী মরে যাবার পরেও পারত না। তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল যে 'এটা পাপ, ওটা পাপ, ওটা পাপ'। সেই দুষ্ট স্বামী মরে নরকে গিয়ে গোরু হয়ে যখন ঘাস খাবে আর সেই শিক্ষিতা, পতিব্রতা ভাল নারী মরে গিয়ে, তিনি পাপ না করলেও নরকে গিয়ে তার সেই স্বামীর (গোরু প্রেতাত্মার) পাশে পাশে ঘাস খেয়ে বেড়াবেন, আর তা মানতে হবে। সব ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করার চেষ্টা। এটা হ'ল কী? না, ভাবজড়তার প্রক্ষেপ। বুদ্ধির ক্ষেত্রে, শরীরে নয়, বুদ্ধিতে সূচিকা বিদ্ধ করে দিয়ে তাদের পঙ্গু করে রাখবার অপচেষ্টা যা ষোল আনা মানবতা-বিরোধী।

"অমুকের সিন্নি খেয়ে যে না খায় পানি।
গলায় গলগণ্ড হয় চক্ষে পড়ে ছানি।।"

শোণ কথা, অর্থাৎ দেবতা একটা দাঁড় করাতে হবে। যে-কোনো রকমের দেবতাকে দাঁড় করালে তাকে কেন্দ্র করে একটা পুরোহিত-তন্তর দাঁড়িয়ে যাবে। আর ভয়ে একটু ভক্তিও

তৈরী হবে ও তাকে কেন্দ্র করে কিছু মানুষের শোষণের পথ খুলে যাবে। সব দিক দিয়ে তোমরা এক নোতুন ভাবে নোতুন আলোকে মানুষের ইতিহাস খোঁজ করে দেখ, ভয় দেখিয়ে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছিল। পরমপুরুষ তোমার প্রাণের প্রাণ, তাকে ভালবাসবে, তাকে পাবার জন্যে সাধনা করবে, না ভয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে থাকবে? কী বিশ্রী মনোভাব!

রেলিজিয়নে আর ধর্মে এইখানেই তফাৎ। সব ক্ষেত্রে তোমরা দেখবে, কেবল ভয় দেখানো হয়েছে। মেয়েরা যাতে পুরুষকে খুব বেশী খাতির করে, হাত জোড় করে থাকে সেই জন্যে মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কড়া কড়া বিধান, কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো বিধান নেই। যেমন মেয়েরা স্বামীর নাম করবে না, ভাসুরের নাম করবে না। কেন করবে না? না, যাতে তারা পুরুষকে খুব বেশী শ্রদ্ধা করে, শ্রদ্ধায় একেবারে সপ্ সপ্ করতে থাকে। ঢাকাই মালপো যেমন রসে সপ্সপ্ করে তেমনি শ্রদ্ধায় সপ্সপ্ করবে। একটা বদ পুরুষ– সে হয়তো লেখাপড়াও জানে না। তবুও তার স্ত্রী গলায় কাপড়টি, আঁচলটি জড়িয়ে তাকে পেন্নাম করবে। এসব কী ব্যাপার! বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি বড্ড বাজে জিনিস।

"শ্বশুর ভাসুরের নাম করলে অধঃপাতে যায়।
মামা শ্বশুরের নাম করলে আলজিব খসে যায়
সোয়ামীর নাম করলে দুধে ভাতে খায়।"

এসব হ'ল ওই ইন্জেকশন দিয়ে দিয়ে তাকে পঙ্গু করে দেবার চেষ্টা। যাই হোক স্থূল জাগতিক ক্ষেত্রে যেমন যতমান ব্যর্থ হয়ে যায় তেমনি মানসিক ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হয়ে যায় এই আধ্যাত্মিক ভাবজড়তা আর এই আধ্যাত্মিক ৰন্ধনের দরুণ। শেষের কথাটা হচ্ছে এই যে, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে মানুষটা এই মানসিক রোগে ভুগছে, হীনম্মন্যতা থেকে ভুগছে, সে পরমপুরুষের কাছেই বা কী করে যাবে? তার ভাবনা হবে যে আমি তো ছোটো জাত, আমি তো মেয়েমানুষ, আমার তো অধিকার অনেক কম; আমি পরমপুরুষের একেবারে কাছটিতে কী করে যাব? পরমপুরুষ যে ঘরটিতে আছেন, ঘরের ভেতরে আমি কী করে ঢুকব? আমি বড় জোর বারান্দার সিঁড়ির একটি কোণে বসে থাকতে পারি, তার বেশী নয়। সুবিধাবাদীরা প্রচারও করে দিয়েছিল যে মেয়েমানুষের শরীর নিয়ে কেউ মুক্তি পায় না, মুক্তি পেতে গেলে মরে আবার

পুরুষের শরীর নিয়ে আসতে হবে, তার পরে মুক্তি পাবে। আমি কয়েক বছর আগে এই প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে বলেছিলুম–এ জিনিসটা একটা অসামাজিক জিনিস। এ ধরনের উক্তিটা মানবতাবিরোধী ও এ ধরনের উক্তি যারা করে থাকে তারা প্রকারান্তরে নারী জাতিকে শোষণ করে সমগ্র মানব জাতিরই অগ্রগতির পথ অবরুদ্ধ করে রাখতে চায়। তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সরব হয়ে উঠতে হবে।

তোমরা এ ধরনের কোনো অন্যায় সহ্য কোরো না। কারণ এর ফলে যে কেবল নারী জাতির বা সমাজের একটা অংশের বা দলিত মথিত, পদদলিত, অবহেলিত মানুষেরই ক্ষতি হবে তা নয়, এর ফলে একটা সমাজের, সমাজদেহের একটা বিরাট অংশে প্রকাণ্ড বড় একটা ঘা হয়ে দেখা দেবে আর সে ঘা এমনই ঘা যা গোটা সমাজ দেহকে পচিয়ে শেষ করে দেবে। তোমরা এটা কিছুতেই হতে দিও না। তোমাদের চোখ খুলে গেছে, তোমরা বাস্তবোচিত পথ ধরে চলতে থাক। আগামী দিনে ব্যতিরেক সম্বন্ধে বলব।

২৬ নভেম্বর ১৯৮০, কলিকাতা

শিক্ষা প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য

শিক্ষার সংজ্ঞা

'জ্ঞা' ধাতুর অর্থ জানা–ঋগ্বেদীয় উচ্চারণ 'জিঞা', যজুর্বেদীয় উচ্চারণ 'গিঞা'। সাধারণতঃ দেখা যায় যেখানে ঋগ্বেদীয় উচ্চারণ ও যজুর্বেদীয় উচ্চারণে তারতম্য রয়েছে সেখানে সংশ্লিষ্ট অক্ষরটি ঋগ্বেদের যে বর্গের যে সংখ্যক বর্ণ, যজুর্বেদের উচ্চারণ হবে পূর্ববর্গের সমসংখ্যক অক্ষর। অর্থাৎ যদি থাকে 'চ' বর্গের তৃতীয় অক্ষর ('জ'), তাহলে 'ক' বর্গের তৃতীয় অক্ষর হচ্ছে 'গ' [তার উচ্চারণ হবে]। প্রাচীন বৈদিক ভাষা থেকে যেখানে লাতিনের উদ্ভব হয়েছে সেখানে লাতিনে সাধারণতঃ যজুর্বেদের তৃতীয় বর্ণ না নিয়ে সেই বর্গেরই প্রথম বর্ণ নিতে হবে। অবশ্য তারতম্য যে সব সময় থাকবে না এমন কোনো কথা নেই। তাই ঋগ্বেদীয় 'জ্ঞ' যজুর্বেদে হয়ে যাচ্ছে 'গিঞ', অথর্ব বেদে 'দীঞ', তাই প্রাচীন লাতিনে হচ্ছে 'কিঞ' বা কেনো (keno)। এই 'keno' থেকে ইংরেজী 'know' ধাতুটি এসেছে। ইংরেজী 'know' ধাতুর উচ্চারণে 'ক'–এর

উচ্চারণ নেই। তবু যেহেতু সাবেকি লাতিনে 'k' ছিল তাই ইংরেজীতে আজও আমরা 'know' লিখি, একটা অবান্তর 'k' অক্ষর ব্যবহার করে থাকি। যেমন ফরাসী 'কানিফ' (kanif) থেকে ইংরেজী 'নাইফ' (knife) শব্দটি এসেছে। ইংরেজী knife উচ্চারণে 'k'-এর উচ্চারণ নেই। তবু যেহেতু মূল ফরাসীতে 'k' ছিল তাই knife লিখতে কতকটা অবান্তরভাবে 'k' লিখে চলেছি।

যাই হোক্ এই যে 'জ্ঞ' ধাতু এর অর্থ হ'ল বাহ্যিক তত্ত্বের আভ্যন্তরীণ তত্ত্বে রূপান্তরণ, কর্মভাবের কর্তৃভাবে রূপান্তরণ (subjectivisation of external objectivity)। এই যে বাহিরকে ভেতরে আনা এটাই হ'ল জানা..... যা সংস্কৃত 'জ্ঞ' ধাতুর দ্বারা সম্পাদিত হয়..... ইংরেজীতে 'know' ধাতুর দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই জানা বা জ্ঞানক্রিয়া যখন স্বভাবগত হয়ে দাঁড়ায়–যেমন তুমি যদি আজ তাঁতে কাপড় বুনতে যাও.... একজন শিক্ষানবিশ হিসেবে তোমার অল্পক্ষণেই হাত ব্যথা হয়ে যাবে..... বার বার সুতো ছিঁড়ে যাবে..... বোনাও ভাল হবে না। কিন্তু কিছুদিন করতে করতে যখন জিনিসটা অভ্যাসগত হয়ে যাবে তখন অনায়াসে ঘন্টার পর ঘন্টা সুষ্ঠুভাবে বুনতে থাকবে। তোমার ঠাস বুনুনি দেখে লোকের তাক লেগে

যাবে.....টানা-পোড়েনেও আসতে থাকবে একটা সুষ্ঠু সমন্বয়। ঠিক তেমনি এই জানা জিনিসটা যখন হয়ে যায় স্বভাবগত তখন তা এসে যায় 'বিদ্' ধাতুর আওতায়। যিনি এই জ্ঞানকে স্বভাবগত করেছেন তাঁর গুণটাও বিদ্যা আর তিনি হলেন বিদ ভূণ + মতুপ্ + পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে 'বিদ্বান', স্ত্রীলিঙ্গে 'বিদ্বতী'। মানুষ যখন প্রথমে ধ্যানক্রিয়ায় বসে প্রথমে তা থাকে শিক্ষণের স্তরে। তারপরে আসে অভ্যাসযোগেন, জানার স্তরে। এই জানা যখন স্বভাবগত হয় তখন আসে বিদ্যার স্তর। এই বিদ্যা যখন অধ্যাত্মভূমিতে পরমপুরুষমুখী হয় তখন তা হ'ল পরাবিদ্যা, আর এই জানা যদি জড়জগদাভিমুখী হয় তাহলে সেই বিদ্যাটি হবে অপরাবিদ্যা। অপরাবিদ্যা বিদ্যার পরাকাষ্ঠা নয়, কারণ তা জড়ের দিকে যেতে যেতে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও একদিন সে 'কিছু-না' (ন-কিঞ্চন) হয়ে যায়। আর যদি পরাবিদ্যা হয় তা যত ঈশ্বরের কাছে যায় ততই তা বর্দ্ধমান হতে থাকে। আর ধ্যেয়ের অতি নিকটে এসে ধ্যেয়ের ভাবে একাকার হয়ে যায়। এই অবস্থাটাই হচ্ছে যোগযুক্তাবস্থা। তবে মানুষকে জাগতিক কাজও করতে হয়, অপরাবিদ্যার চর্চাও করতে হয়। তাই অপরাবিদ্যার চর্চা

করতে করতে পরাবিদ্যার ভাব যখন ঝিমিয়ে আসে তখন কিছুক্ষণের জন্যে অপরাবিদ্যার চর্চা বন্ধ রেখে পরাবিদ্যার চর্চা বাড়িয়ে দিয়ে ঈশ্বরদস্তুতি খানিকটা অর্জন করে আবার কিছুক্ষণের জন্যে অপরাবিদ্যার চর্চায় অর্থাৎ জাগতিক কাজে নেবে পড়তে হয়। এর অন্যথা হলে বড় বড় মনীষীরও পতন অনিবার্য। অপরাবিদ্যার তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিলে বিপর্যয় আসবেই।

"স্বরসবাহী বিদুষেহিপি তথারূঢ়োভিনিবেশঃ”।

আমরা যখন কারো প্রমুখাৎ বা অন্য কোনো সূত্র থেকে বা অভিজ্ঞতা থেকে ইন্দ্রিয়দ্বারের মাধ্যমে কোনো কিছু গ্রহণ করি, স্নায়ুতন্তুতে আসে তদ্ভাবাত্মক একটা স্পন্দন.... স্নায়ুকোষও তদ্ভাবে স্পন্দিত হয়, তখন সেটাকে বলি 'শিক্ষা'। বৈদিক ভাষার 'শিক্ষ' ধাতুর ঋগ্বেদীয় উচ্চারণ শিক্ষ/শী-হ্রস্ব/দীর্ঘ দুই ভাবেই উচ্চারিত হত। তাই 'শিক্ষা' বানান শি/শী দুই ভাবেই লেখা চলত। পরবর্তীকালে অর্থাৎ লৌকিক

সংস্কৃতে উচ্চারণটা 'শি' হয়ে যায়। তাই বাংলায় 'শিক্ষা' বানান 'শি' দিয়ে লিখতে হবে, দীর্ঘ 'ঈ'-কার দিয়ে লিখলে চলবে না। লিখলে ভুল হয়ে যাবে। এই 'শিক্ষা'র ইংরেজী learning।

একটি ক্লাসে চারটি ছেলে একই সঙ্গে পড়তে বসল, শিখতে লাগল একই জিনিস একই শিক্ষকের কাছ থেকে। পরীক্ষায় লিখল চার জনে চার রকম। পরীক্ষায় কেউ প্রথম হ'ল, কেউ দ্বিতীয়, কেউ বা তৃতীয়। এর কারণ তিনটি। শিক্ষা গ্রহণে ইন্দ্রিয়দ্বারের সামর্থ্য সবাইকার সমান নয়। একজন তা গ্রহণে যত পারঙ্গম, অন্যে তা নয়। স্নায়ুতন্তুর স্পন্দন ভেদে, স্পন্দন গ্রহণের মাত্রাভেদে... শুধু তাই নয়, স্নায়ুতন্তুর সামর্থ্য ভেদে স্পন্দনের মাত্রাভেদ হচ্ছে। তৃতীয় স্তরে স্নায়ুকোষেও স্পন্দনের তারতম্য দেখা দেবে। স্নায়ুকোষের সামর্থ্যও চারজনের এক নয়। তাই চারজনের শিক্ষা হ'ল চার রকমের। শুধু কি তাই গো, স্নায়ুকোষ থেকে যে উৎসারণ অর্থাৎ স্মৃতি থেকে বাইরে টেনে আনা নির্ভর করে স্নায়ুকোষের সামর্থ্য, আজ্ঞা নাড়ীর সামর্থ্য ও বহিঃকরণের সামর্থ্যের ওপর।

"অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতি"-অর্থাৎ যে বিষয়টি একবার অনুভূত হয়েছে অর্থাৎ স্নায়ুকোষে দাগ কেটেছে তাকে আবার

নোতুন করে স্পন্দনের মাধ্যমে যে জাগিয়ে তোলা তাকে ৰলে 'স্মৃতি'–ধাতুটি হচ্ছে 'স্মর্'। তাই স্মৃতিও সবাইকার সমান নয়। সেই জন্যে উত্তরে বা উত্তরপত্রে সবাই সমভাবে পরীক্ষার উত্তর দিতে পারবে না।

শিক্ষার পদ্ধতি

শিক্ষাদানের পদ্ধতি কীরকম হওয়া উচিত তা চিরকালেরই এক জটিল প্রশ্ন। মানুষের মনের ওপর পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। যে পরিবেশে একজন জন্মায়, বেড়ে ওঠে তার প্রভাব জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত সেই মানুষটির ওপর কার্যকরী থাকে। একজন যেভাবে শিক্ষা পেল সেই অনুযায়ী তার মানসিক সংরচনাও তৈরী হয়। আর মানুষের জীবনে শারীরিক সামর্থ্যের চেয়ে মানসিক ক্ষমতার প্রভাব অনেকগুণ বেশী শক্তিশালী।

এ ব্যাপারে আমি কিছু আলোকপাত করছি। তোমরা বুদ্ধিমান, নিশ্চই বুঝে নেবে। ধর, কোনো একটি দেশে একজন মানুষ তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো পরিবারে জন্মগ্রহণ করল। সেখানে সে নানারকম অত্যাচারের শিকার হয়ে প্রবল মানসিক চাপের কবলে পড়ল। এক্ষেত্রে

যদিও সেই মানুষটির ওপর সেই দেশের পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব রয়েছে তবুও এই মানসিক চাপের দরুণ সে হয়তো সেই দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে যেতে বাধ্য হ'ল। শারীরিকের চেয়ে মানসিকতার প্রভাব প্রবলতর হওয়ার কারণেই এটা ঘটল।

আমরা যদি মানুষের কল্যাণের কথা ভাবি তাহলে আমাদের শিক্ষাদানের সব চেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতিটাই খুঁজে বের করতে হবে। (শিক্ষার মাধ্যমে) মনকে ঠিকভাবে গড়ে নিতে পারলেই মানুষ জীবনে সার্বিক সার্থকতা অর্জন করবে। বিচারশীল মন তখন ঠিক বুঝে নেবে জীবনে নিরন্তর উৎসাহ-উদ্দীপনা বজায় রাখার প্রকৃত উৎস-স্রোতটা কোথায়-কেন এক বৃহত্তম পরম চেতনাসত্তাই সবকিছুর মূল প্রেরণাস্থল।

শিক্ষা মনের সমস্ত পুরনো, জীর্ণ, অপাংক্তেয় ধ্যানধারণাকে ভেঙ্গে তছনছ করে তাকে নোতুন ভাবে গড়ে দেয় ও মনকে চরম উপলব্ধি তথা' সত্যের পরমাস্থিতির দিকে চালিত করে।

শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপারে আমাদের তিনটি মূল বিষয় মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ শিক্ষার ভিত্তি হবে প্রখর বাস্তবতাৰোধ। শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো ভাবজড়তা, গোঁড়ামী, ভৌগোলিক বা জাতিগত ভেদ-বিভেদের বিন্দুমাত্র স্থান থাকবে না।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা এরকম হবে যাতে শিক্ষার্থীর মনে যথার্থ জ্ঞানের ক্ষুধা জাগ্রত হয়। ছাত্র-ছাত্রারা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নিজেদের মনে এক অবস্থার চাপ সৃষ্টি করবে, সব জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার জন্যে তাদের মন আকূল হয়ে উঠবে- “এর উত্তরটা কী? তা কি সঠিক?” তাদের মনোভাবটা হবে- "আমি সব কিছু জানতে চাই। আমি সমগ্র বিশ্বকে অধিগত করতে চাই।" আরবী ভাষায় শিক্ষার্থীর জন্যে তালিব- উল্-ইলম্ শব্দটি ব্যবহৃত হয় যার অর্থ হচ্ছে 'জ্ঞানের প্রকৃত অনুসন্ধানকারী'। এই রকম প্রচণ্ড জ্ঞানের ক্ষুধা জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার শিক্ষককে, পিতামাতা, প্রতিবেশীকে নিরন্তর প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে-“এটা এরকম কেন? ওটা ওরকম কেন? কেন এরকম ঘটল?" এইভাবে সে যেন সমগ্র বিশ্বকে নিজের মধ্যে সমাবিষ্ট করে নিতে চাইবে।

তৃতীয়তঃ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মন থাকবে সাম্যাবস্থায় যাতে তা কোনোরকম অবাঞ্ছনীয় তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত না হতে পারে।

এ হ'ল শিক্ষাপদ্ধতির মূল তিনটি তত্ত্ব। মনে রাখতে হবে মানুষসহ অন্যান্য জীবের জন্যেও শিক্ষা আবশ্যিক। একটি

কুকুরকে, একটি গোরুকে যদি উপযুক্ত ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তাহলে তারা মানুষেরই অনেক কাজে লাগবে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন-"আনন্দমার্গ হাইস্কুল, বড় বড় ডিগ্রি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি না খুলে এত কিন্ডার গার্টেন স্কুল পরিচালনা করে কেন?" এর উত্তরটা হচ্ছে- কিন্ডার গার্টেন স্কুল হ'ল একটি মৌলিক ব্যাপার আর মানুষ গড়ার প্রকৃত ভিত্তিটা এখানেই তৈরী হয়। একজন যদি চোর বা অপরাধী তৈরী হয়েই গেল তাহলে সেই মানুষটিকে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন থাকে কি? তাই শিশুবয়স থেকে একজনকে গড়ে তুলতে হবে। জীবনের প্রাথমিক স্তরেই যদি একজন মূল শিক্ষাটা পেয়ে যায়-তাহলে পরবর্তীকালে যত ঝড়ঝঞ্ঝা, বাধাবিপত্তি আসুক না কেন, সে স্বচ্ছন্দে সে-সবের মোকাবিলা করতে পারে। কাঁচা অবস্থায় বাঁশকে যেভাবে দরকার সেইভাবেই কেটেছেটে, বাঁকিয়ে-দুমড়িয়ে তৈরী করা যায়। পাকা অবস্থায় তা করতে গেলেই বাঁশটি নির্ঘাত ভেঙে যাবে। তাই কিন্ডার গার্টেন স্কুলের ওপরে বেশী জোর দিতে হবে কেননা এই স্কুলগুলি হচ্ছে মানুষ ও সমাজ গড়ার প্রাথমিক স্তর।

তাহলে শিক্ষার জন্যে কী প্রয়োজন? উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে একদিকে মানুষ জগতের স্থূলতার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে, আর অন্য দিকে এক উন্নততর জীবন, আদর্শমুখী জীবনের প্রতি মনের আকুতিকে সদাজাগরুক রাখতে পারবে। এইভাবে মানুষের মধ্যে শিক্ষালাভের জন্যে প্রেরণা নিরন্তর বজায় থাকবে। সব মানুষ তো অবশ্যই, সমস্ত সৃষ্ট জীবকেও আমাদের উপযুক্ত ভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে। প্রতিটি গাছপালা, পশুপাখিকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে হবে।

শিক্ষানীতি

প্রাউট অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল–"সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে"। শিক্ষা হ'ল তাই যা বিমুক্তি অর্থাৎ স্থায়ী মুক্তি প্রদান করে। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হ'ল ত্রিভৌমিক বিকাশ– মানবীয় অস্তিত্বের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই তিনস্তরেই একসঙ্গে ও সমানভাবে উন্নতি। এর ফলে ব্যষ্টিত্বের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগতি সংসাধিত হয়। এই শিক্ষা প্রসুপ্ত মানবীয়

সম্ভাবনাকেও জাগিয়ে তোলে যাতে করে তার যথার্থ উপযোগ সম্ভবপর হয়। প্রকৃত শিক্ষিত তাকেই বলব যিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছেন, তা অনেক বেশী মনে রেখেছেন ও নিজের বৈবহারিক জীবনে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রাউটের শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা ও আদর্শমুখীনতার ওপর জোর দিতে হবে। শিক্ষার সমস্ত স্তরে নৈতিক অনুশীলনকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। শিশুর মনে প্রথম থেকে বিশ্বৈকতাবাদের ভাবনাও সঞ্চারিত করতে হবে। শুধু শিষ্টাচার আর মার্জিত ব্যবহার শিখিয়ে দিলে চলবে না। সত্যিকারের শিক্ষা হ'ল তাই যা শিক্ষার্থীর মনে সৃষ্টির সব অস্তিত্বের প্রতি গভীর ভালবাসা ও মমত্ববোধকে জাগিয়ে তোলে।

আজকের শিশু কালকের সুনাগরিক। শিশুর গ্রহণ ক্ষমতা তথা সর্জনশীলতা অসাধারণ কিন্তু তা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তোলার জন্যে শিক্ষা পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

প্রাথমিক স্তরে শিশুকে তিনটি ভাষার শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে–নিজের মাতৃভাষা তথা স্বাভাবিক ভাষা, বেসিক সংস্কৃত

বা উপযুক্ত ক্লাসিক্যাল ভাষা আর বিশ্বভাষা। নিজের মাতৃভাষার ইতিহাস শিশুকে জানতে হবে। আর বিশ্বভাষা শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রারা নিজেদেরকে বিশ্বনাগরিক হিসেবে ভাবতে শিখবে।

প্রাউটের নীতি হচ্ছে মাতৃভাষা ছাড়াও মানুষ অন্যান্য ভাষা যত শিখতে পারে ততই ভাল। কিন্তু বাস্তব জীবনে সরকারী-বেসরকারী কাজে ও অফিস-আদালতে মাতৃভাষাই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। মাধ্যমিক স্তরে (ভারতে অষ্টম, নবম, দশম শ্রেণী) ছাত্র-ছাত্রাদের স্বাভাবিক প্রবণতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। দরিদ্র অথচ প্রতিভাধর ছাত্র-ছাত্রাদের জন্যে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা রাখতে হবে। উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পরে এই ধরনের ছাত্র-ছাত্রাদের জন্যে সরকারী আর্থিক সহায়তায় গবেষণামূলক কাজের সুযোগ করে দিতে হবে।

পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে যাতে করে শিক্ষার্থীর তত্ত্বগত ও বৈবহারিক জ্ঞান এই দু'য়েরই সঠিক মূল্যায়ন হয়। স্কুলে থাকাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীকে সমাজকল্যাণমূলক ও অন্যান্য 'ঘটনমূলক (constructive)

কাজে নিয়োজিত হবার জন্যে প্রোৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষান্তে যথোপযুক্ত জীবিকার নিশ্চিততাও থাকতে হবে।

শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে। এজন্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে সার্টিফিকেট বা প্রশংসাপত্র যথেষ্ট নয়। চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা, সমাজসেবা, নিঃস্বার্থপরতা, অনুকরণীয় ব্যষ্টিত্ব ও স্বভাবসুলভ নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা–শিক্ষকের এইসব যোগ্যতা অবশ্যই থাকতে হবে। সমাজে শিক্ষক সর্বোচ্চ সন্মান পাবেন আর তাদের আর্থিক দায়ভার সমাজকেই বহন করতে হবে।

শিক্ষানীতি নির্দ্ধারণ, শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্যধারা স্থির করার ব্যাপারগুলি যথাযোগ্য শিক্ষাব্রতী দ্বারা গঠিত বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হওয়া উচিত। তাদের কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই বোর্ডের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকা উচিত। সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্র সবরকম রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকা উচিত। সর্বস্তরে শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে হবে।

এখন একটি প্রশ্ন ওঠে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ প্রাউট সমর্থন করে কিনা?

বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রারা পঠন-পাঠন বহির্ভূত (non-academic) বিষয়ে সংযুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু academic বিষয় সম্পূর্ণভাবে শিক্ষাব্রতীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। অবশ্য এ ব্যাপারে তারা প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিতে পারেন। ঠিক যেমন পরিবার চালানোর ব্যাপারে ছেলেমেয়েরা পিতামাতাকে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। তাই ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক হবে খুবই মধুর।

রেডিও, টেলিবিশন, ফিল্ম ও অন্যান্য প্রচারমাধ্যমগুলি শোষণ ও নিহিত স্বার্থবাদীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবে। উচ্চমানের শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থে উৎকর্ষ সম্পন্ন পেশাদার লোকেরাই এই প্রচার মাধ্যমগুলি পরিচালনা করবেন।

বিজ্ঞান শিক্ষা যথার্থভাবে প্রোৎসাহিত হওয়া উচিত। বিজ্ঞানচর্চা ও তার প্রয়োগ শিক্ষাবিস্তারে খুব সহায়ক হবে। তাছাড়া এর ফলে সামাজিক, আর্থিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সকলের জন্যে বিদ্যা অর্জনের অধিকার সুনিশ্চিত হবে। বিদ্যা ও বিজ্ঞান এগুলি হবে মুক্ত আলো বাতাসের মত, এগুলি প্রত্যেককে প্রাণরস জুগিয়ে চলবে।

বিদ্বান ও শিক্ষিত

তাকেই Learned বা বিদ্বান বলব যে প্রচুর পড়াশোনা করেছে, যা পড়েছে তা বুঝেছে, সেটা মনে রেখেছে, ও সেগুলিকে কার্যেও রূপায়িত করেছে। কোনো শিক্ষিত (Educated) ও বিদ্বান মানুষের পুঁথিগত বিদ্যা থাকতে পারে বা নাও পারে, তেমনি প্রথাগত ভাবে বিদ্যার্জনকারী কোনো একজন মানুষ প্রকৃত শিক্ষিত হতেও পারে আবার নাও পারে। তাহলে সত্যিকারের বিদ্বান ও শিক্ষিত তাকেই বলব যার মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি তত্ত্ব থাকতেই হবে, এদের মধ্যে একটিরও অভাব থাকলে তাকে বিদ্বান বলা যাবে না:-

১। একটি দু'টি নয়, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনেক বই যত্নের সঙ্গে পড়তে হবে। অল্প পড়াশোনা করে বিদ্বান হওয়া যায় না।

২। শুধু পড়লে হবে না, বুঝে পড়তে হবে। অর্থাৎ যা পড়লুম তা হৃদয়াঙ্গম করতে হবে, অধিগত করতে হবে।

৩। যা পড়লুম, বুঝলুম তা মনে রাখতে পারলুম না- এরকম হলেও চলবে না। মনে রাখতে না পারলে বিদ্যালাভের কোনো অর্থই হয় না। যে অনেকদিন আগে M.Sc. পাস করেছে তাকে এখন Matriculation পরীক্ষায় বসতে বললে সে নির্ঘাৎ অকৃতকার্য হবে কেননা সে বেশীরভাগটাই ভুলে গেছে।

৪। পড়া, হৃদয়াঙ্গম করা ও মনে রাখা-এই তিনটি একসঙ্গে চলতে হবে। তার সঙ্গে সেগুলিকে কাজেও লাগাতে হবে। কেউ একজন খেটে খুটে আইন পাশ করল আর তাকে যদি করণিকের কাজ করতে হচ্ছে তা হলে তাকে আইন-শিক্ষিত বলব না; বড় জোর আইন সংক্রান্ত সাধারণ কাজে নিযুক্ত আছে-এটুকুই বলব। একজন পাস করা Advocate অথচ সেই বৃত্তিতে সে নিয়োজিত নয়, তার মানে অল্পদিনে সে সব আইন ভুলে যাবে। তাহলে তাকে আর আইন-বিষয়ক বিদ্বান কী করে বলব?

আমরা যাকে পড়া (Reading) বলি তা তিন ভাবে করা যায়। প্রথমতঃ চোখের সাহায্যে পড়া, দ্বিতীয় হচ্ছে শুণে পড়া। অতীতে মুনি-ঋষিরা অক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন না কিন্তু

তারা শুণে শুণে (শ্রুতি) অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হতেন। তোমরা এখনও অনেক মানুষ পাবে যারা লিখতে পড়তে জানে না কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত তাদের কন্ঠস্থ। তৃতীয় উপায় হচ্ছে মুদ্রা বা অন্য অঙ্গের ব্যবহার করে পড়া। একজন অন্ধ স্পর্শের মাধ্যমে কোনো কিছু সম্পর্কে জানতে পারে। একে বলে স্পর্শজনিত পদ্ধতি (Tactual method)। কেউ একজন তোমার থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি যদি তাকে কিছু বলতে চাও বা কাছে ডাকতে চাও তাহলে কথা না বলেও তুমি মুদ্রার সাহায্যে তা করতে পার। শ্রবণশক্তিবিহীন ও বাকশক্তিহীন মানুষেরা এই মুদ্রারই সহায়তায় নিজেদেরকে অভিব্যক্ত করে। একজন মানুষের কোনো একটি ইন্দ্রিয় sense organ) যদি অক্ষম থাকে তাহলে অন্য ইন্দ্রিয়গুলি অধিক সংবেদনশীল হয়ে উঠে। উদাহরণস্বরূপ মানুষের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। ধরা যাক্, তাদের শক্তি হচ্ছে ২০ ডিগ্রী করে। যদি এদের মধ্যে একটি কার্যকর না থাকে তা হলে সেই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি অন্যগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ বাকী ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি বেড়ে দাঁড়াবে ২৫ ডিগ্রী। বধির মানুষ চোখের ভাষা আর মুখের অভিব্যক্তির ব্যবহার করে

অনেক কিছু জানাতে পারে; তেমনি অন্ধ সাহায্য নেয় শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্পর্শানুভূতির।

মুদ্রার মাধ্যমেই ললিতকলার অভিপ্রকাশ। ললিত কলার উদ্ভাবক ভগবান সদাশিব। মনের ভাবের বাহ্যিক ব্যক্তিরণই মুদ্রা অর্থাৎ মুদ্রা হচ্ছে মনের অভীপ্সাকে বাইরে ফুটিয়ে তোলা।

"সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তি অসৎসঙ্গেযু ৰন্ধনম্।
অসৎসঙ্গ মুদ্রণং যৎ সা মুদ্রা পরিকীর্ত্তিতাঃ।।"

[সৎসঙ্গ মানুষের জীবনে মুক্তির দিশারী আর অসৎসঙ্গের অর্থই হ'ল অধিকতর বন্ধনে জড়িয়ে পড়া। দুষ্ট লোকের সঙ্গ পরিহার করাই মুদ্রা নামে. অভিহিত।]

মুদ্রা অর্থাৎ দেহভঙ্গি বা অঙ্গ বিন্যাসের দ্বারা কোনো একটি আইডিয়াকে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করা যায়। প্রাচ্যনৃত্য মুদ্রা প্রধান আর পাশ্চাত্যনৃত্য ছন্দ প্রধান। ভারতের লোকনৃত্য ও ক্লাসিক্যাল নৃত্য সব মুদ্রা ভিত্তিক। মুদ্রা ছন্দের থেকে সূক্ষ্মতর।

সঙ্গীত কাকে বলব? নৃত্য-বাদ্য-গীত এই তিনে মিলে সঙ্গীত। যেখানে শুধুমাত্র কন্ঠ ও বাদ্যের ব্যবহার তাকে বলব গীত। মহাভারতের যুগে কৃষ্ণ যা বলেছিলেন বা উপদেশ দিয়েছিলেন তাকে বলা হয় গীতা কেননা তাতে কোনো নৃত্য সংযুক্ত ছিল না। কৃষ্ণ যদি নৃত্য সহযোগে ধর্মের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করতেন তবে তাকে গীতা না বলে সংগীতই বলা হত।

"যা ভগবতা গীতা সা গীতা"- স্বয়ং ভগবান কর্তৃক যা গীত তাই গীতা।

প্রাথমিক ভাবে ছয়টি রাগ ও ৩৬টি রাগিণী আছে। ভারতে প্রধান দু'টি রীতির নৃত্য প্রচলিত-আর্যাবর্ত নৃত্য (কেউ কেউ বলেন উত্তর ভারতীয় নৃত্য) আর কর্ণাটকী নৃত্য (দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য)। এই দু'টি নৃত্য রীতিই সদাশিবের প্রবর্তিত। কিন্তু জনসমক্ষে এদের নিয়ে আসার কৃতিত্ব মহর্ষি ভরতের।

বেদে আছে ছন্দ প্রধানতা কেননা বেদের প্রথম দিকের বেশীরভাগ অংশ লেখা হয়েছিল বহির্ভারতে। তাই বেদের উদগাতা ঋষিরা ছন্দের বাইরে যেতে পারেননি। যদিও বেদের

সময় ব্যাকরণের অতটা কড়াকড়ি ছিল না। তাই বেদে অনেক ব্যাকরণগত ত্রুটিও আছে।

তন্ত্রে কিন্তু মুদ্রা প্রধানতা। সেখানে ছন্দ্র মুদ্রার দ্বারা পরিশীলিত। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেদেও মুদ্রার ব্যবহার আছে। যেমন শ্রাদ্ধ, যেখানে আছে পিণ্ডদান মুদ্রা বা অঙ্কুশ মুদ্রা। পিতৃযজ্ঞে [প্রাত্যহিক স্নানের পরে ভেজা শরীরে সূর্য বা জ্যোতিষ্মান বস্তুর দিকে তাকিয়ে স্নানমন্ত্র সহযোগে করতে হয়] আছে নমঃ মুদ্রা, তেমনি আছে অভয় মুদ্রা, বরদা মুদ্রা। আসলে বেদের যে অংশ ভারতবর্ষে রচিত হয়েছিল তাতেই মুদ্রার ব্যবহার সন্নিবেশিত হয়েছিল।

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও মুদ্রা ভিত্তিক। পাশ্চাত্য দেশে কেবলমাত্র বেহালা (violine) বাদ্যযন্ত্রটি মুদ্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। লোকনৃত্যের মধ্যে মণিপুরী নৃত্য, ছো- নৃত্য ও রামবাঁশ নৃত্যগুলিতে মুদ্রার ব্যবহার বেশী। রামবাঁশ নৃত্য মূলতঃ যুদ্ধের নৃত্য বলে এতে মুদ্রার ব্যবহার একটু কম। কিন্তু ছো-নৃত্য যা সৈন্যশিবিরে যুদ্ধের সাময়িক বিরতিতে অনুষ্ঠিত হত তাতে আবার মুদ্রার প্রয়োগ বেশী। এই নৃত্যে অংশগ্রহণকারী নিজে কোনো গান করে না। কিন্তু অন্য একজন গীতের মাধ্যমে

নৃত্যের বিষয়বস্তু বর্ণনা করে (অন্য কয়েকজন বাদ্যবাদনে নিযুক্ত থাকে)।

সদাশিব প্রবর্তিত তাণ্ডব নৃত্য ছন্দ-প্রধান আর পার্বতী প্রবর্তিত ললিত নৃত্য মুদ্রালাস্যে ও মধুরতায় সংকুপ্ত। তাণ্ডবের 'তা' ও ললিতের 'ল'-এই নিয়ে 'তাল' শব্দের উৎপত্তি। এই দুই প্রকার নৃত্যের ভাবধারা ও প্রকরণের সুন্দর সমন্বয়ই হচ্ছে তাল। তাই 'তাল' এত জনপ্রিয় হতে পেরেছে।*

** লেখক অন্যত্র বলেছেন যে দেখা, শোণা ও শারীরিক সক্রিযতা-এই তিনই যেখানে সম্মিলিত আছে সেটাই যথার্থ পড়া। অর্থাৎ এমনভাবে উচ্চারণ করে পড়ছি যা অন্ততঃ নিজের কাণ শুণছে আর পরে তা লিখছি বা অন্যকে শোণাচ্ছি বা কোনো ভাবে বোঝাচ্ছি-এইভাবে পড়লে তা মনেও থাকে বেশী ও ঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়।*

-সম্পাদক।

১৫ জুন ১৯৭০, রাঁচী

প্রাউটের বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা

মানুষের প্রগতির পথে প্রয়োজন হচ্ছে বাইরের জগতের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করতে করতে ভিতরের দিকেও এগিয়ে যাওয়া। এর অর্থ একদিকে যেমন থাকবে আধ্যাত্মিক ভাবধারা অন্যদিকে তেমনি চাই এক বহির্জাগতিক প্রয়াস যা আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্যাবস্থা, এক ভারসাম্য বজায় রাখবে।

মানুষের সামনে আজ দু'রকমের সমস্যা–এক হ'ল প্রাচুর্য, উপচে পড়া ধনসম্পদ; দ্বিতীয়টি, জাগতিক অভাবের সঙ্গে মানসিক আভোগেরও অভাব। অধিকাংশ উন্নত দেশ অতি সমৃদ্ধির ত্রুটিতে ভুগছে। এই প্রাচুর্য্যকে যদি সীমার মধ্যে রাখা যায় তাহলে জাগতিক অভাব আর মানসিক অনুপপত্তি এ দু'টির ভার লাঘব করে এদের মধ্যে একটা সঙ্গতি স্থাপন করা

যায় যাতে এরা চিরস্থায়ী সমস্যায় পরিণত না হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এই সামঞ্জস্য বিধানের দিকেই ঝুঁকছে। প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে এই ধরনের সামঞ্জস্য থাকাও দরকার। ফলতঃ অন্ধ পুঁজিবাদের অস্তিত্ব আজ প্রায় কোথাও নেই। এ সত্ত্বেও এটা মানতেই হবে যে উন্নত দেশগুলিতে এখনও পর্যন্ত সম্পদের অসন্তুলন ও অপব্যবহার হয়ে চলেছে।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হল জাগতিক ও মানসিক আভোগের অভাব। প্রত্যেক বুদ্ধিজীবী জানেন যে মার্কস্ট্রজম্ হ'ল আসলে এক ধরনের মানসিক রোগ। যাঁরা এই জাগতিক অপ্রতুলতা আর মানসিক অসম্পূর্ণতার শিকার হয়েছিলেন তাঁরাই একদিন মার্কস্ট্রজম্-এর বাগাড়ম্বরপূর্ণ ললিত বাণীতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এখন পর্যন্ত যেসব দেশে মার্ক্সসিষ্ট ব্যবস্থা আছে তারা এই ত্রুটিতে ভুগছে। কেন না কম্যুনিজম এই ধরনের অব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখতে প্রোৎসাহিত করে।

এই সমস্যাগুলির জন্যে বিশ্বের পরিস্থিতি আজ সংকটময় হয়ে দাঁড়িয়েছে আর মানবতা এক সমূহ বিপদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। আসলে পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজম এ দু'য়েরই প্রবক্তা ও প্রচারকেরা একই মানসিক রোগগ্রস্থ, আর দুই

ধরনের ব্যবস্থাই জাগতিক অভাব আর মানসিক ত্রুটির জন্যে ভেঙ্গে পড়েছে। অবশ্য এদিক দিয়ে কম্যুনিজমের আওতায় মানুষের অবস্থা তুলনামূলকভাবে বেশী সঙ্গীন। যাই হোক সমগ্র পৃথিবী স্পষ্টতঃই ধনতন্ত্রবাদ ও মার্ক্সবাদের নিষ্পেষণে পর্যুদস্ত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যেমন অর্থ, সম্পদ, মানুষের শক্তি সামর্থ্য এসবের অপব্যবহার ও ত্রুটিপূর্ণ বণ্টন হচ্ছে, আবার তেমনি কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থায় সার্বিক উন্নতি বিধানের জন্যে মানুষের সব সম্পদ ব্যবহার করার স্বাধীনতাই নেই। তাই সমস্যা আসলে সামাজিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক এই তিন ক্ষেত্রেই উপযুক্ত সন্তুলনের অভাব। তাহলে কি করা উচিৎ?

আজ বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি নিরন্ন মানুষের হাহাকার। প্রাউটকে এগিয়ে এসে এদের জন্যে সুনির্দিষ্ট কিছু করতে হবে। তা না হলে এরা চিরকাল অপুষ্টির শিকার হয়ে থাকবে। শুধু অন্ন নয়, এদের জন্যে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যেরও ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন এদের কেবলমাত্র মিষ্টি আলু খাওয়ালেই চলবে না কেননা তাতে পুষ্টি মূল্য প্রায় কিছুই নেই। টোপিওকা থেকেও মিষ্টি আলুতে পুষ্টিমূল্য কম। তাই এতে পেট ভরলেও মানুষ অপুষ্টিতে ভুগতে থাকবে।

পৃথিবীর দারিদ্র্য-অধ্যুষিত অঞ্চল

ভারতের বহু অঞ্চল, চীন দেশের বেশীরভাগ জায়গা, দক্ষিণ আমেরিকা আর আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল চরম দারিদ্র্যের কবলে পড়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় বছরের চার পাঁচ মাস মানুষ প্রধান খাদ্য হিসেবে ঘাসের বীজ খেয়ে থাকে। আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চলের মানুষ ইঁদুর ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করে। ভারতে ঘাসের বীজ আর আফ্রিকায় ইঁদুর-কী দুর্বিষহ পরিস্থিতি!

ভারত প্রধানত চারটি অঞ্চলে বিভক্ত-পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ। পূর্ব ভারতে দারিদ্র্য সর্বাধিক। ভারতে মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে ৰাঙলা ত্রয়োদশ স্থানে। বিহারের মাত্র সতের ভাগ কিছুটা উন্নত। পশ্চিম ভারতে মধ্যপ্রদেশের অম্বিকাপুর, বিলাসপুর ও বস্তার জেলা খুব গরিব। উত্তরাংশে উত্তরপ্রদেশের কুমায়ুন জেলা ও সীমান্তবর্তী দেশ নেপালের পাহাড়ী অঞ্চল একই রকমের অভাবগ্রস্ত। একই অবস্থা উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলায়। উত্তরপ্রদেশের ষোলো ভাগ মাত্র উন্নত। দক্ষিণ দিকে দারিদ্র্য কবলিত এলাকা বলতে

অন্ধ্রপ্রদেশের ভাইজাগ জেলা ও তেলেঙ্গনা অঞ্চল। তামিলনাড়ুর উপকূল অঞ্চল বাদে উপত্যকা অঞ্চল জলের অভাবে আর উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা না থাকার জন্যে উৎপাদনশীল নয়। কেরালার অধিকাংশ অংশে যদিও জলাভাব নেই তবুও সেখানে জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ আর শিল্পের অভাব আছে। কেরালার উত্তর সীমা আর তামিলনাড়ুর দক্ষিণাংশে জলাভাব আছে। মালয়ালমভাষী অঞ্চল শিল্পবিহীন, যদিও তামিলভাষী অঞ্চলে কিছু শিল্প আছে। তবু কেরালা আর্থিক দিক থেকে স্বয়ম্ভর। ধর্মপুরী জেলা (তামিলনাড়ু) খুবই অনুন্নত যদিও তামিলনাড়ুর গ্রামীণ অর্থনীতির অবস্থা কিছুটা ভাল।

এইভাবে ভারতের দরিদ্র অঞ্চল বলতে বোঝাবে-রাঁচী জেলার পলামু ও লোহার দগা; ওড়িষ্যার কালাহান্ডি ও কোরাপুট; পূর্ব মধ্যপ্রদেশের অম্বিকাপুর, বিলাসপুর, বস্তার জেলা; পূর্ব উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলা; অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গনা অঞ্চল; তামিলনাড়ুর ধর্মপুরী জেলা।

ওড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র ও বাংলার রাঢ় অঞ্চলে কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত ফসল চাল-গম বিক্রি করে দিয়ে মোটা দানার শস্য ও ঘাসের বীজ খেয়ে থাকে। তাই তাঁরা ভীষণ অপুষ্টি ও

অবধারিত কুষ্ঠ রোগে ভোগে। ভারতের কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ অঞ্চলের মধ্যে পুরুলিয়া জেলা প্রধান। কুষ্ঠরোগের প্রধান কারণই হ'ল অপুষ্টি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনাম গরিব যদিও মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর ধনী দেশ। তাইল্যান্ডের অবস্থা তুলনামূলক ভাবে ভালো। ইন্দোনেশিয়ায় মানুষের প্রধান খাদ্য ধান। চীনের প্রায় সর্বত্র অপুষ্টি চোখে পড়বে। সেখানে গরিবের প্রধান খাদ্য স্যুপ (পাতলা ঝোল)।

উত্তর আমেরিকায় যদিও অতটা গরিব নয় কিন্তু মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো ·ভারতের চেয়েও গরিব; হন্ডুরাসের অবস্থাও তথৈবচ। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের সব দেশগুলোই গরিব। ভেনেজুয়েলা তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য দেশগুলি থেকে একটু এগিয়ে থাকলেও ভেনেজুয়েলা যদি স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা না করে তাহলে পেট্রোল ফুরিয়ে গেলেই এদেশ আর্থিক দুরবস্থার সম্মুখীন হবে। বিশাল দেশ ব্রাজিল আর আয়তনে ছোট পেরু দরিদ্রতম। প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়েতেও নিরন্ন মানুষ প্রচুর সংখ্যায় আছে। পেরুতে মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত।

মধ্যপ্রাচ্য যদিও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ তবুও তেলোৎপাদক দেশগুলিতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে সন্তুলনের অভাব আছে।

আফ্রিকায় জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ চরম দারিদ্র্যের শিকার। আফ্রিকায় দেশে দেশে চলছে বুভুক্ষু মানুষের অসহায় ক্রন্দন। সেখানকার কয়েকটি দেশে প্রধান উৎপন্ন ফসল ধান কিন্তু তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধনী লোকেদেরই খাদ্য।

ইউরোপেও বিশেষ করে ওয়েলশ্ আর মধ্য স্কটল্যান্ডে প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব আছে। সাধারণ মানুষ আলু খেয়েই জীবনধারণ করে। কোনো বছর যদি সেই শস্য মার খায় তাহলে তারাও অপুষ্টিতে ভোগে।

এইসব মানুষদের জন্যে আমাদের অবশ্যই ভাল কিছু করতে হবে। তা না হলে এতসব অবজ্ঞাত ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকেদের ক্ষুধা সমগ্র পৃথিবীর শান্তি ও সুস্থিতিকেই বিনষ্ট করে দেবে। এই বাস্তব সত্য তোমাদের ভুলে গেলে চলবে না। এই অভুক্ত ও অপুষ্টি কবলিত অঞ্চলগুলিতে বাইরে থেকে অনতিবিলম্বে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

অপুষ্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধ

তুমি যেহেতু সমগ্র বিশ্বের দায়িত্ব নিয়েছ তাই অপুষ্টি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করাও তোমার পবিত্র কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। অপুষ্টির মূল কারণ বিশ্বে আর্থিক ব্যবস্থায় ধনসম্পদের অসন্তুলন। প্রাউট এর চিরস্থায়ী সমাধান। তবে এজন্যে খাদ্যাভাব সমস্যার আশু সমাধান জরুরি ভিত্তিতে করতে হবে। তুমি এজন্যে কী করছ?

তুমি এ ব্যাপারে তোমার গুরুদায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারো না। সমগ্র বিশ্ব তোমার দিকে কাতর নয়নে তাকিয়ে আছে। এটা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। আমাদের এই দায়িত্ব পালন করতেই হবে।

পৃথিবী ব্যাপী এই অপুষ্টি তথা সম্পদের অসন্তুলন ও ত্রুটিপূর্ণ বন্টনের একমাত্র সমাধান হ'ল বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়িত করা। এই পরিকল্পনা রচিত হবে একটি দেশে দারিদ্র্যের মাত্রা, যথাশীঘ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর লক্ষ্য আর সারা পৃথিবীতে সুসংহত বিকাশ–এ সবের

ভিত্তিতে। পৃথিবীতে স্থায়ী-অস্থায়ী ত্রাণকার্য আর শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ- ইউরোপের রোমানিয়া, আলবানিয়া, বলকান অঞ্চলগুলির জন্যে অস্থায়ী ত্রাণকার্যের ওপরে জোর দিতে হবে; পোর্তুগালে স্থায়ী ত্রাণ আর গ্রীণল্যান্ডে শিক্ষা এভাবে জোর দিতে হবে। স্পেনের বাস্কে অঞ্চল অত্যন্ত গরিব আর গ্রীণল্যান্ডে জনসংখ্যা খুবই কম। প্রথমে কাজ শুরু হয়ে যাওয়ার পর যেখানে সবচেয়ে বেশী জরুরি সেখানে অগ্রাধিকার দিতে হবে: তারপর তা ছড়িয়ে পড়বে অন্যান্য স্থানে।

ইতালি উন্নত দেশ কিন্তু তত উন্নত নয়। এ উন্নয়নশীল দেশের সীমা অতিক্রম করেছে আর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ এ দু'য়ের মাঝখানে অবস্থান করছে। ইতালি পোর্তুগালের থেকে বেশী উন্নত অথচ এ ব্যাপারে স্পেনের সমান। এখানে উদ্যান-চাষ (Horticulture), বনজ সম্পদ, ভূমি সম্পদের অধিকতর উপযোগ এসব বিষয়ে আরো উন্নতির সুযোগ আছে। তুঁত রেশমের চাষ বাড়ানো উচিত। সিসিলি আর সারদানিয়ার দক্ষিণাংশে তেল পাওয়া যেতে পারে। ধানের উৎপাদনে ইতালি বেশি সম্ভাবনাপূর্ণ আর গম উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো উচিত।

ইতালির দক্ষিণাংশে ভূমধ্যসাগরীয় ফলের উৎপাদন ভাল হয়। এ সংক্রান্ত শিল্প ওখানে গড়ে তোলা উচিত। বৃহৎ শিল্পের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য বাইরের দেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

সার্বিক জনসেবামূলক পরিকল্পনা

তাহলে কীভাবে শুরু করতে হবে? পৃথিবীতে জটিল সমস্যাগুলোর সুষ্ঠু সমাধানে অন্যান্য প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে সব দেশে সার্বিক জনসেবামূলক কাজগুলি রূপায়িত করতে হবে। কিন্তু বিশেষ জোর দিতে হবে কম্যুনিষ্ট ও পুঁজিবাদী দেশগুলির সমস্যা সমাধানে। কেননা সেসব স্থানে মানুষের শোষণ চলে জাগতিক ও মানসিক এই দুই অভাবের জন্যে। এই দেশগুলি বা অন্য দেশের অংশবিশেষ যা এই তালিকার মধ্যে পড়ে সেগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে অবিলম্বে কাজ শুরু করে দিতে হবে, কারণ সেখানে চরম খাদ্যাভাব।

এই সার্বিক জনসেবামূলক কর্মসূচী বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনারই বর্ধিত অংশ বলে বিবেচিত হবে। সব গরিব

দেশে বিভিন্ন সেবার কাজ হবে দু'ভাবে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে (extensive) আবার নিবিড়ভাবে (intensive)। বিস্তারিত ভাবে কাজ মানে সেবা যাতে গ্রামস্তরে পৌঁছায় আর নিবিড়ভাবে কাজ মানে যাতে অধিকতর সংখ্যায় মানুষ উপকৃত হয়। পৃথিবীর অনেক প্রান্তে আর্থিক সঙ্কুলন না থাকার কারণেই এই ধরনের কর্মসূচীর প্রয়োজন আর দলীয় রাজনীতির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

দুর্বিপাক ও দুর্যোগের সময় স্থানীয়ভাবে মানুষের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে যেতে হবে। অন্য যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে সেবা করতে চান তাঁদের কাছ থেকেও সহায়তা নিতে হবে। গণ-অন্নসত্র (mass feeding centre), সস্তা ভোজনালয় তো থাকবেই, এর সঙ্গে বস্ত্র-বিতরণ, চিকিৎসা, সেবা ও স্কুলদ্রব্য বিতরণের কাজও থাকবে। এছাড়া থাকবে অবস্থা অনুযায়ী দরিদ্র মানুষের জন্যে বিশেষ গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা। তুমি যদি কোনো দেশে সেবার কাজে প্রবেশাধিকার না পাও তবে সে দেশের সীমান্ত অঞ্চলে গিয়ে কাজ করবে।

সার্বিক জনসেবামূলক কাজের সূত্রে আমরা দেখিয়েছি সরকারী কর্তৃপক্ষ কী ধরনের সামাজিক সংস্থা তৈরী করে সাধারণ মানুষের জীবনধারণের মানোন্নয়নের কাজ করে যেতে পারেন। এই কর্মসূচী অনুসারে অত্যাবশ্যক ভোগ্য বস্তু দরিদ্রতম ও সবচেয়ে অভাবী লোকেদেরই আগে দিতে হবে। কোনো সরকারী কর্তৃপক্ষ যদি এই কর্মসূচীর মূল ভাবধারাকে অনুসরণ করেন–সেটা প্রাউট ব্যবস্থাকেই অনুসরণ করা হবে।

তাই সমাজের সার্বিক বিকাশের স্বার্থে আমরা কম্যুনিষ্ট দেশ, অনুন্নত গরিব দেশ আর উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অগ্রাধিকার দোবো। অবশ্য তথাকথিত উন্নত দেশগুলির মানুষকেও অবহেলা করা উচিত নয় কেন না সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যাভাব আছে। এইভাবে বিস্তারিত ও ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ মিলিতভাবে নিপীড়িত মানবতার জন্যে কিছু করতে পারে। মনে রেখো পিছনে পড়ে আছে এমন মানুষ আর পিছনের দিকে যাচ্ছে যেসব মানুষ এ দু'য়েরই মানোন্নয়ন আমাদের করতে হবে। এইরকম পরিকল্পনা রচনা করে অনতিবিলম্বে তা রূপায়িত করতে হবে।

মানসিক ক্ষেত্রে রোগ-ত্রুটি-বিকৃতির সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। শিক্ষার অর্থ যথাযথ ৰৌদ্ধিক চর্চা ও অনুশীলন। এই শিক্ষার দেওয়ার কাজ প্রাথমিকভাবে করে শিক্ষক সমাজ। এর মানে A-B-C, ক-খ-গ এই সব বর্ণমালা বা অক্ষরের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু পদদলিত জনসমূহের এক বিরাট অংশের অক্ষরজ্ঞানই নেই। এই জন্যেই শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা অনেক পিছিয়ে আছে। সব জায়গায় বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলিতে দেখবে জনসংখ্যার এক বড় অংশ অবদমিত। এই ধরনের মুসলিম দেশে বা অন্য দেশে হয়ত ধনসম্পদের অভাব নেই, কিন্তু সাধারণ মানুষ কষ্টের মধ্যে থাকে।

তাই শিক্ষাকে আবশ্যিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে। পৃথিবীর সমস্ত গ্রামে এই শিক্ষাকে পৌঁছে দেবার জন্যে তোমাকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষার ব্যাপারে তোমাকে সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত নীতি নিয়ে কাজ করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষা মানে অবজ্ঞাত মানবতার সত্যিকারের মানোন্নয়ন।

৫ এপ্রিল ১৯৮৯, কলিকাতা

ঈশ্বরকেন্দ্রিক দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব

মানুষ যে সমস্ত দর্শনকে মেনে চলে তাদের চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়–

(১) ডগমা বা ভাবজড়তাকেন্দ্রিক দর্শন (Dogma-centred philosophy)

(২) জড়কেন্দ্রিক দর্শন (Matter-centred philosophy)

(৩) আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক দর্শন (Self-centred philosophy)

(৪) ঈশ্বরকেন্দ্রিক দর্শন (God-centred philosophy)

ভাবজড়তা কেন্দ্রিক দর্শনের ধ্বজাধারীরা কুসংস্কার, ত্রুটিপূর্ণ ভাবাবেগ আর উদ্ভট তত্ত্বে বিশ্বাসী। বস্তুতপক্ষে সমস্ত ধর্মমতই (religion) ভাবজড়তা কেন্দ্রিক। তাই কোনও ধর্মমতই অন্য কোনও ধর্মমতকে সহ্য করতে পারে না। এরা

নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হীন উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের নামে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে। ডগমার অনুসরণকারীরা বলে থাকে যে ঈশ্বর স্বয়ং স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে নির্দিষ্ট কাজটি করতে তাদের আদেশ দিয়েছেন, আর এই অজুহাতে সাধারণ মানুষকে চুটিয়ে শোষণ করে।

জড়বাদকেন্দ্রিক দর্শনের অনুসারীগণ নিজেদের স্বার্থে সব কিছুকে ভোগ করতে চায়। জড়-জাগতিক বস্তু সমূহের ভোগই এদের প্রধান উপজীব্য। মার্কসবাদ তারই উদাহরণ। নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে এই দর্শনের মতাবলম্বীরা সাধারণতঃ পশুশক্তি প্রয়োগ করে অন্যকে শোষণ করে থাকে।

আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক দর্শনের মতাবলম্বীরা কেবল নিজের স্বার্থ ও আত্মসুখ চরিতার্থ করতেই সব কিছু করে থাকে। অন্য দু'টো দর্শনের থেকে এই দর্শনের মানসিক ব্যাসার্ধ একটু বড়। এই বড় ব্যাসার্ধ বলতে শুধু এইটুকু বোঝায় যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কেবল নিজের কথাই ভেবে চলা। নিজের স্বার্থ পরিপূর্তিই এখানে একমাত্র উদ্দেশ্য। উদাহরণ: পুঁজিবাদ।

ভাবজড়তা কেন্দ্রিক দর্শন হচ্ছে ব্যষ্টিস্বার্থকেন্দ্রিক ও জড়বাদকেন্দ্রিক দর্শনের মিশ্রণ সংজাত। এই ধরনের মিশ্রণ

কখনো আদর্শ আচরণীয় (cult) হতে পারে না। আদর্শ আচরণের সঙ্গে বাস্তব জীবনাচরণের সম্পর্ক থাকতে বাধ্য। বাস্তবিকতার সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো কিছুই আদর্শ আচরণ (cult) পদবাচ্য নয়।

ঈশ্বরকেন্দ্রিক দর্শনের অনুসারীগণ সমান স্নেহ-মমতার সঙ্গে শুধু সমগ্র মানব সমাজকেই নয়, সমগ্র জীবজগৎকে নব্যমানবতাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেবা করে চলে। যদিও এই ঈশ্বরকেন্দ্রিক মানুষদের ভাবনায় ব্যাসার্ধের তারতম্য থাকে, তবুও তাদের ভাবনার কেন্দ্রে থাকেন ঈশ্বর। ঈশ্বরই ঈশ্বরকেন্দ্রিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। তাই ঈশ্বরের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা তথা ভক্তির প্রাবল্য অনুযায়ী ব্যাসার্দ্ধও পরিবর্তিত হতে থাকবে।

এই চার ধরনের দর্শনের মধ্যে ভাবজড়তা কেন্দ্রিক দর্শনই নিকৃষ্টতম। তার থেকে একটু ভাল জড়বাদকেন্দ্রিক দর্শন। আর একটু ভাল ব্যষ্টিস্বার্থকেন্দ্রিক দর্শন। মানব সমাজের রক্ত-স্নাত অধ্যায়ের প্রধান প্রধান ঘটনা সমূহের জন্যে দায়ী ভাবজড়তা কেন্দ্রিক দর্শন। এ ব্যাপারে জড়বাদকেন্দ্রিক ও ব্যষ্টিস্বার্থকেন্দ্রিক

দর্শনের ভূমিকাও নগণ্য নয়। একমাত্র ঈশ্বরকেন্দ্রিক দর্শনের ক্ষেত্রেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সম্ভাবনা নেই। এই দর্শনে মানব মনে অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি ও সন্তুষ্টির বাহ্যিক প্রতিফলনের ফলেই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সম্ভাবনার সৃষ্টি হয় না।

সাধারণ মানুষের মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই ব্যষ্টিস্বার্থকেন্দ্রিক। কিন্তু মানব সেবায় নিয়োজিত সর্বত্যাগীদের মানসিকতা ঈশ্বরকেন্দ্রিক। ঈশ্বরকেন্দ্রিক মানুষদের অবদানেই মানব সমাজ সমৃদ্ধ হয়েছে। অতীতে তাঁরা এই সমৃদ্ধি এনেছেন, বর্তমানে আনছেন, আর ভবিষ্যতেও আনতে থাকবেন।

ঈশ্বরকেন্দ্রিক বিশ্বের পরিধি, পথ ও অধিক্ষেত্র বাকী তিনটি থেকে অনেক, অনেক বিস্তৃততর। এই তিন ধরনের দর্শনের মধ্যে যদি কখনো কোনো সংঘর্ষ হয়, শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকেন্দ্রিক দর্শনই জয়যুক্ত হবে। তেমনি আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক আর জড়কেন্দ্রিক দর্শনের মধ্যে সংঘর্ষ হলে আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক দর্শনই জয়যুক্ত হবে [অর্থাৎ তা জড়কেন্দ্রিক দর্শনকে আত্মসাৎ করে নেবে]। জড়কেন্দ্রিক দর্শন কখনই জয়ী হতে পারবে না। এই দর্শন যেমন ভাবে হঠাৎ আসে, তেমনি প্রচণ্ড ক্ষতি ও বিপর্যয় সৃষ্টি

করে দিয়ে হঠাৎ একদিন চলে যায়, কালের করাল গহ্বরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কম্যুনিজম

ভাবজড়তা কেন্দ্রিক ও জড়বাদকেন্দ্রিক দর্শনের বিষময় সংমিশ্রণে, এই দুই প্রকার দর্শনের পাশবিক মেলবন্ধনে কম্যুনিজমের সৃষ্টি হয়েছে। এ এক বীভৎসতম দানবীয় দাপট- যা তামসী পরিসমাপ্তির দোড়গোড়ায় পৌঁছে গেছে। বিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই এর অপমৃত্যু ঘটবে।

বস্তুতঃ কম্যুনিজমের কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। এতে রয়েছে স্থূল জাগতিকতা, কিছুটা ভাবাবেগ আর সামান্য যুক্তি। অল্পসংখ্যক কিছু যুক্তিসম্পন্ন মানুষ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু এটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ দর্শন।

কম্যুনিজম তত্ত্ব ন্যায়নীতি বর্জিত, অবৈজ্ঞানিক ও অমনস্তাত্ত্বিক। কম্যুনিজমের অবলুপ্তির বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রত্যক্ষ কারণ (immediate cause) কী?

একজন মদ্যপায়ীর উদাহরণ নেওয়া যাক্। একজন মানুষ যদি অধিকমাত্রায় মদ্যপান করে সে যকৃতের রোগে আক্রান্ত হবে ও পরিণামে তার মৃত্যু হবে। কিন্তু যদি সে একই দিনে অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপান করে, ধরা যাক্, দশ বোতল মদ্যপান করে, তবে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটবে। কম্যুনিজমের আজ থেকে আরও কিছু দশক পরে মৃত্যু হতে পারত, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর এই শেষ দশকেই তার অন্তিম দিন ঘনিয়ে আসছে। রাবণ সীতাহরণ করে সবচেয়ে বড় ভুল করেছিল।

কম্যুনিজমের সবচেয়ে বড় ভুল হল তা এক ঈশ্বরকেন্দ্রিক দর্শনের ওপর আঘাত হানল। এটাই কম্যুনিজমের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ।

কম্যুনিজম মানব সমাজে এক ঋণাত্মক ছাপ রেখে গেছে ও তা কখনও শান্তির পথ অনুসরণ করেনি। জড়কেন্দ্রিক তত্ত্বের বিকাশ চার্বাক দর্শনের চেয়ে কম্যুনিজমের মাধ্যমেই বেশী হয়েছে। চার্বাক ঈশ্বর সম্পর্কে কোনো ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দেন নি, কিন্তু কম্যুনিজম দিয়েছে। এক সময় কম্যুনিজম কিছু স্থানে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু এখন এক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। কম্যুনিজমের মৃত্যুতে এখন বিশ্বজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে এক আদর্শগত

শূন্যতা- ভৌতিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক সকল ক্ষেত্রেই। অত্যল্পকালের মধ্যে এই শূন্যতা পূরণ করতে হবে এক বলিষ্ঠ নির্দেশনা ও পরিচালনা শক্তির সহায়তায়। তোমাদের উচিত ৰৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে এই শূন্যস্থান পূরণ করা। যদি অলস ভাবে বসে থাক, অন্য কোনো অধ্যাত্মবিরোধী তথা দানবীয় তত্ত্ব সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে ও এই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে। তাই অলসতা ও দীর্ঘসূত্রতাকে প্রশ্রয় দিও না। যদি নিজের জীবনকে চরিতার্থ করতে ও সমাজের স্বার্থে কিছু করতে চাও, তাহলে নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, অলসতা ও দীর্ঘসূত্রতা-এই ছয় প্রকার দোষ থেকে মুক্ত হতে হবে।

প্রাউটই সমস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান। যদি প্রাউটের ঈশ্বরকেন্দ্রিক দর্শন আজকের এই আদর্শগত শূন্যতা পূরণে অবিলম্বে না এগিয়ে আসে, তবে অন্য কোনও অবাঞ্ছনীয় দর্শন এসে যাবে। কারণ প্রকৃতির জগতে কোথাও শূন্যতা থাকতে পারে না। যদি এই আদর্শগত শূন্যতা প্রাউটের দ্বারা পূর্ণ না হয়, ভবিষ্যতে এক ভয়ংকর বিপর্যয় নেমে আসবে। অন্য কোনো ত্রুটিপূর্ণ দর্শন, কোনো ভাবজড়তা

কেন্দ্রিক, জড়কেন্দ্রিক বা আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক তত্ত্ব এই শূন্যস্থান দখল করবে। আমরা এটা হতে দিতে পারি না।

ব্যষ্টিস্বার্থকেন্দ্রিক দর্শন মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে, সমগ্র মানব সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। জড়বাদকেন্দ্রিক দর্শনও বৈষম্যের মাধ্যমে বিশ্বের শান্তি বিনষ্ট করে। ব্যষ্টিস্বার্থ কেন্দ্রিক দর্শন অর্থাৎ পুঁজিবাদ আর জড়বাদকেন্দ্রিক দর্শন অর্থাৎ মার্কসবাদ–দুটোই অনেক দিন পাশাপাশি চলেছে। পুঁজিবাদ মানুষের উপকারে লাগবে না, আর মার্কসবাদ মানুষের উপকার করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই দু'টোরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। পুঁজিবাদের হবে স্বাভাবিক মৃত্যু, আর মার্কসবাদের অপমৃত্যু তো হয়েই গেছে।

রিলিজিয়ন বা উপধর্ম বা ধর্মমত

রিলিজিয়ন কী? রিলিজিয়নের ভিত্তি ডগ্‌ম্না বা ভাবজড়তা কেন্দ্রিক দর্শন। ভাবজড়তা কেন্দ্রিক দর্শন হ'ল জড়কেন্দ্রিক ও আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক দর্শনের একটা মিশ্ররূপ। তাই রিলিজিয়নগুলি আংশিক ভাবে জড়কেন্দ্রিক ও আংশিক ভাবে আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক।

জড়কেন্দ্রিক দর্শনগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরোপুরি ডগ্‌ম্যা আশ্রিত। অন্যদিকে আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক দর্শনগুলি ড্যা ও সেন্টিমেন্টের মিশ্রণ।

রিলিজিয়নগুলি কখনো কখনো দীর্ঘকাল টিকে থাকে যদিও তারা ভাবজড়তায় পরিপূর্ণ। তার কারণ তারা জানে কীভাবে সত্যকে অস্বীকার করে বা তাকে বিকৃত করে, জনমনে কুশিক্ষার বিষ ঢুকিয়ে দিতে হয়। তারা এও জানে কেমন করে বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ল বিশেষ সুবিধা- ভোগী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে চলা। কিছু কিছু রিলিজিয়ন ঈশ্বরমূলক ভাবধারার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকেন্দ্রিক নয়। তাদের উপধর্মগত শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হ'ল ঈশ্বর সমন্ধে নানান ভাবজড়তাশ্রয়ী প্রসঙ্গের অবতারণা করে সাধারণ মানুষের মনে ভাবাবেগ জাগিয়ে দেওয়া। এই ভাবাবেগগুলি মানুষের মনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়। ভাবজড়তা কেন্দ্রিক দর্শনগুলির প্রধান প্রধান অস্ত্র হ'ল-

(১) বিভিন্ন গল্পকথা, অবাস্তব কাহিনী, রূপক কাহিনী ইত্যাদি প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মনে মহামন্যতা ৰোধ (superiority complex) সৃষ্টি করা।

(২) বিভিন্ন গল্পকথা, অবাস্তব কাহিনী, রূপক কাহিনী ইত্যাদি প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মনে হীনম্মন্যতাৰোধ (inferiority complex) সৃষ্টি করা।

(৩) জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষ করে সামাজিক-অর্থনৈতিক সচেতনতার অভাব আছে এমন ধরনের মানুষের মনে ভীতম্মন্যতা (fear complex) ও হীনমন্যতা (inferiority complex) বোধ সৃষ্টি করে দেওয়া।

এইভাবে সমস্ত রিলিজিয়নগুলি জনসাধারণের মনে সুকৌশলে মহামন্যতা, হীনমন্যতা ও ভীতমন্যতার সূচিকাভরণ (injection) করে দেয়। এটাই সত্য নয় কি? যেহেতু সমস্ত রিলিজিয়ন যুক্তির পথ বর্জন করে ভাবজড়তাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, সেজন্যেই তারা তাদের মতবাদের প্রচারে এই সব গল্পকথা ও অবাস্তব কাহিনীর আশ্রয় নেয়।

বিভিন্ন রিলিজিয়ন প্রচার করে 'আমার ভগবানই একমাত্র সত্য, অন্যান্য ভগবানেরা মিথ্যা'। কোনো রিলিজিয়ন যখন দাবী করে, 'আমার ভগবানই একমাত্র সত্য'–তখন বুঝে নিতে হবে, এ ধরনের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভাবজড়তাশ্রয়ী।

আমাদের দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে আছে–পরমপুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, দেহ থেকে বৈশ্য ও পা থেকে শূদ্রের জন্ম হয়েছে।

"ব্রাহ্মনোऽস্য মুখমাসীৎ বাহুরাজন্যেऽভবৎ।
মধ্যতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্র অজায়ত।।"

অনেকেই বলেন যে এই শ্লোকটি প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের নয়। এ ধরনের শিক্ষা সাধারণ মানুষের মনে হীনমন্যতা ও ভীতমন্যতা ৰোধ সৃষ্টি করবেই। বিভিন্ন রিলিজিয়নে এ ধরনের ভাবজড়তার অসংখ্য উদাহরণ আছে।

ভাবজড়তা কেন্দ্রিক দর্শনগুলির অশুভ প্রভাব থেকে অব্যাহতি পেতে শিক্ষার প্রসার ও যুক্তিসম্মত চিন্তাধারার প্রোৎসাহন–এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে। কেবল স্কুল–কলেজ নির্ভর শিক্ষায় যথাযথ ফললাভের সম্ভাবনা খুবই কম। যে শিক্ষা মানব মনে যুক্তিসংগত চিন্তাধারার উন্নত স্তরের অভিস্ফুরণ ঘটাতে সক্ষম সেই শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে এই ধরনের শিক্ষা যাতে প্রসারলাভ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

আবার বলি, রিলিজিয়ন সংক্রান্ত ডগ্‌ম্নাকে প্রতিহত করতে আমাদের দু'ভাবে এগোতে হবে। প্রথমে যুক্তিবিজ্ঞানের পথ ধরতে হবে। এজন্যে আমাদের রয়েছে প্রাউট ও নব্যমানবতাবাদ। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে আধ্যাত্মিক সেন্টিমেন্ট জাগ্রত করতে হবে যা রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্টের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। তার জন্যে জনসাধারণকে যথার্থ আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

আমাদের কর্তব্য

তাহলে উপযুক্ত কর্তব্য কী হবে? প্রথমতঃ, জড়কেন্দ্রিক দর্শনগুলোর বিরোধিতা করতে হবে যা ইতোমধ্যে ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই জড়র্কেডিন দর্শনগুলি একবার যদি পরাভূত হয়, রিলিজিয়াস ডগগ্মার শক্তিও স্বাভাবিক ভাসে হ্রাস পেতে থাকবে ও পরিশেষে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই জানে বালে সাচন এগোতে হবে।

কম্যুনিজমের আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর আর একটি কারণ র'ল সামনে মধ্যে মানসিক স্তরে চেতনার বিকাশ। হঠাৎ করে এই যে সচেতনা বৃষ্টি হধোনে কা হয়েছে প্রাউট, নব্যমানবতাবাদ ও আধ্যাত্মিক দর্শনের জন্যে। সামুসের স্বতঃকারে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির যে আক্ষেপ দেখা দেয় কম্যুনিজমের ক্ষেত্রে ঠিক তাই اخرة এজন্যেই আবার বলি তোমাদের এই শূন্যস্থান পুরণ করতে হবে।

মানব জীবনে সামাজিক-অর্থনৈতিক দিকটা বই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এটটি সা কিছু নয়। যারা মানবতার সেবায় নিবেদিত ও ঈশ্বরকেন্দ্রিক দর্শনে প্রতিষ্ঠিত ব্যালেন ভালভাবে প্রাউট দর্শনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সামাজিক-অর্থনিতির দিশ

ছাড়াও জীবনের অন্যান্য দিকও রয়েছে। ভাতির (অর্থাৎ নিকাশ) অন্যান্য আর (spoke) অর্থাৎ অঙ্গগুলিও রয়েছে। প্রাউটের মাধ্যমে ও নিঃস্বার্থ দেখার আধাসে আমরা উপযুক্ত ভাবে মানুষের সেবা করতে পারি যাতে করে তারা জীবনের স্বাভাবিক ধারা বেয়ে এগোতে পারে। তবে আধ্যাত্মিক দর্শনের জ্বল জীবনো সাধারণ ধারার ঊর্ধ্বে। আধ্যাত্মিক দর্শন হ'ল সমস্ত কিছুর চত্রনাভি। আধ্যাজিকতা। প্রচার, প্রাউটের বাস্তবায়ন ও নিপীড়িত মানবতার নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে তোমা স্বল্পকালের মধ্যে জনজীবনের যথাযথ উন্নতি ঘটাতে পারবে।

আমি ইতোপূর্বেই বলেছি, অত্যন্ত নিকট ভবিষ্যতেই ডগ্ন্যাকেন্দ্রিক, জড়কেন্দ্রিক ও আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক তত্ত্বগুলিকে তোমাদের ঈশ্বরকেন্দ্রিক দর্শনের দ্বারা অপসারিত করতে হবে। তাই রিলিজিয়নের ডাকেন্দ্রিক তত্ত্বসমূহ, কম্যুনিজমের জড়কেন্দ্রিক তত্ত্ব ও পুঁজিবাদের আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক তত্ত্বের এই শূন্যতাকে পূরণ করবার জন্যে তোমাদের শারীরিক ভাবে, ৰৌদ্ধিক ভাবে, নৈতিক ভাবে, ৰোধিগত ভাবে ও আধ্যাত্মিক ভাবে প্রস্তুত হতে হবে। সময় তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে

না। আমাদের কখন সুবিধা হবে, কখন আমরা সমর্থ হব, তার জন্যে তো সময় অপেক্ষা করে থাকবে না। এইটাই সবচেয়ে উপযুক্ত মুহূর্ত। পাঁজিপুঁথি দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। আগামীকালের জন্য প্রতীক্ষা করে বসে থাকবে না।

১৫ জানুয়ারী ১৯৯০, কলিকাতা

সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহতা

মানুষ যে জাতপাত ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায় সেটা কি স্বাভাবিক, না কৃত্রিম? স্বাভাবিক বিভাজন কোষ বিভাজনের মত- একটা কোষ যেমন দু'টো কোষে বিভাজিত হয়। কৃত্রিম বিভাজন এরকম নয়। কাজেই, মানুষের জাতি ও সম্প্রদায়গত ভেদকে কী বলা যাবে-স্বাভাবিক বিভাজন, না কৃত্রিম বিভক্তিকরণ? বৈরী শক্তিগুলির মধ্যে কিছু দল আছে যেগুলো বিচ্ছিন্নতার মতাদর্শে চালিত হয় ও কিছু লোকও আছে যারা এই সব বিভেদকামী দলগুলির দ্বারা চালিত হয়। এই

সমস্যার সমাধান কীভাবে সম্ভব হবে? কীভাবে আমরা এই সব যুযুধান দলগুলিকে একটা অচল সেকেলে ভাবাদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারব যা দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিতে পারে? কী করা উচিত? আমাদের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী নীতিগুলি কী হওয়া দরকার? ব্যবস্থাটা দু'রকমই হতে হবে– ভৌতিক (physic) ও মানসিক (psychical)। শুধুমাত্র কি অর্থনৈতিক তত্ত্বেই এর সমাধান হবে, না আরও কিছু করার দরকার? শিক্ষা একটা দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম (programme)। কিন্তু ভৌতিক (physical) ও মানসিক (psychic) ক্ষেত্রে আশু কর্ত্তব্য কী হওয়া উচিত? দেশ একটা চরম সংকটকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তাই তোমাদের সবকিছু ভালভাবে জেনে নিতে হবে।

রাজনীতিতে ভেদনীতি অর্থাৎ 'বিভেদ সৃষ্টি কর ও শাসন কর' (divide and rule) বলে একটা তত্ত্ব আছে। শুধুমাত্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে হীনবল করতে ব্রিটিশ সরকার সম্প্রদায়গত বিভাজনকে উৎসাহ দিয়ে ভারতীয় জনগণকে মুসলমান অমুসলমান এইভাবে বিভক্ত করার কর্মসূচী

নিয়েছিল। তারা চেয়েছিল যে দেশের জনগণকে জাতি, তপশীলভুক্ত জাতি, উপজাতি, মুসলমান-অমুসলমান ও সাধারণ জাতি এইভাবে বিভক্ত হয়ে থাকুক। আমাদের নেতাদের এই ধরনের বিভাজন মেনে নেওয়া উচিত হয় নি। বরং সেই সময় তাঁদের বলা উচিত ছিল যে জাতি বা সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে নয়, অগ্রাধিকার (preference) দিতে হবে সামাজিক-আর্থিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার ভিত্তিতে। কিন্তু কোনো কোনো রাজনৈতিক দল জাতপাতের গোঁড়ামি অথবা সাম্প্রদায়িক সেন্টিমেন্টের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। সেইজন্যই তারা ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করেছিল।

(ভারতের) স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে মহাত্মা গান্ধী একটা বিরাট ভুল করেছিলেন। নিজের নির্দোষিতার ভাবমূর্ত্তি বজায় রাখতে তিনি বলেছিলেন যে তিনি সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সমর্থনও করবেন না, কিন্তু তার বিরুদ্ধে বোটও (vote) দেবেন না। অর্থাৎ কিনা, তিনি এটাকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করলেন। এর পরে দেশে যা ঘটল সেটা মহাত্মা গান্ধীর হিমালয়সম ভ্রান্তির ফলেই ঘটল। সেই সময় এটা বলা যথার্থ হত - "না, আমি সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সমর্থন করি

না।" না, সেটা কিন্তু তিনি বলেন নি কারণ তাঁর দলীয় কর্মীরা ও নেতারা মন্ত্রী হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, আর সেইজন্য তারা তাঁকে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের জন্যে চাপ দিচ্ছিল। মহাত্মা গান্ধী এটাকে মানলেনও না, কিন্তু বিরুদ্ধেও গেলেন না। এরপরে দেশে যা ঘটে গেল সেটা মহাত্মা গান্ধীর কৃতকর্মের ফল। সেই সময়ে তাঁর (স্পষ্ট) বলা উচিত ছিল যে দেশকে বিভক্ত করে তার সংহতি আমরা নষ্ট করতে পারি না। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার পরিণতি হ'ল দেশটা পাকিস্তান, ভারত ও বাঙলাদেশ এই তিন টুকরোয় বিভক্ত হয়ে গেল। এটা হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর মহাভুলের ফলে আর সেই ভুলটা তিনি করেছিলেন দলীয় নেতাদের চাপে পড়ে। তারা মন্ত্রীত্ব পেতে তৎপর হয়ে উঠেছিল কারণ সেই সময় ভারত সরকারে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন আদায়, মন্ত্রীত্ব পাওয়া, দু'টো নূতন প্রদেশ সৃষ্টি (ওড়িশা ও সিন্ধু) ও সিংহল (শ্রীলঙ্কা) ও ব্রহ্মদেশকে (মায়ানমার) ভারত থেকে আলাদা করা, এই সব সুযোগ এসেছিল।

১৯৩৫ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ঘোষিত হয়েছিল কিন্তু সেটা কার্যকরী হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। সিন্ধু স্বায়ত্বশাসনে সম্মত

হয়েছিল কারণ ভারতের কোনো একটি সংখ্যালঘু দল সেখানে সংখ্যাগুরু ছিল। আর ওড়িশা সৃষ্ট হয়েছিল তার প্রাকৃতিক অবস্থানগত প্রয়োজনে। কোনো মানসিক ভাবাবেগের জন্যে নয়। সেই সময় ওড়িশার লোকদের রাজধানী পটনায় যেতে খুবই অসুবিধা হত কারণ তাদের কলকাতার ওপর দিয়ে পটনায় যেতে হত। এই জন্য তারা দাবী করল যে ওড়িশাকে বাঙলার সঙ্গে যুক্ত করা হোক নতুবা ওড়িশাকে একটা আলাদা প্রদেশ করা হোক। তাদের দাবী ছিল যে ওড়িশাকে বিহারে রাখা চলবে না কারণ পটনা যেতে হলে তাদের কলকাতার ওপর দিয়ে যেতে হয়। ওড়িশার সৃষ্টি খারাপ ছিল না কিন্তু সিন্ধু প্রদেশের সৃষ্টি খারাপ হয়েছিল। এগুলি ছিল ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বিষাক্ত ফল।

ভারত সরকারের

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর উদাহরণ হিসেবে ৰাঙলার দৃষ্টান্তটা নাও। সেই সময়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনে ৰাঙলার বিধানসভায় সৃষ্ট হয়েছিল ২৫০টি আসন। এই ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ছিল ১২০টি আসন, অ-মুসলমানদের জন্য ৮০টি আসন, ২৫টি আসন ছিল ব্রিটিশ

বণিকদের জন্যে (কলকাতার ব্রিটিশ বণিকদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা জন্যে), কিছু আসন ছিল জমিদারদের জন্যে, কিছু বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্যে আর কিছু ছিল শ্রমিক নেতাদের জন্যে। সব মিলে ২৫০টি আসন। সেই সময়ে বাঙলার ৪৫% অধিবাসী ছিল মুসলমান আর বাকী ৫৫% ছিল অ-মুসলমান। অর্থাৎ কিনা বাঙলার শুধু দেশটারই বিভাজন হ'ল না। মানসিক বিভাজনও হ'ল যার পরিণামস্বরূপ সাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে বাঙলা বিভক্ত হয়ে গেল।

সাম্প্রদায়িকতা অস্বাভাবিক। আজ মুর্খ নেতারা, রাজনৈতিক নেতারা, এই সেন্টিমেন্টটাকেই আবার উস্কে দিচ্ছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে যদি এটাকে ঠিক সময়ে (এটাই সঠিক সময়) সংযত না করা হয় তবে দেশটা আরও খণ্ডিত হয়ে যাবে।

ভারত সরকারের সেই সময়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত বাস্তবপক্ষে তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল। বাঙলা দুইভাগে বিভক্ত হ'ল। পঞ্জাব দুই ভাগে বিভক্ত হ'ল। অসম দুইভাগে বিভক্ত হ'ল। সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভারতের বাইরে চলে গেল। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ফল হ'ল এটাই। মুর্খ

নেতারা, নির্বোধ নেতারা এই সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাকে সমর্থন করেছিলেন। ইতিহাস থেকে তাঁরা শিক্ষাও নেয় নি।

(ব্রিটিশ) পলিসি ছিল 'বিভেদ সৃষ্টি কর ও শাসন কর' (divide and rule)। একটা দল বলত "জয় হিন্দ", তো আরেকটি দল বলত "তাকাশি 'মে হিন্দ"। একদল বলত ভারতের জয় আর অন্য দলটি বলত 'ভারত. ভাগ কর'। তখনকার দিনে এটাই ছিল শ্লোগান। কোনো সুস্থ পরিবেশ ছিল না। এই সেন্টিমেন্টটা ভৌম সেন্টিমেন্টও (Geo-sentiment) ছিল না। এর মূলে ছিল নিছক একটা ভাবাবেগ (sentiment) ও হীন স্বার্থপরতা। এর পর থেকে ভারতবর্ষ থেকে সুস্থ রাজনীতি লোপ পেয়ে গেল। নেহেরু দেশ ভাগকে সমর্থন করেছিলেন কারণ তাঁর স্বপ্ন ছিল দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া-তা সে অবিভক্ত ভারতের হোক বা বিভক্ত ভারতের হোক। মন্টেও চেমসফোর্ড দেখলেন যে দলগুলি দলাদলিতে বিভক্ত। তিনি স্থির করতে পারলেন না কাদের হাতে তিনি ক্ষমতা অর্পণ করবেন। সেই সময় (সম্প্রদায়গুলির মধ্যে) পারস্পরিক বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পারস্পরিক কোনো

বোঝাপড়া ছিল না। সেই জন্যই তো দেশটা ভাগ হয়ে গেল। নতুবা ব্রিটিশরা দেশটাকে ভাগ করতে পারত না। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে ভৌতিক (physical) সংহতি ও মানসিক (মানস-সামাজিক) সংহতি দু'টোই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সংখ্যালঘুদের অধিকাংশই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের ওপর আস্থা রাখতে পারেনি। আর সেইজন্য ভীত হয়ে তারা দেশকে ভাগ করতে চাইল। বাঙলা ও পঞ্জাবে হিন্দু সংখ্যালঘুরা মুসলমান সংখ্যাগুরুদের ওপর আস্থা রাখতে পারেনি। তাই তারাও এই দুই প্রদেশকে ভাগ করতে চাইল। এই মনস্তত্ব আজও রয়েছে। সেই সময়ে দেশে কিছুমাত্র রাজনৈতিক শিক্ষা বা রাজনৈতিক চেতনা ছিল না।

প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন অনুসারে প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের বলা হত প্রধানমন্ত্রী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলে কেউ ছিল না। লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউস থেকে মোটামুটি ভাবে ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করা হত।

ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি ১৯৩৫-এর এই রোয়েদাদের বাইরে ছিল। সেই কারণের দেশীয় রাজ্যগুলির সাম্প্রদায়িক স্থিতি ভারতের বাকী অংশের চাইতে অনেক ভাল ছিল।

কশ্মীরে সাম্প্রদায়িকতা কিছুমাত্র ছিল না যদিও সেখানে মুসলমান প্রজারা হিন্দু রাজার অধীনে বাস করত। অনুরূপভাবে হায়দরাবাদে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের মুসলমান শাসক থাকলেও সেখানে কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। এর কারণ ছিল এই যে দেশীয় রাজ্যগুলি সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বাইরে ছিল। ব্রিটিশের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সেখানে প্রযুক্ত হয় নি।

নাগিনীরা এখন চারিদিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলছে। (সংগ্রাম করার) এটাই সঠিক মুহূর্ত্ত। এটাই উপযুক্ত মুহূর্ত্ত। এটাই মাহেন্দ্রক্ষণ।

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।
'বিদায় নেবার আগে তাই ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

নাগিনীরা চারিদিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলছে। এই সংকটময় মুহূর্তে আমরা কি শুধু শান্তির বাণী প্রচার করে যাব? না, না, না, না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে আমি এই দানবদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছি। তোমরা কি বুঝতে পারছ? ৬০ বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ যা বলে গিয়েছেন তা আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও সমান সত্য।

২০ অক্টোবর ১৯৯০, কলিকাতা

প্রশ্নোত্তরে প্রাউট

প্রশ্ন-১ সমবায়ে শেয়ার বিতরণ কীভাবে হওয়া উচিত?

উত্তর: প্রাউট কৃষিজমিকে পর্যায়ক্রমে সামাজিকীকরণের সুপারিশ করে। কৃষিজমি কর্ষক সমবায়ের ব্যবস্থাপনায় থাকা

উচিত। সমবায়ের ব্যবস্থাপনায় (জমি) হস্তান্তরের প্রারম্ভিক পর্যায়ে যারা জমির মালিক, তাদের হাতে জমির শেয়ার রাখতে হবে। অর্থাৎ প্রারম্ভিক পর্যায়ে কৃষি বা কর্ষক সমবায়ে শেয়ার দেওয়া হবে জমির মালিকদের যাদের জমি সেই সমবায়ে অধিগৃহীত হয়েছে। যখন সমবায় ব্যবস্থা কৃষিক্ষেত্রে পূর্ণরূপে রূপায়িত হবে তখন জমির মালিক আর অ-মালিকদের 'মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না কারণ জমির ব্যবস্থাপনার পুরো দায়িত্ব থাকবে যৌথভাবে সমবায়ের সমস্ত সদস্যদের ওপর। অবশ্য, জনসাধারণের যথার্থ মানসিক প্রস্তুতির ওপরেই এই পর্যায়ে উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা নির্ভর করছে।

সমবায় প্রথায় সুদ অর্জনকারী শেয়ার রাখার কোনো ব্যবস্থা থাকা উচিত নয় অর্থাৎ সমবায়গুলিতে মুনাফা অর্জনকারী শেয়ার থাকবে না। বরং জমির উৎপাদনের ভিত্তিতে শেয়ার রাখা হবে। যদি কৃষি বা কর্ষক সমবায়ে মুনাফা অর্জনকারী শেয়ার রাখা হয় তাহলে সেগুলি শেয়ার বাজারে বিক্রীত হবে, পুঁজিপতিরা শেয়ার কিনতে থাকবে, শেয়ারে বাজারের নিয়ম অনুযায়ী শেয়ারগুলির দামের ওঠানামা

করতে থাকবে, আর (ফলস্বরূপ) সমবায়গুলি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

অনুরূপভাবে, শিল্প সমবায়ে ডিভিডেন্ড শেয়ার থাকা উচিত, ব্যাঙ্কের সুদের মত মুনাফা লোটা শেয়ার নয়। এটা না হলে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে যাবে। মুনাফা শেয়ার থাকলে সমবায় প্রথার মূল উদ্দেশ্যটাই (spirit) নষ্ট হয়ে যাবে আর সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি পুঁজিপতিদের হাতে চলে যাবে।

সুতরাং কোনো কর্ষক, উৎপাদক বা ভোক্তা সমবায়ে অগ্রাধিকার (preferential) শেয়ার অবশ্যই থাকবে না। শুধুমাত্র ডিভিডেন্ড শেয়ার থাকবে। অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকেরা নির্দিষ্ট হারে বাৎসরিক সুদ পান, তাতে সংস্থাটির লাভ বা ক্ষতি যাই হোক না কেন। অগ্রগণ্য শেয়ার হচ্ছে কৃষিতে সোঞ্জা প্রথার মত। সোঞ্জা প্রথায় ভাগচাষীরা জমিতে চাষ করতে স্বীকৃত হলে জমির মালিকদের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পেয়ে থাকে। ভাগচাষীরা কতটা উৎপাদন করল সেটা বিচার না করেই এটা দেওয়া হয়ে থাকে। এমনকি

ফসল নষ্ট হয়ে গেলেও এটা দেওয়া হয়। ডিভিডেন্ড শেয়ারে পাওয়া যায় ডিভিডেন্ড যা নিরূপিত হয় সংস্থার নীট মুনাফার ওপর।

শেয়ার মালিকদের অবশ্যই উঁচুস্তরের নীতিবাদী হতে হবে। সমবায়গুলিতে ভোটাধিকার ব্যষ্টির ভিত্তিতে থাকা উচিত, শেয়ারের সংখ্যার ভিত্তিতে নয়। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শেয়ার কেনা যেতে পারে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে গণতন্ত্র একটা প্রহসন মাত্র কারণ সেখানে ভোট কেনা যায় আর গরীব মানুষ নির্বাচনে লড়তে পারে না।

মানবিক সমস্যার সমাধান কমিউন ব্যবস্থাতেও নেই, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেও নেই। একমাত্র সমবায় প্রথাই সকল রকম সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারে।

প্রশ্ন–২ সেবামূলক সমবায় কাকে বলে?

উত্তর: এই ধাঁচের সমবায় উৎপাদক বা উপভোক্তা পর্যায়ের হবে না। এগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধরনের সমবায় যা কিনা সাংস্কৃতিক সমবায়ের পর্যায়ভুক্ত।

আমরা চিকিৎসকদের উদাহরণই নিচ্ছি। চিকিৎসকদের সেবামূলক সমবায় চালু করা উচিৎ। এইসব সমবায়গুলিকে 'চিকিৎসক সেবা সমবায়' নাম দেওয়া যেতে পারে। মনে কর, একজন চিকিৎসক পশার (practice) শুরু করতে পারছেন না। তিনি পাঁচ অথবা দশজন চিকিৎসকদের নিয়ে একটা সেবা সমবায় চালু করতে পারেন। এই ধরনের সমবায়কে ৰৌদ্ধিক সেবা সমবায় বলা হবে। যেসব চিকিৎকদের কম মূলধন থাকার জন্যে নিজস্ব পশার জমানো সম্ভবপর হয় না তাঁরা এই ধরনের সমবায়ে কাজ করতে পারেন। এই ধরনের ব্যবস্থা চিকিৎসকদের বেকার সমস্যার সমাধান করবে। এ ছাড়াও, চিকিৎসকরা এই সমবায়ের মাধ্যমে গবেষণা শুরু করতে পারেন যদিও চিকিৎকদের কাজের শতকরা ৯৯ ভাগই প্রয়োগমূলক আর বড়জোর শতকরা ১ ভাগ তত্ত্বমূলক।

সেবামূলক সমবায় ছাড়া আরও কয়েক ধরনের সমবায় আছে যার মধ্যে রয়েছে কর্ষক সমবায়, উৎপাদক সমবায়, উপভোক্তা সমবায়, ব্যাঙ্কিং সমবায়, গৃহ সমবায় ও পারিবারিক সুরক্ষা সমবায়।

একদিন বুদ্ধি আর বোধি এই পৃথিবীকে শাসন করবে আর সেইদিন খুব তাড়াতাড়ি আসছে। কমিউন ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আমরা সাম্যবাদী বাতিক (mania) বা আতঙ্কের দর্শন চাই না। ধী-সম্পন্ন মানুষ একদিন এই পৃথিবীকে শাসন করবে, আর সেই জন্যেই সমবায় প্রথা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন-৩ সারা বিশ্বের, বিশেষতঃ বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের মধ্যে প্রাউট প্রতিষ্ঠার কি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক অনুজীবতের কোনো ভূমিকা আছে? যদি থাকে তবে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অনুজীবতের ভূমিকা কী?

উত্তর: যে-কোনো মূল নীতি (principle) বা তত্ত্ব (theory) যুক্তির আধারে স্থাপিত হওয়া উচিত, ভাবাবেগের (sentiment) ওপর নয়। আর এই কথাটা সমগ্র মানব সমাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

(মানবদেহের) উর্ধ্বে চক্রগুলি ধনাত্মক অনুজীবতের আবাস ও সংশ্লেষণের পথ। নিম্নচক্রগুলি ঋণাত্মক অনুজীবতের আবাস ও বিশ্লেষণের পথ। সুতরাং নিম্নচক্রগুলি ঋণাত্মক

অনুজীবতের প্রিয় বিচরণভূমি। এখন কি তোমরা নিম্নচক্রগুলিতে ঋণাত্মক অনুজীবতের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারছ? কম্যুনিষ্টদের কার্যাবলী শুধুমাত্র নিম্নচক্রগুলির ওপর আধারিত। ফলস্বরূপ তাদের মন ক্রমশঃ স্থূল হয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং প্রাউট প্রতিষ্ঠায় ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অনুজীবতের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রাউট প্রতিষ্ঠিত হবে অধ্যাত্মবাদীদের দ্বারা কারণ অধ্যাত্মবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী সংশ্লেষণাত্মক। অধ্যাত্মবাদীরা বহুর মধ্যে এককে দেখেন। একের মধ্যে বহুকে দেখেন না। শেষ পর্যায়ে (তাঁদের কাছে) বহু হয়ে যায় এক। সেইজন্যে, প্রাউট প্রতিষ্ঠায় ধনাত্মক অনুজীবতের আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন–৪ সংখ্যালঘু ও প্রবল (strong) সংখ্যালঘুর মধ্যে পার্থক্য কী? রাষ্ট্রবিজ্ঞানের "weightage" পরিভাষায় অর্থ কী?

উত্তর: (কোনও দেশে) জনসংখ্যার ৪০% (চল্লিশ শতাংশ)–এর কম অংশকে সংখ্যালঘু বলা হয়। প্রবল (strong) সংখ্যালঘু বলা হয় জনসংখ্যার ৪০% থেকে ৫০%

সম্প্রদায়কে। লোকসভার আসনে যদি কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যে যুক্তিসঙ্গত অংশের চাইতে বেশি আসনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সেই ব্যবস্থাকে weightage বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক্। কোনো দেশের ৩৮% জনসাধারণ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ও ৬২ আরেকটি সম্প্রদায়ের। সেই দেশের ১০০টি আসনের জনপ্রতিনিধি সভায় প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের জন্যে ৩৮টি আসন রাখা উচিত। যদি তাদের তুষ্ট করতে সামাজিক নিরাপত্তার নামে ৩৮টির বেশি আসন নির্ধারিত করা হয় তাহলে এই (৩৮টির) অতিরিক্ত আসনগুলিকে weightage হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রবল (strong) সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে weightage ব্যবস্থা থাকে না।

অতীতে বাংলার জনপ্রতিনিধি সভায় ২৫০টি আসন ছিল। ২০০টি আসন পূরণ করা হ'ত নির্বাচনের মাধ্যমে আর ৫০টি আসনে মনোনয়ন দেওয়া হত। এই ৫০টি আসন ছিল সংখ্যালঘু ও বিশিষ্ট ব্যষ্টিদের জন্যে সংরক্ষিত। সেই সময় (বাঙলার) জনসংখ্যার ৪৫% ছিল একটি সম্প্রদায়ের ও ৫৫% ছিল অন্য সম্প্রদায়ের।

প্রথমোক্ত সম্প্রদায়কে তুষ্ট করতে ২০০টি আসনের মধ্যে ১২০টি আসনই সংরক্ষিত করা হয়েছিল। মাত্র ৮০টি আসন শেষোক্ত সম্প্রদায়ের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এটা কিন্তু সঠিক পন্থা ছিল না কারণ প্রথমোক্ত সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হলেও প্রবল (strong) সংখ্যালঘু ছিল।

প্রশ্ন–৫ প্রাউট দর্শনের আঙ্কিক স্থিতি কী? এটা কি omni-static, না statico-dynamic, না dynamico-static, না omni-dynamico?

উত্তর: Omni-static এক ধরনের নেতিবাচক শব্দ। এতে সৃষ্ট হয় নৈরাশ্যবাদ (cynicism) বা নৈরাজ্যবাদ (nihilism)। Statico-dynamic কিছুটা গতিশীল হলেও সেটা গতিহীনতায় আটকে যায়। Dynamico-static-এ কিছুটা গতি থাকলেও সেটা একসময় অধোগতির স্থবিরতার দিকে নিয়ে চলে। শুধুমাত্র omni- dynamic গতিই এই সৃষ্টিতে সকল সৃষ্ট জীবের সার্বিক মঙ্গল নিয়ে আসতে পারে। Omni-dynamic গতি জড় থেকে সূক্ষ্মাভিমুখী বিরামহীন গতি। এই গতিই

মানুষকে নিয়ে যাবে চিরস্থায়ী প্রগতি ও অধ্যাত্মিকতার জ্যোতির পথে। প্রাউট দর্শন Omni-dynamic |

প্রশ্ন-৬ প্রাউটের প্রগতি কী ধরনের প্রগতি?

উত্তর: প্রগতি দুই ধরনের হয়-একটি সাধারণ প্রগতি ও অপরটি ত্বরণযুক্ত (accelerated) প্রগতি। ত্বরণযুক্ত প্রগতিতে রয়েছে সাধারণ ত্বরণ, প্রগতিশীল ত্বরণ ও যৌথ (compound) ত্বরণ। যৌগ ত্বরণশীল প্রগতির গতি চক্রবৃদ্ধি সুদের হারের গতির মত বৃদ্ধি পায় না। চক্রবৃদ্ধি সুদের হার বাড়ে প্রগতিশীল ত্বরণযুক্ত গতিতে। কিন্তু এটা (অর্থাৎ যৌগ-ত্বরণ) আরও অনেক উচ্চপর্যায়ের ত্বরণ।

প্রশ্ন-৭ দেশের জমি যদি খুব উর্বর হয় ও মানুষের মাথাপিছু আয় যদি খুব বেশী হয় তার মানে এটা কি বোঝায় যে মানুষের মানসিক অভীপ্সা (micro- psychic connation) বা মানসিক আশা-আকাঙ্ক্ষার (micro-psychic as- piration) পূর্ত্তি হয়ে গিয়েছে?

উত্তর: না। মানুষের সামগ্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্তির জন্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি থাকা অত্যাবশ্যক:

(১) মানসাধ্যাত্মিক শিক্ষা। এই মানসাধ্যাত্মিক শিক্ষার অভাবে সমাজ খণ্ড- বিখণ্ড হয়ে যায়।

(২) নীতিবাদীদের শাসন।

(৩) একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক সংরচনা।

(৪) ক্রমবর্ধমান ক্রয়ক্ষমতা। মানুষের মাথাপিছু আয় যদি ৫০,০০০/- টাকা হয় আর চালের দাম যদি কুইন্টাল প্রতি ৮০,০০০/- টাকা হয়ে যায় তবে জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন-৮ মার্কসবাদ তো এখন মৃত। প্রাউটের ভূমিকা কী হওয়া উচিত?

উত্তর: লেনিনের দৈহিক মৃত্যু তো অনেক আগেই হয়ে গেছে। আর এখন কম্যুনিজম বা লেনিনজমের বৌদ্ধিক মৃত্যু ঘটছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে রয়েছে বৈয়ষ্টিক পুঁজিবাদ ও সাংঘিক পুঁজিবাদ (group capitalism)। প্রাচ্য দেশগুলিতে বৈয়ষ্টিক পুঁজিবাদ কিছু রয়েছে। কিন্তু এখানে রাষ্ট্রীয়

পুঁজিবাদের আধিপত্যই বেশি। পুঁজিবাদে সমর্থন আদায় করা হয় টাকার মাধ্যমে। আর, কম্যুনিজমে সমর্থন আদায় করা হয় ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে। যেমন, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরের হাওড়ার উলুবেড়িয়া মহকুমায়, হুগলী ও বর্ধমানের গ্রামবাসীরা কম্যুনিষ্ট পার্টির ভীতিতে রাজনৈতিক ভাবে পদানত হয়ে গেছে। কম্যুনিষ্ট নেতাদের মুখোশ খুলে গিয়েছে।

এখন বুদ্ধিজীবীরা প্রাউটকে এর বিকল্প হিসেবে পাচ্ছে। সাধারণতঃ সমাজের ৫০% শতাংশ লোক ভাল, ২৫% শতাংশ লোক সাধারণ ও ২৫% শতাংশ লোক দুষ্ট।

যদি তোমরা ৫০%-এর সঙ্গে ২৫% যোগ করতে পার তাহলে ৭৫% শতাংশ লোক প্রাউটের দিকে এসে যাবে। প্রাউটের বাণী জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যাও। মার্কসবাদের নিষ্ফল ভাবাদর্শ সমাজের বুকে শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। প্রাউটের ভাবাদর্শ দিয়ে এই শূন্যস্থান পূরণ করতেই হবে।

প্রশ্ন-৯ একদলীয় শাসনতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মৌলনীতির মধ্যে কতটা সামঞ্জস্য রাখা যেতে পারে?

উত্তর: একদলীয় শাসনতন্ত্র একটি শক্ত শাসনব্যবস্থা দেয় ঠিকই যা কিনা এর একটা ভাল দিক। কিন্তু এই ব্যবস্থার কিছু কুফলও আছে। একদলীয় শাসনতন্ত্র সুফলগুলি কী কী? এটা সত্য যে একদলীয় শাসনতন্ত্রে সরকার খুব শক্ত হয় ও শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ ঘটে। যদি একনায়ক শাসক (dictator) একজন কঠোর নীতিবাদী ব্যষ্টি হন তবে সমাজের নৈতিক মান খুব বেড়ে যেতে পারে। দেশের সামরিক শক্তি বেড়ে যাবে ও সরকারের সমস্ত নীতি ও পরিকল্পনা সহজে রূপায়িত হতে পারবে। এই ব্যবস্থায় সরকারের সব ভাল ভাল জিনিসগুলি পাওয়া যায়। কিন্তু এর সব চাইতে বড় ত্রুটি হচ্ছে যে জনগণের কণ্ঠ এখানে রুদ্ধ করে রাখা হয়। মানুষ চায় তার মনের ভাব প্রকাশের যথোপযুক্ত মাধ্যম। একদলীয় শাসনতন্ত্রে বা একনায়কতন্ত্রে এটা নেই।

গণতন্ত্রের গুণও আছে আবার ত্রুটিও আছে। গণতন্ত্রের ভাল দিকগুলি কখনই বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয় না। এটাই গণতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি। যেখানে মানুষ অধিকতর সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ভাবে সচেতন, মানুষ হিসেবে সচেতন,

সেখানে কিছুটা সুফল পেলেও, যেখানে এসব চেতনা কিছুই নেই সেখানে গণতন্ত্র একটা প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়।

আমি বলিনি যে ভারতের এই অবস্থা হয়েছে কিন্তু এ রকম অবস্থা কিছুটা তো হয়েইছে। তোমরা বুঝতে পারলে তো?

প্রশ্ন-১০ দ্রব্য বিনিময় বাণিজ্য (barter trade) কোন্ দেশের পক্ষে সুবিধাজনক বলুন-উন্নত, উন্নয়নশীল না অনুন্নত দেশ?

উত্তর: উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু যে দেশগুলিতে অতিরিক্ত (surplus) দ্রব্য, যেমন কাঁচামাল সীমাৰদ্ধ বা অপ্রতুল সেই দেশগুলিতে এর সুবিধা পাওয়া যাবে না। বাঙলাদেশে পাট ও পশুচর্ম অতিরিক্ত উৎপাদন হয় বলে সে দেশের পক্ষে দ্রব্য বিনিময় বাণিজ্য সুবিধাজনক। যেখানে অতিরিক্ত দ্রব্য (surplus) নেই সেখানে প্রত্যক্ষ বাণিজ্যের দরকার নেই।

প্রশ্ন-১১ যখন বিশ্ব সরকার গঠিত হবে তখনও কি বিশ্ব সামরিক রক্ষীবাহিনী রাখতে হবে?

উত্তর: বিশ্ব রক্ষীবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা আছে কারণ আন্তঃগ্রহ যুদ্ধ হতে পারে।

প্রশ্ন–১২ কম্যুনিষ্ট দেশে সবকিছুই কেন লৌহ যবনিকার অন্ধকার আড়ালে করা হত?

'উত্তর: কারণ তারা (কম্যুনিষ্টরা) কম্যুনিজমের ত্রুটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। তাই তারা তাদের কার্যকলাপ সারা দুনিয়াকে জানতে দিতে চায় নি।

প্রশ্ন–১৩ কমিউন ব্যবস্থার কোনো মনস্তাত্বিক ত্রুটি আছে কি?

উত্তর: কর্মীরা সেখানে কর্মের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। কর্ষকেরা যদি খামারকে নিজেদের বলে মনে করতে পারে তা হলেই তারা ভাল উৎপাদন পাবে।

প্রশ্ন–১৪ বোনাস ব্যবস্থা ও ফুরণ কাজ (piece work) ব্যবস্থা কাকে বলে?

উত্তর: পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুনাফার জন্যে উৎপাদন করা হয়। এই ব্যবস্থায় বোনাস সাধারণতঃ নির্দিষ্ট থাকে। (কোম্পানীর) সত্যকারের লাভ শ্রমিকদের জানতে দেওয়া হয়

না ও সেটা মালিকপক্ষ সরাসরি নিয়ে থাকে। সুতরাং শ্রমিকেরা আরও বেশি পরিশ্রম বা ভাল কাজ করার উৎসাহ পায় না। কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থায় উৎপাদন হয় রাষ্ট্রের জন্যে। শ্রমিকেরা নিজেদের কাজের সঙ্গে একাত্ম হয় না। সুতরাং কর্ম সম্পাদনে তাদের কোনো উৎসাহ থাকে না। প্রাউট ব্যবস্থায় উৎপাদন হবে উপভোগের [utilisation] জন্যে। আমাদের শিল্প ব্যবস্থা উপভোগের ওপর আধারিত হবে। মুনাফা হবে সর্বনিম্ন। সুতরাং পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শোষণ করার সুযোগ পাবে না ও সম্পদের যুক্তিসঙ্গত (rational) বন্টন হবে।

দ্রব্য উৎপাদনে যে সময় ব্যয়িত হয় সেটাকে তিন ভাবে দেখা যেতে পারে- কোনো কাজ সম্পন্ন করতে কতটা সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেটা সম্পন্ন হতে কতটা সময় লেগেছে আর উৎপাদনে কতটা সময় বাঁচানো গিয়েছে। বোনাস দেবার ব্যবস্থা রাখলে কতটা সময় বাঁচানো হয়েছে সেই হিসেবে বোনাস দিতে হবে। বোনাস ব্যবস্থায় এটাই হবে বৈষয়িক প্রণোদনা (incentive)।

ফুরণ কাজ (piece work) ব্যবস্থায় বৈষয়িক প্রণোদনা (incentive) অন্যভাবে হিসেব করা হয়। ধরা যাক্ আমরা একটা যন্ত্র তৈরী করছি। শ্রম ইত্যাদি উৎপাদন খরচ নির্দিষ্ট আছে। সুতরাং এর বাজার দর হবে নির্দিষ্ট উৎপাদন খরচ ও তৎসহ যুক্ত ন্যায্য লাভ। P = C + Y। ন্যায্য লভ্যাংশ 15% শতাংশ। এই অর্থমূল্য বা এর একটা অংশ যেসব শ্রমিক যন্ত্রটি বানিয়েছে তাদের দিতে হবে। এটা হবে তাদের প্রণোদনা (incentive)। যেহেতু তারা প্রণোদনা পায় সেই জন্যে তারা আরও যন্ত্র তৈরী করার চেষ্টা করবে। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে এই ব্যবস্থা থাকে না। কারণ সেখানে শ্রমিকেরা নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎসাহ ভাতা বা প্রণোদনা পায় যা তাদের মজুরীর একটা অংশ মাত্র। বৈষয়িক প্রণোদনা (incentive) আরও বেশি কাজ, আরও ভালো কাজের জন্যে দেওয়া দরকার। তাই সেটাকে সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। যখন এই ব্যবস্থা গৃহীত হবে তখন শ্রমিকদের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান স্বতই বেড়ে যাবে। এই ভাবেই ফুরণ কাজে incentive দেওয়া উচিত। 1

প্রশ্ন–১৫ আমরা কি রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেবার দাবী সমর্থন করব? আমাদের নীতি কী?

উত্তর: আমরা অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ সমর্থন করি। সুতরাং অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের সম্বন্ধিত ক্ষমতা রাজ্যের হাতে থাকা দরকার বা নিম্নস্থ সরকারের হাতে থাকা দরকার। তা না হলে বিকেন্দ্রীকরণের জন্যে যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয়েছে সেটা তারা কীভাবে বাস্তবায়িত করবে?

প্রশ্ন–১৬ মানব সভ্যতার ইতিহাস হচ্ছে সামূহিক মনস্তত্বের ইতিহাস। আমরা সামূহিক মনস্তত্বকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব?

উত্তর: অনুমানসের গতিধারা থেকে আহৃত গড় মানস গতিধারাই হচ্ছে সামূহিক মনস্তাত্বিক গতিধারা যার অভিপ্রকাশ নোতুন নোতুন ঘটনা হিসেবে ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।

পূর্বার্দ্র তত্ত্ব

পশ্চিমবঙ্গ, বাঙলাদেশ, ত্রিপুরা ও অসম সমন্বিত ভারতের পূর্বাঞ্চলের এই বিশাল ভূভাগটি জলবায়ুর দিক থেকেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সমগ্র অঞ্চলের জলবায়ুই উষ্ণ ও আর্দ্র। সমুদ্র কাছাকাছি বলে শীত-গ্রীষ্মও ততটা প্রখর নয়। তথাপি এর পশ্চিম অংশের সঙ্গে পূর্বাংশের জলবায়ু-গত কিছুটা পার্থক্য আছে। পশ্চিমাংশের সমভূমিতে গ্রীষ্মে ১২০০ ফারেনহাইট পর্যন্ত উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় আবার শীতকালে উষ্ণতা ৫৫০ ফারেনহাইটে নেমে আসে। কিন্তু পূর্বাংশে অর্থাৎ ত্রিপুরা-অসমে জলবায়ু অপেক্ষাকৃত সিক্ত ও আর্দ্র। পশ্চিমের রাঢ় অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যেখানে গড়ে ৫০-৫৫" সেখানে পূর্বাঞ্চলের অসম-মেঘালয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ৫০৮”। উত্তরে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২০ ইঞ্চি। দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে গড়ে বৃষ্টিপাত হয় ১০০ ইঞ্চি। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পশ্চিমে বেঁকে অসম, ত্রিপুরা, বাঙলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় ও বিহার

প্রদেশের ওপর দিয়ে বৃষ্টিপাত করতে করতে আরও পশ্চিমে অগ্রসর হয়। কিন্তু যতই পশ্চিমে অগ্রসর হতে থাকে ততই এতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কমতে থাকে। বায়ু ক্রমশঃই শুষ্ক হতে থাকে।

ভৌগোলিক পরিবেশ-পরিমণ্ডল স্থানীয় অধিবাসীর পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য সামগ্রী, আচার-আচরণকে বিপুলভাবে' নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে। এমনকি স্থানীয় জলবায়ুই-তার অধিবাসীর ভাবনাচিন্তা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় দেখা গেছে আর্দ্র- জলবায়ুর অধিবাসীরা যে পরিমাণে কর্মপটু তার চেয়ে অনেক বেশী কর্মপটু শুষ্ক অঞ্চলের অধিবাসীরা। জলবায়ুর আর্দ্রতা ও উষ্ণতা একযোগে স্থানীয় অধিবাসীর কর্মক্ষমতাকে কমিয়ে ফেলে, আলস্যে অভিভূত করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী দেখা গেছে পূর্বাঞ্চল থেকে যতই পশ্চিমে অগ্রসর হওয়া যায় ও আর্দ্রতা যতই কমতে থাকে ততই মানুষ কর্মঠ হয় ও কর্মপটুতা লাভ করে। শুষ্ক জলবায়ু মানুষের কর্মশক্তিকে বৃদ্ধি করে। এই কারণে ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত অধিবাসীদের তুলনায় পশ্চিমের অধিবাসীদের কর্মপটুতা অনেক

বেশী। ভারতরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত পঞ্জাব ও সর্ব পূর্বে অবস্থিত অসম। এই দুই অঞ্চলের জলবায়ুতে আর্দ্রতা ও শুষ্কতার হিসেব করলে দেখা যাবে উভয়ের জলবায়ুর মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান। এই ব্যবধান উভয় অঞ্চলে অধিবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ শুধু নয়, খাদ্যদ্রব্য ও চারিত্রিকতাতেও বিরাট পার্থক্য এনে দিয়েছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পাঞ্জাবীরা সবচেয়ে শুষ্ক জলবায়ুর দেশে বাস করে বলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের চেয়ে তারা অনেক বেশী কর্মক্ষম ও নিরলস। অন্যদিকে ভারতের সর্বাপেক্ষা পূর্ব-প্রান্তের অধিবাসী হিসেবে সর্বাপেক্ষা আর্দ্র ও ভিজা অঞ্চলের অধিবাসী বলে অসমীয়ারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীর চেয়ে অনেক পরিমাণে কম কর্মক্ষম ও তুলনায় অতিরিক্ত আলস্যপরায়ণ। তাই পাঞ্জাবের অধিবাসীর পক্ষে ভারতের যে-কোনো স্থানে স্থায়ী বাসিন্দা হবার পক্ষে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীর পক্ষে পশ্চিমে পাড়ি জমিয়ে পশ্চিমের অধিকতর শুষ্ক জলবায়ুতে পরিশ্রম করা তার পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এই কারণে পাঞ্জাবীরা ভারতের যে-কোন প্রান্তে বসবাস করতে অসুবিধা বোধ করে

না, কিন্তু পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী পশ্চিমের শুষ্ক অঞ্চলে বাস করেতে ও কঠোর পরিশ্রম করতে অসুবিধায় পড়ে। পূর্বের অধিবাসী পশ্চিমের অধিক পরিশ্রমী মানুষদের মত সেইসব স্থানের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না বা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না।

এই কারণেই পূর্বৰঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু যারা দেশবিভাগের পরে ভারতে বসবাস শুরু করে, মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণ্যে গিয়ে সেখানকার গরম ও শুষ্ক আবহাওয়া তেমনভাবে মানিয়ে নিতে পারেনি। অবশ্য তাদের এই মানিয়ে না নিতে পারার পিছনে অন্য অর্থনৈতিক কারণও বিদ্যমান, কেন না তাদের সেখানে প্রাণধারণ করার যথেষ্ট ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি। তুলনামূলকভাবে এই পূর্বৰঙ্গে র উদ্বাস্তু যারা অসম, মেঘালয় ও আন্দামানে বাস করতে শুরু করেছিল, তারা সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে সহজেই খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। এর প্রধান কারণ এইসব স্থানের উদ্বাস্তুরা স্থানীয় জলবায়ুর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ মানিয়ে নিতে পেরেছিল। দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের আজও ভাসমান জনসমুদায় বলে মনে করা হয়, অন্যদিকে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যেমন অসম, মেঘালয়,

মিজোরাম, ত্রিপুরা আর মণিপুর-উদ্বাস্তুরা সেখানকার স্থায়ী অধিবাসী। তারা অনেক স্থানেই ঝোপঝাড় আগাছা কেটে সাফ করে, গ্রাম তৈরী করে স্থায়ী জীবিকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তাই পূর্বার্দ্র নীতি উদ্বাস্তু সমস্যার স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত সমাধান দিয়েছে, কেননা এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ স্থানীয় জলবায়ু ও অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নিতে পারে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু যারা পূর্ব ভারতে স্থায়ীভাবে বাস করছে, তারা এইজন্যে তাদের কর্মসামর্থ্যকে কাজে লাগাতে পেরেছে, আর তাই তারা স্থায়ী বাসগৃহ, জমিজমা তৈরী করে নিয়েছে। তারা পূর্বভারতে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে নিজেদের আর্থিক ভাগ্যকে একাত্ম করতে পেরেছে। আজ তাদের উৎখাত করার চিন্তা করাও অসম্ভব ও অমানবিক।

দেশ বিভাগের সময় কংগ্রেস নেতারা জোর গলায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা ভারতের যে-কোনো প্রান্তে ইচ্ছামত বাস করতে পারে। সেই মানুষেরা সেই প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করেছিল আর তাই ৰঙ্গ বিভাজনও মেনে নিয়েছিল। বর্তমানে অসমে পূর্বৰঙ্গ থেকে আগত মানুষদের সেখান থেকে বিতাড়িত করার জন্যে আন্দোলন চলছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করা আর আন্দোলনকারীদের সংযত করা, যাতে অসমে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের সর্ববিধ কল্যাণ সুনিশ্চিত হয়। যেমন উদ্বাস্তুরা নদীয়া ও চবিবশ পরগণা জেলায় এসেছিল তাদের অধিকাংশই সেখানকার স্থায়ী অধিবাসী হয়ে গেছে। তারা তাদের শারীরিক-মানসিক সামর্থ্যকে কাজে লাগাতে কোনো অসুবিধাই ৰোধ করেনি, কেননা তারা প্রায় একই রকমের ভৌগোলিক- আর্থিক-মানসিক অঞ্চলের অধিবাসী আর স্থানীয় আবহাওয়া ও পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত। অবশ্য উদ্বাস্তুদের কিছু অংশ যারা চবিবশ পরগণা জেলায় বসতি স্থাপন করেছেন, তারা এখনও সেখানে প্রায় ভাসমান জনসমুদায়। কেননা সেখানে তাদের জীবনধারণের উপযোগী উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি।

ভাসমান জনগোষ্ঠীর একটি মানসিক অসুবিধা হচ্ছে এই যে, তারা নূতন স্থানকে নিজস্ব বলে সহজে মনে করতে পারে না, তাই তারা ফেলে আসা জমিজমা, বাড়িঘরের কথা ভুলতে পারে না। এই কারণেই স্থানীয় অধিবাসীদের মত তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক সংহতি ৰোধ তৈরী হতে দেরী হয়।

১৯৮১, কলিকাতা

আয়ারল্যান্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট–উচ্চকক্ষ অর্থাৎ হাউস অব লর্ডস্ আর নিম্নকক্ষ অর্থাৎ হাউস অব কমন্স সহ–তার অবস্থান গ্রেট ব্রিটেন–এর রাজধানী লন্ডন শহরে। যখন ইংরেজী ব্রিটেনের রাষ্ট্রভাষা হ'ল তখন ওয়েলশ্ আর স্কটিশ ভাষা তাদের স্বীকৃতি হারাল। বর্তমানে অনেক আন্দোলনের ফলে ওয়েম্ ভাষা প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পড়ানো হয়, আর স্কটিশ ভাষা এখনও পর্যন্ত স্বীকৃতি পায়নি। এর অর্থ স্কটিশ ও ওয়েম্ অঞ্চলের মানুষেরা ইংরেজীতে পড়াশুনা করতে বাধ্য হয়, যদিও ইংরেজী তাদের স্বাভাবিক ভাষা বা মাতৃভাষা নয়।

সূচীপত্র

এখন, আইরিশ সাগরের অন্য প্রান্তে আয়ারল্যান্ড দ্বীপ অবস্থিত। ওয়াশ্,ে স্কটল্যান্ড আর আয়ারল্যান্ড ইংরেজ এই তিনটি দেশকে অধিকার করে গ্রেট ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্ত করে নিল। দেশের জাতীয় সঙ্গীত হ'ল–"ব্রিটানিয়ার শাসন, সমুদ্রব্যাপী যার অধিকার, এই সেই ব্রিটানিয়ার শাসন" ("Rule of Britain, rule over the sea, rule Britannia....")। এই অধিকৃত দ্বীপে আইরিশ জনসাধারণ ব্রিটেনের শাসন মেনে নিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিল, তাই তারা স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে দিল।

প্রায় চল্লিশ–পঞ্চাশ বছর আগে আইরিশরা তাদের সংগ্রামে সফলতা অর্জন করল। আয়ারল্যান্ডের এক মেয়ের বিবাহ হয়েছিল স্পেন দেশের একটি ছেলের সঙ্গে। মেয়েটি প্রচুর পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারিণী ছিল, তাই স্পেনে নিজের স্বামীর দেশে সে গেল না, বরং তার স্বামীই আয়ারল্যান্ডে এসে বসবাস শুরু করল। সেই স্পেনিশ ভদ্রলোকটির নাম ছিল ভ্যালেরা আর তাদের একটি সন্তান ছিল। মাতা আইরিশ আর পিতা স্পেনিশ কিন্তু ছেলেটির জন্ম যেহেতু আয়ারল্যাণ্ডেই, তাই

তার মনে আয়রিশ দেশটার প্রতি গভীর ভালবাসা ও ভাবপ্রবণতা তৈরী হয়েছিল। আয়ারল্যান্ডকে বিট্রিশ শাসন থেকে মুক্ত করার জন্যে ছেলেটি স্বাধীনতার যুদ্ধে নেতৃত্ব দিল। তার নাম ছিল মিঃ ডি, ভ্যালেরা, যিনি আয়ারল্যান্ডের মহানায়ক। বিশ বছর ধরে অবিরাম যুদ্ধ চলার পরে ব্রিটেন আয়ারল্যান্ডের স্বতন্ত্রতা মেনে নিল।

আয়ারল্যান্ড যখন গ্রেট ব্রিটেনের অঙ্গীভূত হয়েছিল তখন দেশটার নাম পরিবর্তিত হ'ল গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড। এর সংক্ষিপ্ত রূপ U.K. (United Kingdoms of Britain and Ireland), রাজধানী লন্ডন। সব মিলে দেশটার সম্পূর্ণ নাম হয়েছিল ইংল্যান্ড, ওয়ালেশ, স্কটল্যান্ড আর আয়ারল্যান্ডের সংযুক্ত রাষ্ট্র (United Kingdoms of England, Wales, Scotland and Ireland)।

যদিও ব্রিটেন আয়ারল্যান্ড দেশের স্বাধীন সত্তা মেনে নিয়েছিল কিন্তু ব্রিটিশরা সেখান "বিভাজন করে দাও, আর শাসন কর" ("Divide and rule") এই নীতি অনুসরণ করল। ষাট বছরেরও অধিক সময় ধরে অবিরাম স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে ব্রিটেন ভারতের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছিল কিন্তু দেশ

ছেড়ে যাবার আগে ব্রিটেন, ভারতকে ভারত ও পাকিস্তান এই দুই দেশে বিভক্ত করে দিয়েছিল। আয়ারল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার হয়েছিল। ব্রিটিশরা যখন ডি, ভ্যালেরাকে শাসন হস্তান্তর করল তখন তারা আয়ারল্যান্ড দেশকে ভেঙ্গে উত্তর আয়ারল্যান্ড আর দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিল। ইংল্যান্ড থেকে অনেক লোক এসে আয়ারল্যান্ড দেশটির উত্তর প্রত্যন্ত অংশে বসতি স্থাপন করল। ঠিক এরকম ভাবেই চীনদেশীরা তিব্বতে অনেক মানুষ পাঠিয়েছিল সেখানে বসবাস করার জন্যে। উদ্দেশ্য ছিল তিব্বতে যাতে চীনা অধিবাসীর সংখ্যা তিব্বতের অধিবাসীদের চেয়ে বেশী হয়, আর শেষ পর্যন্ত যাতে তিব্বত চীনের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। যখন মাঞ্চুরিয়া জাপান অধিকার করল তার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল মাঞ্চু-কুও, আর এর সঙ্গে অনেক জাপানী সেখানে এসে বসবাস শুরু করল, যাতে মাঞ্চুরিয়াবাসীদের থেকে বিদেশীদের সংখ্যা বেশী হয়। আয়ারল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা ঘটেছিল। ইংল্যান্ড পরিকল্পনামাফিক আয়ারল্যান্ড দেশের উত্তর কোণে অনেক ইংরেজ মানুষদের পাঠিয়ে সেখানে বসতি স্থাপন করাল।

অঙ্গদেশে ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলায় অনেক ভোজপুরীভাষী এসে বসবাস শুরু করেছিল, আর তার ফলস্বরূপ আজ ভোজপুরীভাষীদের সংখ্যা অঙ্গিকদের থেকে অনেক বেশী হওয়ার সুযোগ রয়ে গেছে। মগধের জামুই মহকুমায় অনেক ভোজপুরীভাষী এসে বসবাস শুরু করেছিল, আর তার ফলস্বরূপ আজ ভোজপুরীভাষীদের সংখ্যা মগহীদের থেকে অনেক বেশী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিহার আর ছোর অঞ্চলের মনিরামপুর থানায় আরা অঞ্চল থেকে অনেক ভোজপুরী আসতে থাকায় তাদের সংখ্যা মগহীদের থেকে অনেক বেশী হয়ে যাবে, ও একদিন সেই অঞ্চল তাদেরই বলে তারা দাবী করবে।

আয়ারল্যান্ডের অবস্থাটাও ঠিক সেই রকমই। ব্রিটেনের উস্কানিতে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে ইংরেজরা এক আন্দোলন শুরু করেছিল, আর তাদের দাবী ছিল, "আমরা গ্রেট ব্রিটেন আর সংযুক্ত রাষ্ট্রেই (United Kingdoms) থাকতে চাই, আয়ারল্যান্ড আর ডি, ভ্যালেরার অধীনে নয়"। এইভাবে ব্রিটিশদের "বিভাজিত করে দাও আর শাসন কর", এই নীতি অনুযায়ী আয়ারল্যান্ড দেশটাকে আগেই উত্তর আয়ারল্যান্ডআর দক্ষিণ

আয়ারল্যান্ডে বিভক্ত করে দেয়। উত্তর আয়ারল্যান্ড সমগ্র অঞ্চলের মাত্র এক পঞ্চমাংশ আর দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড প্রায় চার পঞ্চমাংশ। আজ আইরিশ আইন অনুযায়ী উত্তর আয়ারল্যান্ড গ্রেট ব্রিটেনের অঙ্গীভূত হয়ে আছে। অর্থাৎ ঠিক বর্তমানে United Kingdoms of England, Wales, Scotland and Northern Ireland, যার অর্থ ইংল্যান্ড, ওয়াশে, স্কটল্যান্ড আর উত্তর আয়ারল্যান্ডের সংযুক্ত রাষ্ট্র, আর দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড এক সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ।

আয়ারল্যান্ড ভ্যাপসা গরমের দেশ, দেশটার আকৃতি গামলার মত অর্থাৎ সীমা উঁচুতে আর দেশটার মাঝের অংশ নিচুতে। প্রধান ফসল আলু, তাই আলুই এদের প্রধান খাদ্য। সেখানকার মানুষের আলু, মিষ্টি আলু, পরিজ, কাস্টার্ড ইত্যাদি তাদের খাদ্য। কিন্তু দেশটি শিল্পোন্নত তো নয়ই, আবার কৃষিতেও খুব বেশী উন্নত নয়। আমি আগেই বলেছি কীভাবে এই দেশটি বিখণ্ডিত করা হয়েছে, তাই আজ আয়ারল্যান্ড একটা অখণ্ড দেশ নয়।

উত্তর আয়ারল্যান্ড যা গ্রেট ব্রিটেনের অংশ, যাকে উলষ্টারও বলা হয়, তার রাজধানী বেলফাষ্ট। দক্ষিণ

আয়ারল্যান্ড অর্থাৎ আইরিশদের মুক্ত রাষ্ট্র, তার রাজধানি ডাবলিন। ইংরেজরা ডাবলিনের উচ্চারণ করে ডুব্-লিন। দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট মিঃ ডি. ভ্যালেরার মৃত্যুর পরে একজন নুতন প্রেসিডেন্ট স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। আইরিশ মানুষেরা ব্রিটিশ বা ইংরেজদের মোটেই ভাল চোখে দেখে না। বিখ্যাত সাহিত্যিক জর্জ বার্নার্ড শ' এখানকারই মানুষ।

তাহলে আমি তোমাদের আয়ারল্যান্ড, উলষ্টার, আইরিশ মুক্ত রাষ্ট্র বা এই সবের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিলুম। আইরিশ মুক্ত রাষ্ট্রের ভাষা এখনও আইরিশ কিন্তু আইরিশ ভাষা উন্নত নয়। ইংরেজী শিক্ষা তথা সেই ভাষায় পঠনপাঠন এই দেশের সর্বত্র হয়। তাই সরকারি ভাষাও ইংরেজী কিন্তু এ দেশের সরকার আইরিশ ভাষাকে উন্নত করবার খুবই চেষ্টা করছেন।

২২ মার্চ ১৯৮৮, কলিকাতা

ৰাঙলাদেশৰ কতকগুলি উন্নয়নমূলক পৰিকল্পনা

ৰাঙলাদেশ এক অত্যন্ত দৰিদ্ৰ দেশ। আন্তর্জাতিক বাজাৰে কাঁচা চামড়া ও কাঁচাপাট বিক্রয় কৰে। আসলে এৰ কোনো ধাতব খনিজ নেই, আছে কিছু পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসেৰ মত অধাতব খনিজ। তাই এই সামান্য কিছু সম্পদ নিয়ে ৰাঙলাদেশ আজ একটা অনুন্নত ও উদ্বৃত্ত দেশ। এৰকম দেশেৰ পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিনিময় পদ্ধতিতে ব্যবসায়ই সবচেয়ে সেৰা।

ৰাঙলাদেশ যদি কাঁচাপাট ও কাঁচা চামড়াৰ পৰিবর্তে এই পাট ও চামড়া থেকে উৎপন্ন পণ্য তৈৰী কৰতো, তা'হলে সে কি বিশেষ লাভবান হ'তো? ঠিক্ ঠিক্ ভাবে পাটশিল্প গড়তে প্রচুর মূলধনেৰ প্রয়োজন হয়। আজ যখন নানা ধৰনেৰ কৃত্রিম সুতা পাটেৰ স্থান দখল কৰছে, তখন কি পাটশিল্পে এৰকম বিপুল পৰিমাণ অর্থ বিনিয়োগ কৰা যুক্তিসম্মত হবে? এ ছাড়া

নানা ধরনের কৃত্রিম চামড়া আজকাল পাওয়া যাচ্ছে আর এই কৃত্রিম চামড়া সাধারণ চামড়া থেকে অনেকগুণ বেশী স্থায়ী। তাই আজ পাটের জায়গায় আসছে কৃত্রিম সূতা আর চামড়ার জায়গায় আসছে কৃত্রিম চামড়া, এভাবেই কৃত্রিম দ্রব্য পাট ও চামড়ার স্থান দখল করে নিচ্ছে।

ভারতের অভিজ্ঞতা বলে, পাট-শিল্প একটি রুগ্ন শিল্প। কারণ এ শিল্প কৃত্রিম সুতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারছে না। আজ ভারতের অনেক পাটচাষীই পাট-চাষ বন্ধ করে দিয়েছে। তাই পাটশিল্পের মালিকরা কাঁচা পাটের জোগানও পাচ্ছে না। পাট-শিল্পের চাহিদা মেটাতে ভারত সরকার উত্তর প্রদেশ, বিহার, অসম রাজ্যের পাট-চাষীদের পাট-চাষে-উৎসাহ দেওয়ার জন্যে ভরতুকি দিচ্ছে। কিন্তু এইভাবে ভারত-সরকার কতদিন ভরতুকি দিয়ে পাট-শিল্প চালাবে? এটা নিশ্চিত, অনন্তকাল ধরে সরকার এভাবে ভরতুকী দিয়ে চলতে পারে না।

তাইল্যান্ডও পাট উৎপাদন করে। তাই ৰাঙলাদেশ যদি কাঁচাপাট উৎপাদন করতে থাকে তাহলে তাকে তাইল্যান্ডের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। তাইল্যান্ডের পাট বাঙলাদেশের পাটের

তুলনায় উৎকৃষ্ট। তা ছাড়া তাইল্যান্ড যদিও কৃষিভিত্তিক দেশ, তবুও মোটামুটি উন্নত দেশ, অনুন্নত নয়। তাই তাইল্যান্ড যদি আজ পাটের বাজার হারায়, তবে সে পাটের পরিবর্তে অন্য কোনো পণ্যের উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু বাঙলাদেশকে যদি পাটের বাজার হারাতে হয়, তবে তার কাছে পাটের কোনো বিকল্প নেই, কারণ এটা একটা অনুন্নত দেশ।

পূর্বে ব্রিটিশরা ভারতের কাঁচাপাট স্কল্যান্ডের ডাণ্ডিতে নিয়ে গিয়ে পাটজাত পণ্য তৈরী করতো। সে সময় ভারতে কোনো পাটকল ছিল না। ভারত ছাড়বার পর ব্রিটিশদের ডাণ্ডির পাটশিল্পের জন্যে কাঁচাপাট জোগান দেওয়া দুস্কর হয়ে পড়ল কারণ ভারত তখন তার নিজের পাট-কল তৈরী করে নিয়েছে। তাই ব্রিটিশরা অনেক কাট-খড় পুড়িয়ে পাট-শিল্প কারখানাগুলোকে অন্য পণ্য উৎপাদনের কারখানায় রূপান্তরিত করে দিল। একইভাবে ম্যাঞ্চেষ্টার ভারতীয় কাঁচা তুলা থেকে সুতি কাপড় তৈরী করত। ভারতের স্বাধীনতার পর ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের কলগুলো চালু রাখার ক্ষেত্রে একই ভাবে ভারত থেকে কাঁচা তুলার যোগান পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ল।

আরও একটা উদাহরণ দেখা যাক্। পূর্বে ভারত নীল রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করত। পশ্চিম জার্মানীতে যখন কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হ'ল তখন থেকেই ভারতের নীল রপ্তানী বন্ধ হয়ে গেল। কারণ ভারতের নীলের বাজার তখন আর থাকল না। আজ নীল গাছ ভারতের পথে-ঘাটে জন্মায়। কিন্তু এগুলোর সম্পর্কে আজ আর কেউই মাথা ঘামায় না। এভাবে ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় যে বাইরের কোনো দেশের কাঁচামাল সরবরাহের ওপর নির্ভর করে কোনো শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে কোনো দেশকেই মোটা অঙ্কের মূলধন বিনিয়োগ করা ঠিক নয়।

অবশ্য বর্তমানের জাপান এ ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম। তবুও যেসব দেশ জাপানকে তাদের কাঁচামাল সরবরাহ করে সেইসব দেশের মানুষ আজ যদি রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন হয় ও ওইসব কাঁচামালকে ভিত্তি করে নিজের নিজের দেশে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলে, তখন জাপানকেও অসুবিধায় পড়তে হবে বৈকি। উদাহরণস্বরূপ, ওড়িষ্যার পারাদ্বীপ বন্দর প্রচুর পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ ও লৌহ খনিজ জাপানকে সরবরাহ করে। যদি এ অঞ্চলের গরিব মানুষের রাজনৈতিক দিক থেকে

সচেতন হয় ও তাদের নিজেদের শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার দাবী করে, তখন জাপানে এই কাঁচামাল রপ্তানী বন্ধ হয়ে যাবে।

জাপান তাদের ইস্পাত কারখানাগুলোকে জোগান দিতে, বাইরের দেশ থেকে বাতিল ভাঙাচুরা লোহা কেনে। যখনই সম্ভব হয়, জাপানীরা ইস্পাতের বিকল্প ব্যবহার করে ইস্পাতের উপযোগকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে,

ট্রেনের বগিতে তারা সাধারণভাবে কোনো ইস্পাতই ব্যবহার করে না। অথচ তাদের ট্রেন আজ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী। রেঙ্গুনে ভাঙ্গাচোরা বাতিল লোহার বিরাট একটা ইয়ার্ড রয়েছে, সেখান থেকে জাপানে এ জিনিস রপ্তানী হয়। পারাদ্বীপ জাপানকে কয়লাও রপ্তানী করে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল, জাপান বাইরে থেকে এই সব কাঁচামাল আমদানী করা সত্ত্বেও সে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সস্তায় ইস্পাত উৎপন্ন করে। মোটের ওপর জাপান একটা ব্যতিক্রম, কারণ এটা একটা উন্নত ও কারিগরী বিদ্যায় বিশেষ অগ্রগামী দেশ।

ওড়িষ্যা ভারতের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলির মধ্যে একটা। দেশের নির্বোধ নেতারা দেশের লৌহ খনিজ ও কয়লা

রপ্তানী করে চলেছে। এর পরিবর্তে তাদের উচিত ওড়িষ্যার হীরাকুঁদে ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা ধরনের শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা। এখন পর্যন্তও দেশের অবস্থাটা এমন জায়গায় পৌছায়নি যে যেখান থেকে ফেরবার আর পথ নেই। ভারতের পক্ষে তার নিজস্ব কাঁচামালের ওপর ভিত্তি করে নিজের শিল্প কারখানা গড়ে তোলার সময় এখনও আছে।

মনে কর, ৰাঙলাদেশ পাট উৎপাদন বন্ধ করে, ধান উৎপাদন বাড়িয়ে দিল তখন কী হবে? তখন খাদ্যের দিক থেকে ৰাঙলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। কিন্তু বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের জন্যে অন্য কোনো কাঁচামাল না থাকায়, দেশ উন্নতি করতে পারবে না। ব্যবসায়িক আদান-প্রদান ছাড়া কোনো দেশই উন্নত হতে পারে না। যদি বাণিজ্যিক যোগাযোগই না থাকে তবে ৰাঙলাদেশ কেমন করে শুকনো লঙ্কা, ডাল, তৈলৰীজের মত নেহাতই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পাবে? এই সব জিনিসই এখন ভারত থেকে যাচ্ছে। ৰাঙলাদেশ আজ এইসব জরুরী সমস্যার সম্মুখীন।

তাহলে বাঙলাদেশের বাঁচবার পথ কী? কেউ কেউ বলেন যে পাটকে কৃত্রিম সুতা ও উলের সঙ্গে মিশিয়ে অর্ধ-পাট-শিল্প

গড়ে তোলা। পাটগাছের কাণ্ডের রস থেকে উৎকৃষ্ট ধরনের না হলেও আজ সাধারণ নাইলন প্রস্তুত করবার পরামর্শও কেউ কেউ দেন। এসব চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল কথা যা বলা যায়, তা হল, এ সব মন্দের ভাল।

পাট-চাষের সময় হ'ল শীতের শেষ থেকে বর্ষার শেষ পর্যন্ত। যদি পাটের বদলে কিছু করতে হয়, তবে দেখতে হবে এই সময়ে জন্মায় এরকম অন্য কোনো শস্য পাওয়া যায় কি না। কেবলমাত্র তিল তৈলবীজ লাগানো যেতে পারে। রেড়ি তৈলৰীজ লাগানো যায় না, কারণ রেড়ি বর্ষা ঋতুর ফসল নয়, এটা শীতের ফসল। বৈজ্ঞানিক কৌশলে বা পদ্ধতিতে যদি বর্ষা ও গ্রীষ্মের ঋতুতে ব্যাপক পরিমাণে রেড়ি চাষ করার কোনোরকম পথ খুঁজে পাওয়া যায়, সেটা বাঙলাদেশের পক্ষে প্রভূত উপকারের ব্যাপার হবে। কারণ রেড়িবীজের লুব্রিটেন্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। (লুব্রিটেন্ট হিসেবে) আর গাড় তেল তৈরী করার জন্যে এটাকে ঘন করা যেত পারে সহজে। কিন্তু এটা একটা অন্য সমাধান নয়- এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী সমাধান। এক্ষুনি যেহেতু পাটের কোনো

বিকল্প পাওয়া যাচ্ছে না, তাই এক্ষুনি পাট-চাষ বন্ধ করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

স্বাধীনতার পরে পরেই পাট ছিল রাজ্যের আওতায়। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরই দায়িত্ব ছিল পাটশিল্পের উন্নতি করবার। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় পাটকে কেন্দ্রের বিষয় করার জন্যে কেন্দ্রকে চাপ দেন। কারণ সেদিন তিনি বুঝেছিলেন ভবিষ্যতে পাটশিল্প নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হবে। যাই হোক, সেদিন কম্যুনিষ্টরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাটকে কেন্দ্রের আওতাতেই নিয়ে আসা হয়। আজ কেন্দ্রীয় সরকারও পাটশিল্পকে সুস্থ করে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনমত ভরতুকি দিয়ে উঠতে পারছে না। এই পাট যদি আজ রাজ্যের আওতায় থাকত, পাটশিল্প রাজ্যের পক্ষে কত বড় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো?

বাঙলাদেশ আজ যে সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন, তার সমাধানের জন্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও যথাযথ উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণের ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু এ সবই স্থানীয় কাঁচামালের জোগানের ওপর নির্ভর করেই করতে হবে। কোনো স্থানের যথাযথ পরিকল্পনার জন্যে ওই স্থান সম্পর্কে

সবিশেষ জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে। পরিকল্পনার স্থান থেকে দূরে বসে থেকে, কোনোকিছু না জেনেশুনেই পরিকল্পনা করতে বসে যাওয়া ঠিক নয়।

বাঙলাদেশের পক্ষে কোন্ ধরনের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত? কেউ কেউ ঢাকা জেলায় ব্যাপক নারকেল শিল্প চালু করার পরামর্শ দেন। ডাকা (ঢাকা) জেলার মাটি খুবই উর্বর, কিন্তু এতে লবণের ভাগ কম। ভাল রকমের নারকেল উৎপাদনের পক্ষে একটা ভাল ক্ষেত্র নয়। বরং তালগাছ এখানে খুব ভাল জন্মায়। নারকেল শিল্প ৰাঙলাদেশের নোয়াখালী জেলায় গড়ে তোলা যায়। নারকেলের খোলা ও ছোব্বা থেকে প্লাস্টিক তৈরী করা যায়। ময়মনসিংহ জেলাও নারকেল চাষের পক্ষে উপযুক্ত নয়, তবে এখানে বড় জাতের নারকেল জন্মায়। নারকেল সবচেয়ে ভাল জন্মায় যশোর জেলায়। এই যশোর জেলার সঙ্গে ভারতের যেসব জেলা যুক্ত যেমন নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, এখানেও লাভজনকভাবে নারকেল শিল্প গড়ে তোলা যায়। আর এই সঙ্গে এই সকল স্থানে প্লাস্টিক শিল্পও গড়ে উঠতে পারে।

বাঙলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কী কী রয়েছে? বাঙলাদেশে খনিজ সম্পদ খুব কমই আছে ও তাই এখানে লৌহ ভিত্তিক (ferous) শিল্প গড়ে তোলার কোনো সুযোগ নেই। তাই গোটা অর্থনীতিটাই অ-খনিজ সম্পদ ভিত্তিক পরিকল্পনার ওপর গড়ে তুলতে হবে। তবুও কিছু কিছু নন্-ফেরাস্ বা লৌহবিহীন শিল্প গড়ে উঠতে পারে। কারণ বাঙলাদেশে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের জোগান রয়েছে।

যে-কোনো শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার আগে পরিকল্পনাকারীদের সর্বপ্রথমেই যথেষ্ঠ পরিমাণ শক্তি সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। ৰাঙলাদেশে জল- বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা নেই। কারণ এখানকার নদীগুলি বদ্বীপীয় স্তরের। জলবিদ্যুৎ সেখানেই সম্ভব, যেখানে নদীগুলি পার্বত্য স্তরের, নদীর স্রোতে প্রচণ্ড বেগ থাকে। ৰাঙলাদেশে দু'ধরনের বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যেতে পারে- এক, মহাসাগরীয় জোয়ারভাটা থেকে; দুই, সৌরশক্তি থেকে। নোয়াখালী জেলার বাখরগঞ্জ মহকুমায়, যেখানে মেঘনা নদী সাগরে গিয়ে পড়েছে, আর ব্রিটিশ ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমায় যেখানে ডাকাতোয়া নদী সাগরে পড়ছে-এ দু'জায়গায় মহাসাগরীয়

জোয়ারভাটাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এই নদীগুলি যেখানে সাগরে গিয়ে পড়ছে, সেখানে এই নদীগুলির প্রভাবে বিস্তর উত্তাল ঢেউ তৈরী হচ্ছে। এইসব স্থানে কাজে লাগানোর পক্ষে এই ধরনের জোয়ারভাটা থেকে উৎপন্ন শক্তি বেশ সস্তা পড়বে।

সৌরশক্তিও কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু শক্তির এই উৎসটাকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থার এখন পর্যন্ত উন্নতি হয় নি। ভবিষ্যতে এর গুরুত্ব উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকবে।

তাপবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের তেমন সুযোগ এখানে নেই। ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলায় এক ধরনের কয়লা পাওয়া যায় যা পুরোপুরি রূপান্তরিত হয়নি। এই কয়লার হয়তো আরো আট থেকে দশ লক্ষ বছর লাগবে পুরোপুরি উৎকৃষ্ট মানের কয়লায় রূপান্তরিত হতে। সে সময় মানুষই পৃথিবীতে থাকবে না। যদি কেউ বাইরে থেকে কয়লা আমদানী করে তাপীয় শক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনা করে, তবে সেটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

জৈব-গ্যাস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা যেতে পারে। জৈব গ্যাসের এই উৎপাদন বাড়িয়ে বাঙলাদেশের জৈব-সারের যে

চিরন্তন সমস্যা আছে তারও সমাধান করা যেতে পারে। জৈব-গ্যাস প্রকল্প থেকে উৎপন্ন সার এক উৎকৃষ্ট ধরনের প্রাকৃতিক জৈব-সার, যা মাটির উর্বরা-শক্তি-যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। এই সার, বিশেষ করে সব্জী বা তরিতরকারী, ডাল, কাঁটাল উৎপাদনের পক্ষে উৎকৃষ্ট।

বাগিচা-চাষও বিশেষভাবে বাড়িয়ে তুলতে হবে। তবে এখানকার মাটি মটর, সর্ষে, অড়হর ডাল বা আমের পক্ষে সুবিধার নয়। আম বড় বড় হয় বটে কিন্তু প্রচুর-বৃষ্টিপাতের ফলে সহজেই আমে পোকা লেগে যায়। যাই হোক্ এখানকার মাটি ধান, মুসুর ডাল, কলা, সুপারি ও কাঁটালের পক্ষে খুবই ভাল। বাঙলাদেশ ভিজে আবহাওয়ার দেশ। তাই এখানে ভূমধ্যসাগরীয় ও ক্রান্তীয় আবহাওয়ার ফসল ভাল হবে। শীত আবহাওয়ার ফসল যেমন আঙ্গুর, পাস্তা তৈরীর জন্যে আটা ইত্যাদি ভাল হবে না।

পূর্বে বাঙলাদেশে মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু এখন এখানে ঘাটতি। এর কারণ জলে যেসব সবুজ গাছপালা পচে মাছের খাদ্য জোগায়, তার অভাব। বৃক্ষ-ছেদন অর্থাৎ নির্বিচারে গাছ-পালা কাটাই এই সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

অতীতে ৰাঙলাদেশে ২৪০০ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি ছিল, এখন ১০০০ বর্গ কিমি আছে কিনা সন্দেহ। তার মধ্যে নদীর ধারে ধারে ঝোপঝাড় আর গাছগুলোও কেটে ফেলছে কাগজ তৈরী করার উদ্দেশ্যে। এর ফলে নদীর তীরগুলি ধসে গিয়ে নদীর গভীরতা কমিয়ে ফেলছে। আজ যদি ৰাঙলাদেশ মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকত, তাহলে মাছের কাঁটা থেকে ক্যালসিয়ামও পাওয়া যেত। তাই অতি সত্বর বাঙলাদেশে ব্যাপক পরিমাণে বৃক্ষরোপণ শুরু করা দরকার ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জন্যে কিছু জমি নির্দিষ্ট করে রাখা দরকার।

সারা বাঙলাদেশ জুড়ে ব্যাপক আনারাস উৎপাদন করার প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। আনারসের পক্ষে বছরে ৬০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত দরকার। বাঙলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত বছরে ৮০ ইঞ্চি, অবশ্য কতকগুলি জেলা বাদে যেখানে বৃষ্টিপাত বছরে ৬৫ ইঞ্চি। আনারসের পাতা থেকে ঔষধ ও সুতা তৈরী করা যাবে। উৎকৃষ্ট ধরনের ধুতি-শাড়ি এই ধরনের সুতা থেকে তৈরী করা যেতে পারে। যশোর জেলায় লিচুর চাষ হতে পারে। কেবলমাত্র রাজশাহী জেলায় তুঁতে সিল্ক উৎপন্ন করা যাবে আর এন্ডি সিল্ক যে-কোনো জেলায় উৎপন্ন হতে পারে।

বাঙলাদেশে তুলা ভাল জন্মায়। সুতরাং তুলা-চাষ ৰাঙলাদেশের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

যেসব জমি বর্তমানে পাটচাষে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলি তুতসিল্ক চাষে ব্যবহার করা যেতে পারে। তুঁতে গাছের কাঠ থেকে বাইরে রপ্তানীর জন্যে খেলার সরঞ্জাম সহ নানা জিনিস তৈরী হতে পারে যার বাইরে চাহিদা রয়েছে। তুঁতে কাঠ থেকে রেয়ন পাওয়া যেতে পারে। তুঁতে কাঠ যদি ঠিকমত পাকানো যায়, তাহলে এ লোহার মত শক্ত হয়। শালকাঠ ব্যাপক পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়। সেগুন কাঠও হতে পারে। যাই হোক, সেগুনের চাষ বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ এ কাঠ হতে প্রায় ৮০ বছর সময় নেয়, সেখানে শাল নেয় মাত্র ২৫-৩০ বছর। কুলগাছের চাষও করা যায়। এ থেকে তসর সিল্ক ও গালা উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু গালা শিল্প গড়ে তোলা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ আজ প্লাস্টিক এর স্থান দখল করে নিয়েছে। বর্তমানে এর কোনো বাজার নেই।

কলার চাষ ব্যাপকভাবে করা যেতে পারে। বিচি-কলা সারা বাঙলাদেশ জুড়ে পুকুরের ধারে ধারে আপনা থেকেই হয়। উচ্চ-ফলনশীল, উৎকৃষ্ট মানের বাছাই জাতের কলার চাষ

হতে পারে। কলার-চিপ্স বা শুকনো কলা তৈরী করা যায়। ফল হিসেবে কলায় চাষ করা দরকার। কলাগাছের বাকল পুড়িয়ে সোডিয়াম কার্বনেট বা কাপড় কাচা সোডা তৈরী করা যেতে পারে।

আজ গোটা বাঙলাদেশটাই চলছে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাবিহীনভাবে। স্বভাবতই এখানকার মানুষ উত্তেজিত হয়ে উঠছে। এদের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে সরকার এদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে দেশকে ইসলামিক রাজ্য করার মত অর্থহীন বিষয় তুলে ধরে মানুষগুলোকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে।

আজ বাঙলাদেশের জন্যে উপযুক্ত পরিকল্পনা দরকার। দেশের ভোটদাতারা যতদিন পর্যন্ত শিক্ষিত হয়ে না উঠছে, ততদিন যথাযথ পরিকল্পনাও সম্ভব নয়। আর ততদিন এই বিশৃঙ্খলা চলতেই থাকবে। আমি একথা বলছি না, তোমরা তোমাদের দেশের মানুষকে রাজনীতির শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলো-এটা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হতেও পারে নাও পারে। নিদেনপক্ষে তোমরা এদের রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তোল।

১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯, কলিকাতা

ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়ন

সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই ত্রিপুরা বাঙলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রাচীনত্বের দিক থেকে রাঢ়ের পরেই এর স্থান। গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত একই মাটি, একই জল, একই মানুষ, ও একই ভাষা নিয়ে বাঙালীরা এখানে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বসবাস করে আসছেন। পাঁচশ বছর আগেও ত্রিপুরার নাম ছিল 'শ্রীভূম'। ত্রিপুরা নাম খুব বেশী দিনের পুরনো নয়। বর্তমান ত্রিপুরা, নোয়াখালী, পার্বত্য ত্রিপুরা, কাছাড়, মণিপুর, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকান রাজ্যের কিয়দংশ নিয়ে ছিল 'শ্রীভূম'। ভারতীয় প্রাচীন নথিপত্রে শ্রীভূমকে 'উপৰঙ্গ' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীভূম বা উপৰঙ্গের আদিম অধিবাসী সবই ৰাঙালী। ব্যতিক্রম শুধু টিপ্পা-রা। প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর আগে মু-চাং-ফার নেতৃত্বে সুদূর ব্রহ্মদেশ থেকে আগত টিপ্পা-উপজাতিরা শ্রীভূমে এসে

সূচীপত্র

স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল। পরে তারা স্থানীয় হিন্দু রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে আর ত্রিপুরা রাজ্যের পত্তন করে। সেই সময় থেকে মু-চাং-ফা-র অধীনস্থ শ্রীভূম ত্রিপুরা নামে অভিহিত হয়ে এসেছে। কেননা এই ত্রিপুরা তখন টিপ্পা শসনাধীন ছিল। চৈতন্য মহাপ্রভু এই সময়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্যে শ্রীভূমে যান। মু-চাং-ফা ও রাজপরিবারের সকলেই শ্রীচৈতন্যের কাছ থেকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন ও বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকে নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি বলে গ্রহণ করেন, আর ব্যষ্টি নামগুলিও পালটে বাংলা নাম গ্রহণ করতে শুরু করেন। মু-চাং-ফা বাংলা জানতেন না কিন্তু রাজভাষা হিসেবে ৰাংলাকেই তিনি গ্রহণ করেন। শ্রীভূমের যে অংশটুকু মু-চাং-ফা দখল করেছিলেন সেই অংশ ছাড়া শ্রীভূমের অন্যান্য অংশগুলি মোগলযুগের শুরুতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। টিপ্পা অধিকৃত অংশটুকুর সংশোধিত নামকরণ হয় ত্রিপুরা। টিপ্পা জাতির শাসনাধীন রাজ্য এই অর্থেই সংশোধিত নাম হল ত্রিপুরা।

ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত ত্রিপুরার ভাষা ছিল বাংলা। টিপ্রাদের নিজস্ব ভাষা 'কক বরক'। বলাবাহুল্য এই ভাষা বার্মা

উপজাতীয় ভাষা, এই অর্থে বহিরাগত। স্থানীয় মাটি ও মানুষের সঙ্গে 'কক বরক' ভাষার কোনো যোগ নেই। স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে ত্রিপুরা সরকারী ও বেসরকারি কাজকর্ম চালানোর ব্যাপারে বাংলাভাষাকে সরিয়ে বহিরাগত ইংরেজী, হিন্দীকেই স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর চাপানো হয়েছে। আর বামফ্রন্ট সরকার বিভেদপন্থী রাজনীতিকে ত্রিপুরার বুকে প্রয়োগ করার জন্যে ৭০ হাজার টিপ্রা-র কথ্য ভাষা-যে ভাষা বহিরাগত- সেই ককবরক' ভাষাকে সাড়ে ১৭ লক্ষ বাঙালীর ওপর চাপিয়েছে। সভ্যতার ইতিহাসে এই বিভেদনীতির কোনো নজির নেই। দীর্ঘ শতাব্দী ধরে ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে সংস্কৃতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গড়ে ওঠা যে ৰন্ধন, সেই মৈত্রী ও ঐক্যৰোধ, কলুষিত রাজনীতির কদর্য প্রয়োগে আজ দিগন্তে বিলীন হতে চলেছে-যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হ'ল ত্রিপুরার সার্বিক বিপর্যয়।

প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ-পাঠান-মোগল এমনকি ব্রিটিশ আমলেও ত্রিপুরা ছিল অর্থনীতিতে স্বনির্ভর। ১৯৪৭ সালে বঙ্গ বিভাগের মাধ্যমে এই স্বনির্ভর অর্থনীতির মূলে কুঠারাঘাত করা হ'ল। র‍্যাডক্লিফ, রোয়েদাদ অনুযায়ী ত্রিপুরার কৃষিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলটি

পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হ'ল, আর জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলটুকু ভারত ইউনিয়নের জন্যে নির্দিষ্ট করা হ'ল। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোয় পার্বত্য ও অনুন্নত জঙ্গল অঞ্চল নিয়ে এখন ত্রিপুরা রাজ্যের পরিচিত লাভ করেছে। যা আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত।

স্বাধীনতার পরে ত্রিপুরা অবহেলা, বঞ্চনা আর শোষণের শিকার হয়েছে। ভারতের পুঁজিবাদীদের স্বার্থে, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় সরকারের করুণার দানের ওপর নির্ভর করে চলতে হয়, তাই তার অস্তিত্বই বাঁচিয়ে রাখা সমস্যা। এখন ত্রিপুরার প্রায় ১৭,৭৫,০০০ লোকের চরম দারিদ্র্য রাজ্যের রাজনৈতিক নেতাদের হাতে এক অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে তা ব্যবহার করে চলেছে। চরম আর্থিক অনিশ্চিয়তা আর রাজনৈতিক হিংসা ত্রিপুরায় জেনেবুঝে প্রোৎসাহিত করা হয়েছে, ও তা করা হয়েছে সেখানকার মানুষদের জাগ্রত রাজনৈতিক চেতনাকে রুখতে। ত্রিপুরার মানুষদের অনেক গা শিউরে ওঠা ও হিংস্র ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, এর কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক নেতাদের ষড়যন্ত্র। তাছাড়া স্বশাসিত জেলাপরিষদ আইনের মাধ্যমে

৭,০০,০০০ উপজাতিদের মধ্যে ত্রিপুরার প্রায় ৭০% জমি বিতরণ করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে ১৭,৭৫,০০০ বাঙালী বঞ্চিত হয়েছে। **ত্রিপুরার আজকের যে পরিস্থিতি তা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের সুদূরপ্রসারী বাঙালী বিরোধী নীতি আর কম্যুনিষ্টদের রাষ্ট্রবিরোধী তথা বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রের পরিণতি।**

ত্রিপুরার বর্তমান আর্থিক ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও এই অঞ্চলের খুবই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে কেননা এ রাজ্য প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। ত্রিপুরার ভূচিত্র ঠিক যেন একটা বড় গামলার মত- বাইরের সীমানা ভেতরের অংশ থেকে উঁচু। এদিক থেকে এর ভৌগোলিক চেহারা আয়ারল্যান্ডের মত। দু'য়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, ত্রিপুরার পাহাড় আর মাটির নীচেকার কঠিন ভূস্তর গ্রেনাইট দিয়ে তৈরী, তাই ত্রিপুরার জমি পাথুরে কিন্তু আয়ারল্যান্ডতা নয়। যদিও আয়ারল্যান্ড খুব উন্নত নয়, তবুও ত্রিপুরার সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করতে হলে বহু ক্ষেত্রে এই আয়ারল্যান্ডের মডেলকেই অনুসরণ করা উচিত।

প্রাচীনকালে ত্রিপুরার বিশাল জঙ্গলগুলিতে হাতি আর গণ্ডারে ভরা ছিল আর তা ছিল ত্রিপুরার মধ্যাংশে, রাজ্যের রাজধানী সহ অন্যান্য শহর আর কৃষিজমি ছিল জঙ্গলের চারিপাশে বাইরের সীমানায়। মধ্যাংশের মাটি কাজুবাদাম, আনারস আর কলা চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী। সাধারণভাবে ত্রিপুরার সর্বত্র গ্রানাইট পাথরের সঙ্গে সংলগ্ন মাটি এঁটুলে মাটি যা কৃষির পক্ষে আদর্শ, বিশেষ করে কমলানেবুর জন্যে। ত্রিপুরার সীমান্তে বাঙলাদেশ সংলগ্ন অঞ্চল বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল। তাই ত্রিপুরায় কৃষির উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর। যাই হোক্, গ্রানাইট পাথুরে জমির জন্যে এখানে আমন ধান খুব ভাল না হলেও আউশ ধান ভাল হবে। আউশ ধানের পরে জমিতে লঙ্কার চাষ করা উচিত যা একটি অর্থকরী ফসল, কেননা বাঙলাদেশে এর চাহিদা প্রচুর। আউশ ধান কাটার পরে যখন জমি ভিজে থাকে তখন শুকনো লঙ্কা বুনে দেওয়া যেতে পারে। শুকনো লঙ্কার চাষে গমের মতই জলসিঞ্চনের দরকার পড়ে। যেখানে জলাভাব আছে সেখানে ছোট দানার ছোলা হতে পারে। আয়ারল্যান্ডের মত প্রচুর লাল খোসার আলুর উৎপাদন হতে পারে; আয়ারল্যান্ডের লোকেরা আলু আর পরিজ খেয়েই থাকে।

ত্রিপুরায় এত আলুর উৎপাদন হতে পারে যা ত্রিপুরা ছাড়াও সমগ্র অসমকে খাওয়াতে পারে; তাই **ত্রিপুরায় আলুর প্রক্রিয়াকরণের জন্যে অনেক শিল্প গড়ে উঠতে পারে।**

উঁচু জমিতে যেমন আলু, আনারস আর কাজুবাদাম চাষ হতে পারে, তেমনি নীচের জমিতে কলার চাষ ভাল হবে। সব প্রকারের আদা-সাদা, হলুদ আর কালো- তার চাষও হতে পারে। বড় আকারের কচুও ভাল হতে পারে কিন্তু পূর্ণ অবস্থায় আসতে কচু প্রায় এক বছর সময় নেয়। মিজোরামের পরে বিশ্বে ত্রিপুরাতেই দ্বিতীয় উত্তম প্রজাতির বাঁশ উৎপাদিত হতে পারে। ফাঁপা বাঁশ কাগজ তৈরীর জন্যে সর্বোত্তম। তোমাদের বিভিন্ন প্রকার মিশ্র চাষ আর ঠিক কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তা হতে পারে, সেটাও জানতে হবে। আখের চেয়ে সুগার বিটের চাষ বেশী করে করা উচিত কেননা বছরে যেখানে চারবার সুগার বিটের ফলন হয়, সেখানে আখ নেয় পুরো এক বছর। সুগার বিট থেকে চীনী পাওয়া যাবে কিন্তু গুড় নয়, আর সুগার বিট এক অর্থকরী ফসলও বটে। আখের থেকেই গুড় তৈরী করা হবে আর তার ছোব্রা কাগজ উৎপাদনের কাজে লাগানো যাবে। সুগার বিটের বীজ তৈরী

করতে হবে ঠাণ্ডা অঞ্চলে যার জন্যে হিমাচল প্রদেশ আর কশ্মীর সবচেয়ে উত্তম। যাই হোক্ নিজস্ব স্থানেই এই বীজের উৎপাদন করাটাই সবচেয়ে ভাল। ত্রিপুরায় কৃষিভিত্তিক আর কৃষিনির্ভর দু'ধরনের শিল্পই গড়ে তোলা যেতে পারে।

ত্রিপুরায় এ্যালকোহল, ওষুধপত্র, ঔষধীয় উদ্ভিজ্জ আর সিল্ক এ সবই উৎপাদিত হতে পারে, আর ত্রিপুরাতে নিকৃষ্ট মানের কয়লাও পাওয়া যায়। এককালে ত্রিপুরা সারগোসা সমুদ্রের অংশ ছিল, তাই সেখানে তেলও পাওয়া যেতে পারে।

ত্রিপুরার উন্নতির জন্যে তোমাদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সামুহিক জ্ঞান থাকতে হবে–মাটির অবস্থা, নদী ব্যবস্থা, কৃষি–ফলচাষ–শিল্প সম্ভাবনা, সেচ, শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহ, খনিজ সম্পদ আর সংস্কৃতি। যদি ঠিকভাবে সামাজিক– অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচিত হয় তাহলে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

জুলাই ১৯৮৬, কলিকাতা

বিহারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন

মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী জীব নয়। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বিশ্বতোমুখী ভাবনা রয়েছে। জাগতিক আর মানসিক আভোগের (pabula) এষণা আসে নব্য মানবতাবাদ থেকে, আর প্রাউটের মধ্যে তার সম্পূর্ণ নিশ্চিততা থাকতে হবে। নব্য মানবতাবাদ বিশ্বমানবতাবাদেরই নামান্তর। কোনো মানুষকেই একটি নির্দিষ্ট স্থানে বেঁধে রাখা উচিত নয়। প্রত্যেক মানুষ বিশ্ববাদী। প্রাউট এক বৈবহারিক তত্ত্ব। প্রাউট জলসম্পদ, মাটি, শরীর, মন, মনের কাজ ইত্যাদি সব বিষয়ের ওপরেই নজর রাখে, আর এই ব্যাপারে প্রাউট বিশ্বের উন্নত-অনুন্নত সব জীবকে সামুহিকভাবে, আর প্রত্যেকের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখেই তা করে। প্রাউট আর নব্য মানবতাবাদ দু'য়ে মিলে এই পৃথিবীকে সব সমস্যা থেকে মুক্ত করবে।

এর জন্যে এক স্বাস্থ্যকর ও স্বচ্ছ অর্থব্যবস্থা অত্যাবশ্যক, আর তার জন্যে উপযুক্ত পরিকল্পনা অবশ্যই থাকতে হবে। এই পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এইসব বিষয়গুলি-

জনসংখ্যা, স্থানীয় পরিস্থিতি, সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, মানুষের ভাবাবেগগত উত্তরাধিকার, কাঁচামালের সহজলভ্যতা ইত্যাদি- তা নাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। এক শক্তিশালী অর্থনীতিতে স্থানীয় অঞ্চল থেকেই কাঁচামাল আসে। বাইরে থেকে আমদানী করা কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে শিল্পস্থাপন সবসময় দুর্বল থেকে যায়। এক দুর্বল অর্থব্যবস্থাই বাইরের কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে থাকে।

বিহারের বরৌণি তৈল শোধনাগর এক দুর্বল শিল্প কেননা তা অসম থেকে আসা মোটা তেলের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। যদি অসমে কোনো রকমের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরী হয় অথবা দেশ যদি টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তাহলে তৈল শোধনাগার বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এই ধরনের তৈল শোধনাগার স্থাপন একেবারে বোকামির কাজ হয়েছে। এটি কোনো স্বাস্থ্যকর অর্থনৈতিক সংরচনার নিদর্শন নয়। এই ধরনের শিল্প দুর্বল, মুর্খতা আর নির্বোধিতার উদাহরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো অঞ্চলের অর্থনীতি আর সেখানকার মানুষের সামাজিক জীবন এ দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। কেবলমাত্র বৃহৎ শিল্প স্থাপন করা উচিত নয় কেননা

এই ধরনের শিল্পে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব কমই থাকে।

বিহারে অনেক প্রকারের স্বাস্থ্যকর শিল্প তৈরী হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উত্তর বিহারে আখ আর সুগার বিট থেকে ঘনীভূত এ্যালকোহল পাওয়া যেতে পারে, আর তাদের বর্জিত অংশ কাগজ শিল্পে ব্যবহৃত হতে পারে। মাটির নীচের খনিজ জ্বালানি সমাপ্তপ্রায় হয়ে আসছে; এর পরিবর্তে ঘনীভূত এ্যালকোহল ব্যবহৃত হওয়া উচিত। মোটরযান এই ধরনের জ্বালানি দিয়ে চালানো যাবে।

দ্রুত ও সুসংবদ্ধ সামাজিক-আর্থিক উন্নতির জন্যে বিহারকে পাঁচটি সামাজীক- আর্থিক অঞ্চলে বিভাজিত করতে হবে- মিথিলা, মগধ, নাগপুরীয়া, অঙ্গদেশ আর ভোজপুরী। মগধ, নাগপুরী আর অঙ্গদেশ এই তিনটি সামাজিক-আর্থিক অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে বিহারের মধ্যে। মিথিলা আর ভোজপুরী অঞ্চল বিহারের বাইরেও আছে। এই প্রত্যেকটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক্।.

মিথিলা

মিথিলা অঞ্চলে ভারতের আটটি জেলা আর নেপালের চারটি জেলা অন্তর্ভুক্ত। এই সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলের সীমানা হচ্ছে- উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে গঙ্গা, পূর্বে অঙ্গদেশ, আর পশ্চিমে কালি-কোশী নদী। মিথিলার প্রথম কবি প্রায় ৯০০ বছর আগে প্রথম মৈথিলী সাহিত্য রচনা করেন, তাঁর নাম ছিল যতীশ্বর ঠাকুর আর তাঁকে 'বর্ণ রত্নাকর' নামে ডাকা হত।

বিহারের মিথিলাঞ্চলে মৈথিলী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আর ডোগামায়ারা মৈথিলী ভাষায় কথা বলে। ডোগামায়ারা ভূমিহারও নয় আবার মৈথিলীও নয়, তারা কেবল মৈথিলীতে কথা বলে। রাজপুত, যাদব, অন্যান্য কায়স্থ যেমন অম্বস্থ কায়স্থ, শ্রীবাস্তব কায়স্থ, আর কুর্মি তথা কুইরিরা অঙ্গিকা ভাষায় কথা বলে। মৈথিলী ব্রাহ্মণরা বাড়িতে মৈথিলী বলে কিন্তু ঘরের বাইরে বলে অঙ্গিকা, ডোগামায়ারাও তাই করে; তাই সেখানে মৈথিলী ঠিক জনগণের ভাষা নয়।

পাসোয়ান আর পাসিরাও অঙ্গিকায় কথা বলে, মৈথিলীতে নয়। পাসিদের দু'টি সম্প্রদায় 'আছে- ত্রিসুনিয়া পাসি আর ব্যাধ পাসি। যারা মধুসরাই অঞ্চলে থাকে তারা ত্রিসুনিয়া পাসি আর তারা অঙ্গিকা বলে। যারা মগধাঞ্চলে থাকে তারা ব্যাধ পাসি, তারা মগহী ভাষায় কথা বলে। ত্রিসুনিয়া পাসির গায়ের রঙ কালো আর তার সোজাসুজিভাবে কথা বলে। ব্যাধ পাসিরাও কালো রঙের কিন্তু ত্রিসুনিয়া পাসিদের মত কালো নয়।

সব জাতের লোকেরা মৈথিলী বলে কিন্তু অব্রাহ্মণ মৈথিলী আর অ-মৈথিলী কায়স্থ আর অ-ডোগামায়াদের ভাষা অঙ্গিকার দ্বারা প্রভাবিত।

মুজফফরপুরের চারিপাশের মাটি খুব উর্বর আর আলগা দোয়াঁশ মাটি যা ফলচাষ, বিশেষ করে উষ্ণ অঞ্চলের ফল আর ভূমধ্যসাগরীয় রসালো ফল, আর ডালের পক্ষে খুবই ভাল। নাইট্রোজেন যুক্ত মাটি শীতের ফসলের পক্ষে ভাল নয় যদিও পাটের পক্ষে ভাল। যাই হোক পাটশিল্পের কোনো ভবিষ্যত নেই, তাই তাকে উৎসাহ দিয়ে কোনো লাভ নেই। এর পরিবর্তে বরং রেমি সিল্ক শিল্প আর কৃত্রিম সিন্থেটিক

তন্ত্বশিল্প বিকশিত করার ওপর জোর দেওয়া উচিত। এটি উদ্বৃত্ত শ্রম- এলাকা হওয়ার কারণে মানুষ উত্তর থেকে দক্ষিণ বিহারে চলে যায়।

বিহারে কখনই দুই-তিনটি তৈল শোধনাগার স্থাপন করা উচিত নয়। কেন না তা কোনোদিনই আর্থিকভাবে লাভজনক হবে না। এছাড়া, যদিও সেখানে **নেপাল সীমান্তে তেলের ভাণ্ডার আছে,** কোনো ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলা উচিত নয় কারণ তার জন্যে আকরিক লৌহ (red hematite) আর কয়লা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে না। অবশ্য স্থানীয় কাঁচামাল ভিত্তিক বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর শিল্প গড়ে তোলা যাবে। উদাহরণস্বরূপ আগেই বলা হয়েছে আখ আর সুগার বিট থেকে খুব উঁচু মানের ঘনীভূত এ্যালকোহল জ্বালানি পাওয়া যাবে যা খনিজ তেলের বিকল্প; এটা এইজন্যে বিশেষ প্রয়োজন কারণ বিশ্বে তেলের ভাণ্ডার ক্রমশঃ কমে আসছে। এছাড়াও শক্ত বাঁশশিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। বাঁশের ভিতরে-বাইরে যে গাঁট থাকে তা বের করে দিলে, বাঁশের পাইপ যা প্রায় ইস্পাতের মতই শক্ত, তা তৈরী করা যেতে পারে। হিমালয়ের পাদদেশে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মায় কিন্তু মুজফফরপুরে এখন

পর্যন্ত কোনো বাঁশশিল্প গড়ে ওঠেনি। যদি এই শিল্প ঠিকভাবে গড়ে তোলা যায় তাহলে তা বিশ্বের বাজার দখল করে নিতে পারে। তোমাদের উচিত জনসাধারণের কাছে গিয়ে এই সমস্ত বিষয় ভালভাবে ব্যাখ্যা করা।

মগধ, নাগপুরী, রাঢ় অঞ্চল

প্রায় চার হাজার বছর আগে মগহী সমগ্র ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা ছিল। **মগহী ৫০০০ বছরের পুরনো ভাষা** আর এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো অন্য ভাষায় অনুপস্থিত। মগহীর চারটি কথ্য রূপ হচ্ছে– অওরঙ্গাবাদ, নালন্দার মধ্য মগহী, মুঙ্গেরিয়া আর মগরীবধ মৈথিলী। মগহী প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষের ভাষা আর বিহারের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এটি কথিত হয়।

পটনা, বিহারশরীফ আর গয়া খুব বড় শহর যাদের জনসংখ্যা ১০,০০,০০০– এরও বেশী। সমগ্র বিহারের জনসংখ্যা হচ্ছে আশি কোটি।

মগধের ভূচিত্র কী ধরনের? সেখানকার মুখ্য নদীগুলির বিভিন্ন স্তরগুলিই বা কী রকম? বর্ষাকালে ফল্গু আর শোন নদী দিয়ে প্রচুর জল বয়ে যায়। মিথিলার সমতল স্তরে মাটি খুব নরম, আর এই জন্যে মিথিলার নদীগুলি সর্বদা তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে। মিথিলার কোনো নদীরই ৰ-দ্বীপীয় স্তর নেই- এদের পার্বত্য স্তর নেপালে, সমতল স্তর মিথিলায় আর ব-দ্বীপীয় স্তর বাঙলায়। তাই নদীগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্যে ৰাঙলা আর নেপালের সহযোগিতা প্রয়োজন। কোয়েল নদীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে মগধ আর কোশল অঞ্চলের পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। মগধ আর কোশলের সমস্যাগুলি একই রকমের।

বঙ্গোপসাগর থেকে আসা বর্ষার মেঘ ভারতে বনোচ্ছেদনের কারণে আরবসাগরে চলে যায়। এইভাবে সেই মেঘ আরবসাগরের ওপরে বৃষ্টিপাত ঘটায়, ভারতে নয়, তাই এতে আরবসাগর গভীরতর হচ্ছে অথচ বঙ্গোপসাগরের জল অধিক লবণাক্ত হয়ে যাচ্ছে। আজ এটাই ঘটছে। এইজন্যে মগধের মেঘও চলে যাচ্ছে আরবসাগরের দিকে। এর ফলস্বরূপ ভূমিক্ষয় বেড়ে চলেছে আর ভূমির অংশ কমে চলেছে। বর্তমানে

পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ জল আর এক তৃতীয়াংশ ভূমি; কিন্তু বনোচ্ছেদনের কারণে পৃথিবীর সর্বত্র জলের ভাগ আরও বাড়বে আর ভূভাগ কমতে থাকবে।

নদীকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে? নদীর নিয়ন্ত্রণের জন্যে তিনটি স্তরেরই বিশেষজ্ঞদের নিয়ে শক্তিশালী বোর্ড গঠন করতে হবে। এই বোর্ড দ্বারা নদী- পরিকল্পনাও সফলভাবে রূপায়িত হবে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কোনো দেশই ইচ্ছেমত নদীর জল ছাড়তে বা ব্যবহার করতে পারে না। পার্বত্য স্তর অবশ্যই সমতল স্তরের সঙ্গে আলোচনা করে নেবে, তেমনি সমতল স্তরও ব- দ্বীপীয় স্তরের সঙ্গে আলোচনা করে নেবে। উদাহরণস্বরূপ নেপালকে অবশ্যই সমতল ও ৰ-দ্বীপীয় স্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। এই তিনের মধ্যে যদি সহযোগিতার অভাব থাকে তাহলে পার্বত্য স্তর থেকে আসা অতিরিক্ত জল অথবা ৰ-দ্বীপীয় স্তরে অধিক পরিমাণে আটকে থাকা জল সমতলের এক বৃহৎ অংশকে নিমজ্জিত করবে। এই ব্যাপারে মিথিলা অঞ্চলের থেকে মগধ অপেক্ষাকৃত ভাবে ভাল অবস্থায় আছে কেননা নদীগুলির সমতল স্তর মগধে।

যদিও সিংভূম জেলা বিহারে (বর্তমানে ঝাড়খণ্ডে) অবস্থিত, এটি ৰাঙালীস্তান সামাজিক-আর্থিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এই জেলায় আছে লালমাটি আর এটি পাহাড় আর উপত্যকায় ভর্তি। এর উত্তরাংশ পাহাড় শ্রেণী আর নদী উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত, যার মধ্যে পড়ছে সুবর্ণরেখা উপত্যকা ইত্যাদি। পাহাড়গুলি খুব বেশী পাথুরে নয় আর এতে উন্নত কৃষিকাজের সুযোগ আছে। নদীগুলির জল ঋতুর ওপর নির্ভর করে, যদিও গ্রীষ্মকালে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় না। তাই এই অংশটাতে জলবিদ্যুৎ না হলেও তাপবিদ্যুতের সম্ভাবনা আছে। ঝাড়খণ্ডের উত্তর পশ্চিমাংশের জিলেবিয়া মোড় পর্যন্ত আর **সুবর্ণরেখা নদীর উত্তরের পূর্ব প্রত্যন্তে আকরিক লোহা, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ আর তামা পাওয়া যেতে পারে। সিংভূমের দক্ষিণে তামার খনি আছে, আর আছে থোরিয়াম ও ইউরোনিয়ামের সম্ভার।**

সিংভূম জেলায় নদীর সংখ্যা অনেক হলেও জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি বেশী হয়নি। স্থানীয় জনসংখ্যার ৬০% মাহাতো। ২০০ বছর আগে মধ্যপ্রদেশ থেকে সাঁওতালরা এখানে এসেছিল (বাংলা ১১৭৬ সাল)। এখানে হো মুণ্ডা, সিং মুণ্ডা,

আর খামার মুণ্ডারাও বাস করে। সিং মুণ্ডারা রাঁচীর পূর্বাংশ থেকে এসেছিল। সমগ্র রাঢ় অঞ্চল প্রাচীন গণ্ডোয়ানাভূমির অংশ যার মধ্যে পড়ে রাঁচী, পুরুলিয়া, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ভঞ্জভূম, সুন্দরগড় ইত্যাদি। এখানেই প্রথম মানব প্রজাতির উদ্ভব আর পৃথিবীর প্রথম মানব বাসস্থান এখানে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এর উন্নতির জন্যে প্রয়াস করা হয়নি। এই জেলার সর্বত্র মাথাপিছু আয় সর্বাঙ্গ। চাল আসে মেদিনীপুর আর বর্ধমান জেলা থেকে। ছোটনাগপুরে লোহারদগা আর পশ্চিমাংশেও মাথাপিছু আয় খুব কম যদিও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মহকুমার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কংসাবতী নদী ছাড়া বাকি নদীগুলি এখনও আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত।

সিংভূম জেলায় কী কী ফল আর অর্থকরী ফসল হতে পারে? মাটি ফলচাষের পক্ষে ভাল আর কাঁটাল খুব ভালই হয়, এর থেকে এ্যালকোহল প্রস্তুত করা যেতে পারে। কাঁটালের বিচি শুকিয়ে আঁটা তৈরী করে তা দিয়ে ভাল মানের রুটি হতে পারে। কাঁটাল থেকে ভেজিমিট আর গুড়শিল্প গড়ে উঠতে পারে। কাজুবাদাম আর মুসাম্বী নেবুর চাষও হতে পারে।

কাজুবাদাম এক অন্যতম উৎকৃষ্ট অর্থকরী ফসল। গাছে যদি হাড়গুড়ো আর জল দেওয়া হয়, কাজুবাদামে মিষ্টত্ব আসতে পারে। এই অঞ্চলে আতা আর আপেলের চাষও হতে পারে। চন্দন গাছও ভাল হবে, বিশেষ করে যেখানে লালমাটি আছে, যদিও চন্দন পূর্ণত্বপ্রাপ্তির জন্যে কুড়ি বছর সময় নেয়। মহুয়া গাছও ভাল হয়, আর মহুয়ার ফুল শুকিয়ে তা থেকে আটা ও রুটি হয়। এ অঞ্চলে বেদানার চাষও ভাল হবে, আর যদি এতে উপযুক্ত সার দেওয়া হয় তাহলে এতে মিষ্টত্ব আসবে। বছরে জমিতে দু'টি ফসল হতে পারে আর গমও হতে পারে। সমতল অংশে লাল খোসার আলু যা থেকে নানান রকমের প্রক্রিয়াকরণ শিল্প হতে পারে। ফুলের চাষও ভাল হবে যা থেকে নির্যাস পাওয়া যাবে। লাল মাটিতে গোলাপ খুব ভাল হবে। ঔষধীয় উদ্ভিদ আর ছোট জাতের আঙ্গুরও হবে।

পটনা জেলাতে আম আর পেপে চাষের সম্ভাবনা ভালই। পেপে থেকে পাওয়া যাবে পেপটোন যা পেটের রোগে খুবই উপকারী। এখন প্রশ্ন হ'ল কী প্রকারের আম আর তা কোথায় কীভাবে হবে? এতে কী রকম সারের ব্যবহার করতে হবে? তোমাদের এইসব প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে।

মগধে গঙ্গা পশ্চিম থেকে পূর্বে বয়ে চলেছে। গঙ্গার একদিকে মগধ আর অন্যদিকে মিথিলা। গঙ্গার তটবর্তী জমি দোয়াঁশ যা আম, লিচু, কলা আর নেবুর জন্যে খুব ভাল। পটনা জেলার গঙ্গার দক্ষিণে কিছু অংশ (যার প্রাচীন সংস্কৃত নাম পাটলিপুত্র) আর উত্তরের কিছু অংশেও দোয়াঁশ মাটি আছে। গঙ্গার দক্ষিণে পটনার দিকে দশ মাইল পর্যন্ত এলাকা আমচাষের খুব উপযোগী। দিঘা অঞ্চল [পটনা জেলা] এই দশমাইল ব্যাসার্ধের মধ্যেই পড়ে। দশ মাইলের বাইরে জমি কর্দমাক্ত যাতে আমের চাষ ভাল হবে না। আরও যত দক্ষিণে যাওয়া যাবে, মাটি লাল রঙের হতে থাকবে। বেগুসরাইতেও মাটি দোয়াঁশ যাতে আম ভাল হবে। মগধের গয়া আর নবাদা অঞ্চলে আম ভাল হবে না কেন না তা খুব টক আর পোকায় ভর্তি হবে। পটনার উত্তরাংশে লিচু, আম, নেবু ভাল হবে কিন্তু এর মাটি পেপে অথবা পেয়ারার পক্ষে খুব উপযোগী নয়। পেয়ারা যদি হয়ও এলাহাবাদের মত বড় আকারের পেয়ারা হবে না। গঙ্গার দক্ষিণে পেপে ভাল হয় তাই সেখানে পেপটোন শিল্প গড়ে তোলা যায়। পেপে ছোট হলেও মিষ্ট

জাতের হবে। গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে আম 'আর লিচু ভাল হয় এই কারণে বাঙলার মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলাতেও আম চাষ খুব ভাল হয়। কৃষির জন্যে আমাদের যে বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে সেগুলি হ'ল– মাটির প্রকৃতি, জলবায়ু, জল সরবরাহ, কোন্ প্রকারের ভূমি ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ মাটির জলধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ভূমির প্রকারভেদ নিম্নোক্ত রকমের :

১। উঁচু আর টাড় জমি। এইরকমের মাটি অনুর্বর আর এর জলধারণ ক্ষমতা খুব অল্প বা একেবারেই নেই। যদি জল আর সারের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে জমিকে উৎপাদশীল করা যাবে, আর তাতে কিছু ফল, কুর্থী আর নেবু ঘাসের চাষ হবে, এই নেবু ঘাস থেকে উন্নত মানের প্রসাধন শিল্প গড়ে তোলা যাবে। আনন্দনগরের জমি এরকমই টাড় জমি।

২। অনুর্বর সমতল ভূমি। এই ধরনের জমি জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন। তাই একে চাষবাসের উপযোগী করা কঠিন নয়, এইজন্যে জলসেচ অত্যাবশ্যক। এর ফলে জমি ফল আর অন্যান্য চাষের উপযোগী হয়ে উঠবে। এই ধরনের জমিতে কিছুটা আউশ আর আমন ধানচাষও হতে পারে।

৩। সাধারণ অর্থাৎ কানালী জমি। এই জমিরও অনুর্বর সমতল জমির থেকে জলধারণ ক্ষমতা বেশী কিন্তু বহাল জমির থেকে এটা নিকৃষ্ট মানের।

৪। ভিজে ও উর্বর জমি অর্থাৎ বহাল জমি। এই ধরনের জমির জলধারণ ক্ষমতা খুব ভাল আর সবরকম চাষবাসের পক্ষে খুবই উপযোগী।

পর্যায়ক্রমে উত্তম মানের মাটি, ভিজে আর উর্বর, তারপরে স্থান হচ্ছে সাধারণ অর্থাৎ কানালী জমির, তারপর অনুর্বর সমতল জমি, আর টাঁড় জমি সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানের। কর্ষকদের কোন্ ভূমি আর মাটি কীভাবে চাষ করতে হবে সে সম্পর্কে জ্ঞান সাধারণতঃ কম থাকে। আগেই বলা হয়েছে ভঞ্জভূম, সিংভূম, কেওঞ্চর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পূর্ব রাঁচী, ধানবাদ ইত্যাদি অঞ্চলের মাটি শক্ত লালমাটি হওয়ার কারণে তা ফলচাষের পক্ষে আদর্শ, অবশ্য যদি মাটিতে উপযুক্ত সার প্রয়োগ করা হয়। দুমকার মাটি রাঢ়ের অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক কেননা তাতে লাল মাটির ভাগ কম। ঠিকভাবে সার প্রয়োগ করলে দেওঘর জেলায় আম উৎপন্ন হবে। পটনায় বিশেষ করে এর উত্তরাংশে রেড়ির চাষ হতে পারে। সমতল

ভূমি ধানের ফসলের পক্ষে ভাল যেখানে অপেক্ষাকৃত শুকনো জমিতে গম চাষও ভাল হবে।

নদীর জল সহজেই জলমগ্ন বা জল সংলগ্ন মাটিকে কেটে পথ তৈরী করে নেয়; কিন্তু অনুর্বর সমতল ভূমি আর শক্ত লালমাটিতে তা করা কঠিন। তাই কোনো বড় সেতু তৈরী করবার আগে দুই পাশকে খুব শক্ত মাটির ভিতের ওপর রাখতে হবে। মোকামার কাছে গঙ্গার ওপরে যে রাজেন্দ্র সেতু তৈরী করা হয়েছে তাতে মোকামা অংশের ভূমি সমতল কিন্তু বিপরীত অংশের জমি জলমগ্ন আর নরম, যার অর্থ যে কোনো সময়ে সেতু জলের স্রোতে ভেসে যেতে পারে।

যদি কর্ষকরা সমবায় প্রথা অবলম্বন করে তাহলে তারা অনেক উপকৃত হবে। উদাহরণস্বরূপ আল তৈরী করতে যে খণ্ড খণ্ড জমি নষ্ট হয়, সমবায় প্রথায় চাষ করলে তা না থাকায় জমি ঠিকভাবে ব্যবহৃত হবে, আর এইভাবে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ যাবে বেড়ে। একই স্তরের জমিকে এইভাবে সমবায় চাষের অধীনে আনতে হবে; কিন্তু জমি যদি উঁচুনীচু হয় তাহলে জমির এই একত্রীকরণ অতটা সম্ভব হয় না। উঁচুনীচু জমি আর যে জমিতে ক্ষুদ্র নদী উপত্যকা আছে

সেইসব স্থানে কম খরচায় ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা শুরু করা যেতে পারে, যা কয়েক হাজার টাকার মধ্যেই হয়ে যায়। এই ব্যয় সমবায় প্রথায় খুব সহজেই ব্যবস্থা করা যায়। এছাড়া সমবায় প্রথায় মিশ্রচাষ আর পর্যায়ক্রমে চাষ ভালভাবে হতে পারে। এইভাবে আনন্দনগরে বছরে চারটি ফসল হতে পারে। ইতোপূর্বে আমি কোন্ সার কোন্ জমির পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট তা বুঝিয়ে বলেছি। চাষের জন্যে কোন্ ধরনের সার প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ভর করে জমির প্রকৃতির ওপর।

অনুর্বর জমিতে জলবায়ু অনুযায়ী রেশমের চাষ (sericulture) বিকশিত করা যায়। বিহারে এণ্ডি আর মুগা সিল্কের চাষ ভাল হবে কিন্তু তুঁত রেশমের সিল্ক ভাল হবে না। এন্ডি সিল্ক সোণালি আর মুগা সিল্ক লালচে।

স্ট্যাণ্ডার্ড নাগপুরী গুমলা অঞ্চলের ভাষা, রাঁচী এলাকার ভাষা বাংলা ও মগহীর দ্বারা প্রভাবিত। মগহী, ভোজপুরী আর নাগপুরী ভারত সরকার দ্বারা স্বীকৃত নয়। মৈথিলী কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারাও স্বীকৃত। অঙ্গিকা এমনকি সাহিত্য

একাডেমি, বিহার সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা স্বীকৃত নয়।

পালামু জেলার মাটির সমস্যা আর পাথুরে ভূমির স্থিতি কী রকম? এই জেলার মুখ্য নদীগুলি কী? পালামু জেলা ছোটনাগপুরের উত্তর-পশ্চিম থেকে শুরু। পালামুর পশ্চিম দিকে শোন নদীর অববাহিকায় শোন উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ- পশ্চিমে বয়ে চলেছে। জেলার মধ্যাংশে বয়ে চলেছে কোয়েল নদী।

একদা পালামু ছিল গণ্ডোয়ানার মধ্যাংশে। আর তাই এখানকার শিলার স্তর পাললিক। পালামু জেলার উত্তরে আর মধ্য পশ্চিমে দামোদর উপত্যকা অবস্থিত। দামোদর উপত্যকার সর্বত্র কয়লা ভাণ্ডার, পুরনো শক্ত শিলা, রূপান্তরিত শিলা, টাংস্টেন, শক্ত ধাতু, আকরিক লৌহ আর লাল হেমাটাইট আছে। পালামু মগহীভাষী অঞ্চল। লাতেহার আর গারওয়া মহকুমাও মগহী ভাষী। মধ্যপ্রদেশের শোন নদীর অপরাংশও মগহী ভাষী।

পালামুর ইতিহাস আর বৃত্তান্ত খুব সুন্দর। এটি ওরাঁও উপজাতিদের প্রাচীন বাসভূমি, এরা কুরুক ভাষায় কথা বলে,

যা দ্রাবিড়জাত ভাষা, যেমন তামিল, তেলেগু, মালয়ালম। এই অঞ্চলে রাজপুত রাজাদের রাজত্ব ছিল কিন্তু তাদের উৎখাত করার পরে এই অঞ্চলে বহিরাগতদের সঙ্গে রক্তের মিশ্রণ শুরু হয়। পাঠান যুগ পর্যন্ত পালামু স্বাধীন ছিল। মুঘল যুগে পালামু মুঘল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল আর বাঙলার নবাবদের তাদের সেলামী দিতে হত। কিন্তু বাস্তবে এটা স্বাধীনই ছিল। ব্রিটিশ যুগে জেলার মুখ্যালয় হাজারিবাগের স্থানান্তরিত হয়।

হাজারিবাগ জেলায় অধিকাংশ মানুষ মগহী ভাষী, সবচেয়ে বড় নদী হ'ল দামোদর। উত্তর আর মধ্য প্রত্যন্ত শিল্প এলাকা হওয়ায় এর শিল্প সম্ভাবনা প্রচুর। এই জেলার কোডরমাতে অভ্রস্তরের অংশ সবচেয়ে বেশী কিন্তু তা বর্তমানে হাজারিবাগ থেকে কেটে নূতন জেলা গিরিডিহর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। দামোদর উপত্যকায় কয়লা ভাণ্ডার আছে।

হাজারিবাগ কী নাম করে এল? রাতু গোষ্ঠীভুক্ত হাজারিলাল সিংদেও যিনি বড় জমিদার ছিলেন, তাঁর নাম থেকে হাজারিবাগ নাম এসেছে। তিনি ছোটনাগপুরের শিশনাথ কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হন। হাজারিবাগ জেলার অন্তর্ভূমিতে

খনিজ পদার্থ আছে, এখানে বনাঞ্চল আর কৃষিকাজের উন্নতি করা উচিত।

নাগপুরী আর লোহারদগা জেলার নিম্নাংশের সমস্যাগুলি কী? এই নিম্নাংশের সেচ সমস্যার সমাধানই বা কী? জল আসবে কোথা থেকে? নেতারহাটের কাছে কিছু জলের উৎস আছে, এখানে ভাল লালমাটিও আছে, কিন্তু বনোচ্ছেদনের কারণে এই স্থানে জলের অভাব আছে। মগধ অঞ্চলও এই বনোচ্ছেদনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে ব্যাপকভাবে বনসর্জন অত্যাবশ্যক।

লোহারদগা জেলাতে মিশ্রিত মাটি। রাঁচী থেকে কেটে এই জেলা তৈরী হয়েছে বলে এটি আকারে খুবই ছোট। এখানে প্রধান আদিবাসী হচ্ছে ওরাঁও যারা নিজেদের মধ্যে কুরুক ভাষায় কথা বলে আর অন্যের সঙ্গে নাগপুরী অথবা সাদরীতে। তানাভগৎ গোষ্ঠীর মধ্যেই এই কুরুক ভাষা বেশী প্রচলিত। মুণ্ডারা সাদরীতে কথা বলে। এখানে বক্সাইট পাওয়া যায় বলে এ্যালুমিনিয়াম কারখানা গড়ে তোলা উচিত। স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন কাঁচামাল থেকে কোনো শিল্প প্রায় এখানে নেই। বর্তমানে এখানে বছরে একটাই ফসল উৎপন্ন হয়, তাই

মানুষেরা অত্যধিক দরিদ্র। জনসংখ্যার ৬৫% আদিবাসী আর ৩৫% অ-আদিবাসী। অ- আদিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশেরই জীবিকা কামারের কাজ অথবা ব্যবসা।

অঙ্গদেশ

ওড়িষ্যার কোশল অঞ্চল থেকে অঙ্গদেশ আরও পিছিয়ে। অঙ্গদেশে কোনো শিল্পই নেই, আর জনসাধারণের ভাষা অঙ্গিকা স্বীকৃত ভাষাও নয়। জনসাধারণের ভাষা কখনই অবদমিত থাকা উচিত নয়। যদি তোমার মাতৃভাষার কোনো স্বীকৃতি না থাকে তাহলে তোমারও কোনো স্বীকৃতি থাকে না। বিহারের পাঁচটি মাতৃভাষার মধ্যে কোনো একটিরও ভারতের সংবিধানে স্বীকৃতি নেই। আর এইজন্যে বিহারের মানুষকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকতে হয়, অন্য দিকে দেশের অনেক সামান্য ভাষাও স্বীকৃত। ভারত সরকার, জাতীয় সাহিত্য একাডেমি, সঙ্গীত একাডেমি আর বিহার সরকার কেউই অঙ্গিকা ভাষার স্বীকৃতি দেয়নি। সরকারী নেতৃস্থানীয় ব্যষ্টিদের পক্ষে এটা খুব

ভাল ব্যাপার নয়। প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত, তাই অঙ্গিকা ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তক চালু করা উচিত।

অঙ্গদেশের সংলগ্ন একটি অংশে তিনটি অঞ্চলের ভূমি সন্নিবিষ্ট আছে– নেপাল, বিহার, বাঙলা– যেসব স্থানে লোকে ভোজপুরী, অঙ্গিকা, মৈথিলী আর বাংলাতে কথা বলে। ব্রিটিশরাজের প্রথম চরণে ১৭৭৩ সালের পলাশী যুদ্ধে অঙ্গদেশের এই অঙ্গিকাভাষী অংশ নেপালের রাজা পথ্বীরাজ শা দখল করে নেয়। নেপালের অঙ্গিকাভাষী লোকেরা মোরাং জেলায় বসবাস করে যাতে প্রধান শহরের নাম বিরাটনগর। নেপালের অঙ্গিকাভাষী অংশ অঙ্গদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করা উচিত। এটা হচ্ছে একটা ভৌগোলিক–আর্থিক আবশ্যকতা। ভাগলপুর থেকে হিমালয় অঞ্চল পর্যন্ত ট্রেন সংযোগেরও ব্যবস্থা করা উচিত।

অঙ্গদেশের ভূনিম্নস্থ সম্পদের কী পরিস্থিতি? **গোড্ডা জেলার পশ্চিমাংশে চুনাপাথর, ডলোমাইট, চীনা মাটি আর কয়লা আছে। পূর্বাংশে ডলোমাইট নেই, আছে কেবল কয়লা।** জামালপুরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আকরিক লৌহ পাওয়া যেতে পারে যদিও খুব বেশী পরিমাণে নয়। সম্প্রতি জামুই জেলায়

স্বর্ণভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে আর লালমাটিয়াতেও কয়লা ভাণ্ডার আছে।

অঙ্গদেশে কয়লা থেকে উৎপন্ন তাপবিদ্যুৎ খুব সস্তায় পাওয়া যাবে। এখনকার মত বাইরে থেকে কয়লা কিনে আনার কোনো প্রয়োজন নেই। সমতল এলাকায় উঁচুনীচু অংশে সৌরবিদ্যুৎ তৈরী করা যাবে।

অঙ্গদেশের উত্তর অংশে উপযুক্ত সেচ বা জল বয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই অথচ স্থানে স্থানে জলমগ্ন ভূমি আছে। এখানকার ভূমিকে সুসংবদ্ধ জল পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণে যেখানে জলের অভাব আছে, উত্তর অঙ্গদেশ থেকে অতিরিক্ত জল সেখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। যদি অসমের দূরবর্তী স্থান থেকে বিহারে তেল আনা যায় তাহলে অঙ্গদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণে পাইপে করে জল নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কেন করা যাবে না?

উত্তরের কোশী নদীর তটবর্তী এলাকা জলমগ্ন থাকে। আসলে সমগ্র কোশী অঞ্চলই প্রায় জলমগ্ন অবস্থায় থাকে। এই নদী দ্বারা বাহিত পলল মাটি জমির উর্বরতা শক্তিকে নষ্ট

করে দেয়, তাই বর্ষাকালে নদীর জল সেচকার্যে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। খাল-নালার মাধ্যমে জল নিয়ে যাওয়ার অর্থ জলের অপচয় করা নয়। কোশী নদীর জল যদি গঙ্গাতে পড়ে বঙ্গোপসাগরে চলে যায়, সেটা অপচয় বা ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই নয়।

অঙ্গদেশে কৃষির প্রচুর সম্ভাবনা অছে আর সেখানে অনেক প্রকারের কৃষি- নির্ভর (agro-industries) আর কৃষি-ভিত্তিক শিল্প (agrico-industries) গড়ে তোলা যাবে। জমি থেকে বছরে যেখানে তিনটি ফসল পাওয়া যেতে পারে সেখানে বর্তমানে কেবলমাত্র একটি ফসল জন্মায়। বাঁকা জেলার দক্ষিণে ঠিক এরকমই অবস্থা। সম্প্রতি জামুই, দেওঘর আর বাঁকা জেলা থেকে কিছু অংশ কেটে চন্দন কাটারিয়া নামে একটা নূতন জেলা তৈরী করা হয়েছে যা মগধ, অঙ্গিকা আর বাঙলার মিলনবিন্দুতে অবস্থিত। এটি একটি শুষ্ক জেলা হওয়া সত্ত্বেও জমি খুব উর্বর যা কৃষির পক্ষে খুব আদর্শ। অঙ্গদেশের প্রধান শিল্প হওয়া উচিত কৃষি-নির্ভর আর কৃষি-ভিত্তিক শিল্প। অঙ্গদেশের দক্ষিণ প্রত্যন্তে চুনাপাথর তো আছেই, গড্ডা জেলার পশ্চিমাংশে চুনাপাথর আর চীনা মাটি পাওয়া যাবে, তাই

সেখানে সিমেন্ট কারখানাও হতে পারে। চালের তুষ আর চুনাপাথর মিলিয়েও সিমেন্ট তৈরী হতে পারে।

২০০০ বছর আগে দিনাজপুর ছিল কৈবর্ত্তদের মুখ্য আবাসস্থল। সেখান থেকে তারা পূর্ণিয়া সহ অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু তারা এখনও বাড়িতে বাংলা ভাষায় কথা বলে। তাদের গায়ের রঙ খুব কালো নয়, বরং অনেকটা মেটে রঙ। তাদের মুখ গোলাকার, তারা খুব বেশী লম্বা নয় আর অধিকাংশই কৃষিকার্যে নিযুক্ত। পূর্বে তারা পূর্ণিয়ার অন্যতম প্রধান জনসমুদায় ছিল, আর তারা বিবাহ ইত্যাদিতে বাংলা রীতি অনুসরণ করে।

পূর্ণিয়া জেলায় চারটি বাংলাভাষী জনসমুদায় আছে– কায়স্থ, হাড়ি, ডোম, আর তথাকথিত উঁচুজাতের সদ্গোপ (হাড়ি আর ডোমেরা schedule castes বলে গণ্য হয়)। এরা বাড়িতে বাংলা বা অঙ্গিকা–বাংলা মিশ্রিত ভাষায় কথা বলে। যদিও কিছু কৈবর্ত্ত 'বিশ্বাস' পদবি ব্যবহার করে, তবুও এদের অধিকাংশের পদবি 'মণ্ডল'।

সদ্গোপ ছাড়াও গোপেদের আরও কিছু গোষ্ঠী যারা বাঙলা থেকে আগত তারা এখনও বাংলা রীতি ব্যবহার করে। রাঢ়

অঞ্চল থেকে গোপ সম্প্রদায়ের অনেকে বিহারে এসেছিলেন (বর্ধমান, বীরভূম আর মুর্শিদাবাদ থেকে) যাতে ওই অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি না হয়, কেননা তারা লাঠি চালনায় দক্ষ ছিল। এই গোষ্ঠীকে বলা হয় 'ঘোষি' আর তাদের পদবি 'ঘোষ'।

আমি অঙ্গদেশ, মগধ, নাগপুরী আর কোশল অঞ্চলে এক বিস্তৃত উন্নয়ন পরিকল্পনা, এক আদর্শ পরিকল্পনা, এক সুসংবদ্ধ নকশা চাই। আমি আগেই বলেছি দক্ষিণ অংশ ছাড়া অঙ্গদেশ প্রায় সমতল, বাকি তিনটি সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলে মিশ্রিত ভূমিচিত্র, মগধ সমতল আবার উঁচুনিচু, আর নাগপুরী, কোশল উঁচুনিচু তো বটেই তার সঙ্গে উপত্যকায় ভরা। এই সবের প্রতিটি ইঞ্চি জমিকে কাজে লাগাও, প্রতিটি জলবিন্দুকে কাজে লাগাও।

ভোজপুরী

ভোজপুরী অঞ্চলে গোরখপুর সহ অনেক জেলা আছে। ভোজপুরীতে তিনটি লিপি, প্রথমটি নাগরী যা এলাহাবাদের যা

পশ্চিমাংশে ব্যবহৃত হয়। ম্যাক্সমুলার নাগরী রীতিতে বেদ লেখেন, ৮০০ বছর আগে যার নাম হয় 'দেব নাগরী'। দ্বিতীয় হচ্ছে সারদা লিপি যা এলাহাবাদের উত্তর-পশ্চিমাংশে ব্যবহৃত হয়, এটি ১৩০০ বছরের পুরনো। তৃতীয়টি কুটিলা লিপি যা এলাহাবাদের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। এটি ওড়িয়া, বাংলা, ভোজপুরী, মৈথিলী, অঙ্গিকা ইত্যাদি ভাষারও লিপি যা ১১০০ বছরের পুরোনো।

কৃষ্ণের মাতৃভাষা ছিল শৌরসেনী প্রাকৃত। পরে এর থেকে ব্রজভাষার জন্ম হয় আর এটি এলাহাবাদের পশ্চিমে কথিত হয়। রহিম, সুরদাস, ইত্যাদিরা প্রাকৃত ভাষার কবি। ব্রজের আগরওয়ালরা মূলগতভাবে ব্রজ অঞ্চল থেকে যাওয়া, তারা মাড়োয়ারী নয়। এলাহাবাদের মুসলমানেরা অধিকাংশই অবধী ভাষায় কথা বলে যদিও শিয়ারা উর্দুতে কথা বলে।

ভোজপুরী অঞ্চলের যে তিনটি বড় শহর-বারানসী, গোরখপুর, আর ছাপরা-এতে কোনো শিল্পের অস্তিত্ব নেই। স্বভাবতই এই অঞ্চলের সমস্ত সম্পদ বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণে। সবরকম শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে আর সেখানকার মানুষদের এর সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

গোরখপুর আর দেউরিয়া জেলার কৃষি সম্ভাবনা সমান নয়। দেউরিয়া গোরখপুর থেকে নদী সম্পদে বেশী সমৃদ্ধ হলেও দেউরিয়া জেলায় পাটচাষ ভাল হবে। পাটতন্তুর সঙ্গে উল মিশ্রিত করলে তা থেকে ভাল মানের পাট-উলের বস্ত্র তৈরী হবে। নেপালের সংলগ্ন অঞ্চলেও ভাল পাট হবে।

কৃষি-নির্ভর শিল্প তৈরী করতে হলে পরিবহন আর বাজারের ব্যবস্থা এ দু'টিকেও মনে রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ কোনো বড় শহরের দশ মাইল ব্যাসার্জের মধ্যে যদি ফলচাষের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে স্থানীয় চাষীরা আর্থিকভাবে বেশী উপকৃত হবে।

তোমাকে তোমার দেশ তথা সমগ্র বিশ্ব সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে। এদের সকলের রহস্যগুলো জেনে নাও। মাতৃভাষার জন্যে সংগ্রাম হচ্ছে নিজেদের মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম। প্রত্যেকে নিজের নিজের মাতৃভাষায় কথা বলবে আর তাদের বিকাশও করতে হবে। তোমরা দেশের কল্যাণ আর উন্নয়নের কাজ করতে করতে নিজের মাতৃভাষার উন্নতির জন্যেও চেষ্টা করে চলবে।

২১ এপ্রিল ১৯৮৯, কলিকাতা

চক্রনেমী (মাষ্টার ইউনিট)

প্রারম্ভিক অবস্থায় মাষ্টার ইউনিটগুলি শুরু করা হয়েছিল সমাজের সেইসব পশ্চাৎপদ ও দলিত শ্রেণীর ভাগ্যের উন্নতির জন্যে যারা এই উন্নতিশীল জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার সুযোগ পায় না। আনন্দমার্গ যখন জীবনের সকল দিককে স্পর্শ করতে শুরু করল তখন এটা ঠিক করা হয়েছিল যে আনন্দমার্গের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে মাষ্টার ইউনিটগুলি স্থাপিত হবে। শরীরের বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রগুলি যেরকম বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে ও নিজেরা মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই রকম এই মাষ্টার ইউনিটগুলি সমাজের স্নায়ুকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হবে। মাষ্টার ইউনিটগুলিতে আনন্দমার্গের সকল বিভাগ থেকে, সকল শাখা-প্রশাখা থেকে সক্রিয় প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ করতে হবে। যারা তা করতে ব্যর্থ হবে তাদের অস্তিত্বই থাকবে না।

আনন্দমার্গের এই ক্ষুদ্র সংস্করণগুলি (অর্থাৎ মাষ্টার ইউনিটগুলি) বিস্তৃত হতে থাকবে ও বৃহদাকার (maxiature form) ধারণ করবে ও সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। মাষ্টার ইউনিটগুলি তাদের সমস্ত রকমের সেবাকাজ বিস্তারিতভাবে করতে থাকবে, বিশেষ করে শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে। প্রথমে সকল মানবজাতির ও তারপর সকল জীবিত প্রাণীর সামগ্রিক উন্নতিকল্পে জাতপাত, গোষ্ঠী, বর্ণ, ধর্ম ও জাতি-সত্তা নির্বিশেষে কাজ করে যাবে। মানবতার ব্যাপারে কোনো কৃত্রিম ভেদ-বিভেদ থাকে না। শুধুমাত্র মানবতাই তার মূল বৈশিষ্ট্য।

মাষ্টার ইউনিট ও প্রাউটের মাধ্যমে আমরা কয়েকমাস বা কয়েক বৎসরের মধ্যে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অনেকটা উন্নত করে ফেলব। আমাদের অনতিবিলম্বে জনসাধারণের জন্যে সার্বিক সেবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাউটও এই সর্বাত্মক সেবা জীবনধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এগুলি সাময়িক সেবা। আমাদের আধ্যাত্মিক দর্শন এই জীবন ধারার ঊর্ধ্বে। [অর্থাৎ সামাজিক সেবা ও কর্ম সদা পরিবর্তনীয় কিন্তু অধ্যাত্ম দর্শন তা নয়]। কাজেই আধ্যাত্মিক দর্শনকে ভরকেন্দ্র

রেখে আমাদের যত বেশী সম্ভব মাষ্টার ইউনিট শুরু করতে হবে। সর্বাত্মক পরিষেবা, প্রাউট ও মাষ্টার ইউনিট জীবনের চলার পথ।

একটা আদর্শ মাষ্টার ইউনিটের কী কী প্রাথমিক আবশ্যিকতা রয়েছে? এর পাঁচটি প্রধান কার্যধারা রয়েছে যা কিনা প্রাউটের পাঁচটি ন্যূনতম প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রথমতঃ, উন্নত কৃষি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষির সাহায্যে সারা বৎসর ধরে খাদ্য ও পর্যাপ্ত স্থানীয় কাঁচামাল উৎপাদন করতেই হবে যাতে সারা বৎসর ধরে খাদ্য সরবরাহ করা যায়। আর এই কাঁচামাল বিভিন্ন শিল্প ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের মূল ভিত্তি হবে- যেমন ডেয়ারী ফার্ম, উদ্যান শিল্প, রেশম শিল্প প্রভৃতি। এই ধরনের শিল্পের জন্যে বাইরে থেকে আমদানী করা কাঁচামালের ওপর নির্ভর করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, বস্ত্র বয়নের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে আঁশ ও তন্তু জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঢ্যাঁড়স, আনারস, শর্করা বীট, কলা, তুলসী, তুলো, শন, শিসল গাছ বস্ত্র তৈরীতে ব্যবহৃত হতে পারে।

তৃতীয়তঃ, প্রাথমিক ও উত্তর-প্রাথমিক বিদ্যালয় সমস্ত মাষ্টার ইউনিটগুলিতে স্থাপন করতে হবে। এখনই উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার দরকার নেই।

চতুর্থতঃ, সাধারণ ও বিশেষ ঔষধালয় (medical units) স্থাপন করতে হবে। বিশেষ ঔষধকেন্দ্রগুলি কিছুদিনের জন্যে অক্ষম ও পঙ্গু লোকদের রাখবে কারণ মাষ্টার ইউনিটগুলি বড় হাসপাতাল চালাতে পারে আবার নাও চালাতে পারে। এই ঔষধালয়গুলিতে বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থায় জোর দিতে হবে।

পঞ্চমতঃ, মাষ্টার ইউনিটগুলিতে অতি দরিদ্র ব্যষ্টিদের জন্যে গৃহনির্মাণ প্রকল্প নিতে হবে। দরিদ্রদের জন্যে এই বিশেষ প্রকল্প অবিলম্বে নেওয়া দরকার।

পৃথিবীর [প্রতিটি দেশের] প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি ব্লকে মাষ্টার ইউনিট শুরু করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মাষ্টার ইউনিটগুলি আনন্দমার্গের বৃহত্তম সংরচনা হয়ে উঠবে। সব মাষ্টার ইউনিটগুলিই আনন্দনগরের এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ হবে। আর এগুলো হবে আনন্দমার্গীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র। মাষ্টার ইউনিট স্থাপনের জন্যে ন্যূনতম জমি লাগবে পাঁচ একর। মাষ্টার ইউনিটের সংস্কৃত নাম 'চক্রনেমী' যার অর্থ

হচ্ছে 'চক্রের প্রাণকেন্দ্র'। আমি চাই সমস্ত চক্রনেমীগুলি সর্বতোভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক কারণ অর্থের জন্যে অধ্যাত্মবাদীদের ধনী সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়।

কিছু সাধারণ বিষয় আছে যেগুলি চক্রনেমীতে রূপায়িত করতে হবে:

১। প্রাথমিক, উত্তর-প্রাথমিক ও উচ্চতর বিদ্যালয়,

২। নিম্ন, উচ্চ ও উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রাদের অনেকাবাসক (হোষ্টেল),

৩। ছোট ও বড় ছেলে-মেয়েদের জন্যে শিশুসদন ও ছাত্রসদন,

৪। ঔষধালয় (মেডিকেল ইউনিট),

৫। কুটীরশিল্প,

৬। দুগ্ধ উৎপাদন খামার (ডেয়ারী ফার্ম),

৭। বৃক্ষ রোপণ।

এই সব সাধারণ বিষয় ছাড়াও চক্রনেমীগুলিতে আরও কিছু বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে–

১। আটা তৈরীর জন্যে গমভাঙ্গা কল,

২। পাঁউরুটি তৈরীর জন্যে বেকারী (bakery),

৩। বীজভাণ্ডার,

৪। সুলভ ৰীজ বিতরণ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলি ভালজাতের বীজ সংগ্রহ করবে ও সুলভ মূল্যে সরবরাহ করবে। প্রতিটি ফসল কাটার শেষে স্থানীয় কর্ষকদের কাছ থেকে ৰীজ কেনা যেতে পারে, ৰাজার থেকেও কেনা যেতে পারে অথবা ৰীজ উৎপাদনও করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষকে এই কেন্দ্রগুলি সুলভ মূল্যে ভাল জাতের বীজ সরবরাহ অবশ্যই করবে।

বিতরণের জন্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বৃক্ষের চারা তৈরী করা হবে। প্রথমে, চারাগুলিকে দেড়ফুট পর্যন্ত বাড়তে দিতে হবে। তারপর, চারাগুলিকে উঠিয়ে সেগুলোর শিকড় আধঘন্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর, প্রতিটি চারাগাছের মূল শিকড়, গাছটির এক ইঞ্চি নীচে কেটে ফেলতে হবে, ও

তারপর বাকী শিকড় সহ চারাটিকে দশ মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর চারাটিকে কোনো জমিতে পুঁতে দিতে হবে অথবা বিতরণের জন্যে প্যাক করতে হবে। এইভাবে তৈরী হওয়া চারার গাছগুলি সাধারণ বীজের গাছ থেকে অনেক বড় ও মিষ্ট ফল দেবে।

অবশ্য কলম গাছের ফলের মত অত ভাল হবে না।

৬। রেশম চাষ ও সিল্কের কাপড় বয়নকেন্দ্র,

৭। জৈব-গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্র। এর অর্থ হচ্ছে এখানে ডেয়ারী-ফার্ম থাকতেই হবে। কচুরীপানাও জৈব-গ্যাস উৎপাদনের পক্ষে বেশ ভাল।

মাখন উৎপাদন, মৌমাছি পালন, একটি আদর্শ কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ফাম ট্রেনিং সেন্টার), একটি পরিবেশ সহায়ক কানন (sanctuary)।

আমাদের সমস্ত চক্রনেমীতে শুধুমাত্র জৈবসার যেমন পাতাসার, গোবর, নিমসার, নিম স্প্রে ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। কোনমতেই রাসায়নিক সার ব্যবহার করা চলবে না।

আমাদের চক্রনেমীগুলির কর্মসূচীতে মিশে থাকবে প্রাচ্যের মহত্তম ভাবনা ও পাশ্চাত্যের কর্মচঞ্চলতা।

অর্থনৈতিক শোষণের তিনটি রূপ

মার্কস্ উদ্বৃত্ত মূল্যসৃষ্টিকে শোষণের উৎস বলে ধরেছিলেন। মার্কসের মতে উদ্বৃত্ত মূল্যকে পুঁজিপতিরা আর্থিক মূল্যে রূপায়িত করে ও সেটাই মুনাফা হিসেবে সঞ্চিত হয়। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার দীর্ঘ বিশ্লেষণ করে মার্কস্ শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে মুনফাই হ'ল শোষণ। কারণ শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদিত সম্পদে শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা বা দাবীকে অস্বীকার করে ও তা থেকে তাদের বঞ্চিত করে ওই মুনাফা তৈরী করা হচ্ছে বলেই তা শোষণ। মার্কস্ উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টিকে বন্ধ করার মধ্যেই শোষণের উচ্ছেদ বলে মত প্রকাশ করেছেন। বিপ্লবোত্তর কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র রুশ, চীন, ভিয়েৎনাম সকলেই মার্কসের এই শোষণতত্ত্বকে পরিত্যাগ করেছে। তাদের মতে মুনাফা শোষণ নয় আর অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি রাষ্টীয়

সমৃদ্ধিরই এক অপরিহার্য অঙ্গ-এ রকম অভিমত তারা ব্যক্ত করেছেন। শোষণের সংজ্ঞা ও ব্যাখায় মার্কসের প্রচেষ্টাকে যদি প্রথম বলে ধরা যায় তবে সেই প্রচেষ্টাও গুরুতর ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। কারণ মার্কস্ শোষণকে শুধু অর্থনীতির দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন।

শোষণের ত্রুটিহীন সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ একমাত্র প্রাউটের দৃষ্টিকোণ থেকেই পাওয়া সম্ভব। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা হচ্ছে, একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত তথাকার জনগোষ্ঠীর দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশকে স্তম্ভিত করে', ওই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শ্রম ও মানসিক সম্পদের অবাধ লুণ্ঠনই হ'ল শোষণ। প্রাউট শুধু অর্থনৈতিক শোষণের কথা বলে না। প্রাউটের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়াও রয়েছে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শোষণ। অর্থনৈতিক শোষণেরও কয়েকটি পর্যায় বা ভাগ রয়েছে। যেমন-১। ঔপনিবেশিক শোষণ, ২। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও ৩। ফ্যাসিষ্ট শোষণ। এদের প্রত্যেকে সঙ্গেই প্রত্যেকের নীতিগত ও চরিত্রগত সাদৃশ্যের সঙ্গে বৈসাদৃস্যও আছে। ঔপনিবেশিক শোষণের ক্ষেত্রে শোষকরা

প্রথমে একটি বাজার দখল করে। তারপর ওই অঞ্চলের কাঁচামালগুলি একচেটিয়াভাবে তুলে নেয় ও নিজস্ব অঞ্চলের কলকারখানায় পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করে পুনরায় ওই বাজারেই সেগুলি বিক্রয় করে। এই ব্যবস্থার মধ্যে তারা দু'দিক থেকে সম্পদ লুন্ঠনের সুযোগ পায়। কাঁচামাল সংগ্রহ করার সময় তারা স্থানীয় অধিবাসীদের ঠকায় ও উৎপাদিত পণ্য সমাগ্রীকে পুনরায় ওই বাজারে ন্যায্য মূল্যের অধিক দামে বিক্রয় করে। ঔপনিবেশিক শোষকরা বাজারটিকে দখলে রাখার জন্যে স্থানীয় শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস বা পঙ্গু করে ফেলে।

ঔপনিবেশিক শোষণ

বাঙলার ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগটা ছিল ঔপনিবেশিক শোষণের যুগ। ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা বাঙলায় বিশাল অর্থনৈতিক বাজারটা দখল করার জন্যে সুপরিকল্পিতভাবে বাঙলার শিল্পগুলিকে ধ্বংস করে দিল, আর বাঙালী শিল্পী ও কারিগরদের ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের নির্মিত কলকারখানায় কাজ করতে বাধ্য করল। যারা বাড়িতে বসে কাজ করত, ব্রিটিশ পুঁজিপতি পরিচালিত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের থেকে

অঙ্গীকার আদায় করে নিত যে কারিগররা একমাত্র কোম্পানীর কাছ থেকেই কাঁচামাল কিনবে আর সেই কাঁচামাল থেকে উৎপাদিত পণ্য তারা কোম্পানীর কাছেই বিক্রী করবে। ব্রিটিশ কোম্পানী কাঁচামাল সংগ্রহ করত লুণ্ঠন করে ও জোর জুলুম করে। কারিগরদের কাছে ওই কাঁচামাল তারা বেশী দামে বিক্রী করত আবার কারিগরদের কাছ থেকে কেনার সময় তারা প্রকৃত মূল্যের এক এক চতুর্থাংশ দামে জোর করে নিয়ে নিত। আর কোম্পানী সেগুলি বিক্রয় করার সময়ে প্রকৃত মূল্যের অধিক নিত। **যেসব কারিগর এই শঠতায় আসতে চাইত না তাদের কোমরে দড়ি দিয়ে প্রকাশ্যে চাবুক মারা হত। ৰাঙলার তাঁতীরা ভবিষ্যতে কোনোদিন যাতে ম্যাঞ্চেষ্টারে উৎপন্ন শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে না পারে তার জন্যে তাঁতীদের বুড়ো আঙ্গুল কেটে তাদের শিল্প নৈপুণ্যকে চিরকালের জন্যে ধ্বংস করে দেওয়া হ'ল। এইভাবে তারা পলাশীর যুদ্ধের পর মাত্র ১০ বছরের মধ্যেই বাঙলার রেশম, সুতি, চীনী, লবণ, লোহা, রঙ, যন্ত্রপাতি, জাহাজ নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি সবকিছুকে ধ্বংস করে দিল।** যে সমস্ত অসংখ্য কারিগর বংশ পরাম্পরায় বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত

ছিল, তাদের নিজস্ব রুজিরোজগারের স্বাভাবিক পথ থেকে উৎখাত করে সকলকেই কৃষির দিকে ঠেলে দেওয়া হ'ল। **নীট ফল ছিয়াত্তরের ভয়াবহ মন্বন্তর।** এইভাবে ৰাঙলা হ'ল প্রধানতঃ কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ ও ইংল্যাণ্ডের উৎপন্ন দ্রব্য খালাসের এক বিশাল বাজার। **একেই বলে ঔপনিবেশিক শোষণ।**

স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩৪ বছর পরেও বাঙলা ও পৃথিবীর বুক থেকে ঔপনিবেশিক শোষণ মুছে যায় নি। বরং ভারতীয় পুঁজিপতিদের দ্বারা এই শোষণ আরও গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠেছে। বর্তমানে ভারতীয় পুঁজিপতিরা পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলিকে কাঁচামাল সরবরাহের উৎস বলে গ্রহণ করেছে। এই সমগ্র অঞ্চল থেকে ৰাঙলার খনিজ, কৃষিজ ও বনজ সম্পদগুলি ন্যায্য দামের অনেক কম মূল্যে পুঁজিপতিরা সংগ্রহ করে নেয় ও গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, রাজস্থান ইত্যাদি নিজস্ব অঞ্চলের কারখানা থেকে সেগুলিকে পণ্যদ্রব্যে রূপান্তরিত করে, পুনরায় তা দ্বিগুণ মূল্যে বাঙলার বাজারে বিক্রয় করে। বর্তমানে ৰাঙালীর উদয়াস্ত জীবনযাত্রার প্রতিটি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যই বাইরে থেকে উৎপাদিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাজারে।

আসে, অথচ সবগুলির উপকরণ ও কাঁচামাল জোগায় পশ্চিমবঙ্গ। ঠিক এই ব্যবস্থার পাশেই পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব শিল্পগুলিকে ধ্বংসপ্রায় ও পঙ্গু করে ফেলা হয়েছে যাতে পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত পণ্য কোনোক্রমেই ভারতীয় পুঁজিপতিদের নিজস্ব অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে না পারে। পঞ্জাব ও হরিয়ানাকে চর্মশিল্পের একচেটিয়া কেন্দ্র হিসেবে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু ওই দু'টি রাজ্যে পশুচর্ম মোটেই লভ্য নয়। তরাই, ডুয়ার্স ও সুন্দরবনের গভীর অঞ্চল থেকে কাঁচামাল হিসেবে পশুচর্ম সংগ্রহ করে তা থেকে নিজস্ব কারখানায় খেলার উপকরণ ও চর্মশিল্পের দ্রব্য উৎপন্ন করে, তা সমস্তই পশ্চিমবঙ্গের বাজারে আনীত হয়। পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব বাজারে কাড়ির জন্যে কোনো চর্মশিল্প কেন্দ্র নেই। বাটানগরে উৎপাদিত জুতার কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গে রেখে সবটাই বৈদেশিক বাজারে রপ্তানি করা হয়। খেলাধুলার সরঞ্জাম তৈরীর ক্ষেত্রে একই অবস্থা। পশ্চিমবঙ্গ এদের কাছে কাঁচামাল সরবরাহকারী 'পরদেশ' ও তাদের নিজস্ব অঞ্চলের উৎপাদিত সামগ্রীর খালাসের এক বিশাল বাজার। ওইসব ভারতীয় ঔপনিবেশিক শোষকদের জৈবিক মনস্বত্ত্ব হ'ল, 'পরদেশ মে

আয়া হ্যায়, যিন্না হো শকে লুঠলো।' বলাবাহুল্য ঔপনিবেশিক শোষণের সবটাই অর্থনৈতিক শোষণ।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণ

এরপরে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্ষেত্রে শোষকরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক শোষণের কাজে লাগায়। প্রকৃতপক্ষে ৰাঙলার ওপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যুগ শুরু হয়েছে মুঘল সম্রাট আকবরের যুগ থেকে। 'আইন-ই আকবরী'তে উল্লেখ আছে বাঙলাকে মুঘল বাহিনীতে ২৩,৩০১ সংখ্যক অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৯ সংখ্যক পদাতিক, ৪৪০০ সংখ্যক নৌকা, ৪২৬০টি কামান ও ১০৮টি হাতি জোগান দিতে হত। যুদ্ধে যে ক্ষয়ক্ষতি হত তা ৰাঙলাকে পূরণ করতে হত। বিশাল মুঘল বাহিনীকে রসদ যোগাত ৰাঙলা। যুদ্ধের ব্যয়-ভারের একটা বিপুল অংশ বাঙলার ঘাড়ে চাপানো থাকত। দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেবের মারাঠা দমনের জন্যে বিপুল যুদ্ধোপকরণের সমস্ত রসদ ও ব্যয় জুগিয়ে ছিল বাঙলা। ওই জোগান দিতে গিয়ে বাঙলার ঘরে ঘরে হাহাকার উঠেছিল। মুঘল সম্রাটের

শোষণের ফলে ৰাঙলায় বহুবার দুর্ভিক্ষ ও হাহাকার দেখা দিয়েছিল ও মুঘল সম্রাটরা স্থানীয় সামন্ত রাজগণের সাহায্যে ওইসব বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করে এসেছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ

মুঘলযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, সেই শোষণের প্রথম যুগটা ছিল খোলাখুলি লুঠতরাজের যুগ। ক্লাইভ নিজে মীরজাফরের কাছ থেকে বাৎসরিক ৩. লক্ষ টাকার জায়গীর ছাড়াও ২৩ লক্ষ টাকা নগদ নিয়েছিলেন। কোম্পানী ও কর্মচারীরা নিয়েছিল ৩ কোটি টাকা। এ ছাড়াও দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রাসাদ-সম্পদ লুণ্ঠন করে ব্রিটিশরা বিপুল পরিমাণ টাকা লুঠ করেছিল। ক্লাইভ যখন ভারত ত্যাগ করল তখন এক বিপুল পরিমাণ অর্থ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পরিপূরক হ'ল রাজনৈতিক শোষণ। ব্রিটিশদের রাজনৈতিক শোষণ শুরু হয় বাঙলার বৃহত্তম সীমাকে টুকরো বিচ্ছিন্ন করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে বাঙালী জনগোষ্ঠীর মূল সংখ্যাকে কমিয়ে ফেলার মধ্য

দিয়ে। যে অঞ্চলগুলি বিচ্ছিন্ন করে সংলগ্ন রাজ্যগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হ'ল, সেইসব অঞ্চলের জাতীয় সম্পদগুলির অধিকার থেকেও বাঙলার জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করা হ'ল। ওইসব অঞ্চলের বাঙালীরা কয়েক পুরুষ পরেই অৰাঙালী বলে বাঙলার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ভারত ভূখণ্ডের অন্য কোথাও ব্রিটিশরা 'ভাগ কর ও শাসন কর' এই নীতি প্রয়োগ করেনি। বাঙলায় অর্থনৈতিক শোষণকে চিরস্থায়ী করতে ব্রিটিশরা রাজনৈতিক অত্যাচারের পন্থা নিয়েছিল।

বাঙলার মানুষ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যষ্টিদের স্বেচ্ছাচারিতায় অভ্যস্থ ছিল, কিন্তু এমন ধরনের কোনো ব্যবস্থাই তারা প্রত্যক্ষ করেনি যা কিনা তাদের ব্যবসায়, বাণিজ্য রুজিরোজগার ও জীবনধারাকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

এ সবেরই নীট ফল হ'ল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর–যাতে কয়েকদিনের মধ্যেই বাঙলার শিল্পী–কারিগর ও কর্ষক মিলে প্রায় এক কোটি লোক ধ্বংস হয়ে গেল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মাত্র ২০ বছরের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করে বাঙলার তুলা, রেশম, বস্ত্রবয়ন, চীনী, লবণ, লোহা, যন্ত্রপাতি, রঙ, জাহাজ

শিল্প সবকিছুকে ধ্বংস করল। চিরকালের বিখ্যাত বস্ত্রশিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ও দুই লক্ষ মানুষের সমৃদ্ধশালী শহর ঢাকার জৌলুস নষ্ঠ হয়ে গেল। ঢাকার জনসংখ্যা দাঁড়াল ৪০ হাজার। শিল্প থেকে উৎখাত হয়ে বেকায় কারিগররা ঢাকা ছেড়ে জীবনধারণের প্রয়োজনে গ্রামগঞ্জে গিয়ে কৃষিকার্যকে আঁকড়ে ধরল। এরা জমিহীন ক্ষেতমজুর হিসেবে কৃষিতে গিয়ে ভিড় করল। এইভাবেই শিল্পনগরী মুর্শিদাবাদ, পাণ্ডুয়া ও অন্যান্য শহরগুলির সমৃদ্ধি ম্লান হয়ে গেল। শিল্পপ্রধান বাঙলার গ্রামগঞ্জে অসংখ্য বেকার সৃষ্টি হ'ল। তারা সকলেই গিয়ে ভিড় করল কৃষিক্ষেত্রে।

বাঙলার শিল্পগুলিকে পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করার পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ বাঙলার কৃষিক্ষেত্রেও প্রবেশ করল। ১৭৭৯ সাল থেকে ব্রিটিশ শোষকরা জোর করে বাঙলার চাষীদের দিয়ে ধানী জমিতে নীলচাষ শুরু করালো। ইউরোপে তখন রঙের বিপুল চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু নীলচাষ করা জমিতে পরের ২/৩ বছর ধানচাষ করা যায় না। চাষীরা এই ক্ষতি-স্বীকার করে নীলচাষ করতে অস্বীকার করল। ফলে তাদের ওপর নেমে এলো ভয়াবহ অত্যাচার, পীড়ন ও হত্যা।

প্রায় আশি বছর ধরে একটানা অত্যাচার-শোষণ ও বাঙলার চাষী বিদ্রোহের পটভূমিতে নীলচাষ পরিত্যক্ত হ'ল। নীলচাষের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশদের লক্ষ্য পড়ল ৰাঙলার পাট ও চায়ের ওপর। বাঙলা থেকে অর্থ সংগ্রহের প্রধান উপায় হিসেবে তারা এই দু'টি কৃষিজ পণ্যকে প্রধান অবলম্বন করল।

১৭৯৩ সালে লর্ড ডালহৌসী 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' মারফৎ বাঙলার গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থায় ইংল্যান্ডের প্রাচীন ক্ষয়িষ্ণু ও পচনশীল জমিদারতন্ত্রের এক নকল ব্যবস্থাকে কায়েম করলেন। এই ব্যবস্থায় জমিদারকে জমির প্রকৃত মালিক তৈরী করে তার হাতেই প্রচুর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দান করা হ'ল। খেয়ালখুশীমত জমির খাজনা নির্দ্ধারণ, কর্ষক উচ্ছেদ, কর্ষকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোক, কৃষকের বিচার ও প্রয়োজনে হত্যা করার অধিকারও জমিদারকে দেওয়া হয়েছিল। এ সবের বিনিময়ে জমিদারকে শুধু বছরের শেষে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ব্রিটিশ সরকরের কাছে পৌঁছে দিতে হত। সেই টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেজারিতে না পৌঁছালে জমিদারের জমিদারী নিলাম হয়ে যেত। কোনো জমিদারই চাইত না তার জমিদারী নিলাম হোক। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি বা অন্যান্য

প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত যে-কোনো অবস্থাই হোক-না-কেন কর্ষককে খাজনা অর্থমূল্যে শোধ করতেই হত। জমিদারদের লক্ষ্য থাকত সরকারী পাওনার ওপর মুনাফা তোলার। কিন্তু তার পক্ষে দূর-দূরান্তে গিয়ে সাক্ষাৎ ভাবে খাজনা আদায়ের অসুবিধা ছিল। জমিদার লোক মারফৎ খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা চালু করল। সেই লোক আবার আর এক শ্রেণীর ওপর খাজনা আদায়ের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত রইল। এইভাবে জমিদার ও কর্ষকের মাঝখানে প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশী স্তর তৈরী হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক স্তরই পরবর্তী নিম্ন স্তর থেকে যা সংগ্রহ করত তার কিছুটা নিজের জন্যে রেখে বাকীটা তার ওপরওয়ালাকে দিত, আর এই ভাবে স্তর পরম্পরায় সমস্ত ভারটা গিয়ে পড়ত কর্ষকদের ওপর। মধ্যস্বত্বভোগী ওইসব দালালরা কর্ষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত কিন্তু কোনো রসিদ দিত না। ফলে কর্ষকদের শোষণ ও লুণ্ঠনের সীমা ছিল না। আর ওই ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাঙলার কর্ষককুল দারিদ্র্যের সর্বশেষ স্তরে নেমে আসছিল।

কর্ষকদের অভাবের সুযোগ নিয়ে জমিদার ও তাদের দালালরা ছাড়াও অন্য আর এক প্রকারের শোষক গোষ্ঠীর

উৎপত্তি হ'ল। এরা চড়া সুদে ঋণ দিত। কর্ষক জমি বন্দকী রেখে ঋণ নিত। বন্দকী জমির অধিকাংশই কর্ষক ছাড়াতে পারত না। জমি মহাজনের কবলিত হত। কর্ষক জমি হারিয়ে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হ'ল। শুধু বাঙলাতেই এক বিপুলসংখ্যক কর্ষক ভূমিহীন মজুরে রূপান্তরিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসানের পর ১৯৪৭ সালে বাঙলা বিভাগের মধ্য দিয়ে এল ভারতীয়-সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যুগ। স্বাধীনতা লাভের প্রথম পর্বে ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গ ছিল ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে সবচেয়ে বেশী অগ্রসরমান রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক আয় ছিল অন্যান্য রাজ্যের আঞ্চলিক আয় অপেক্ষা বেশী। বহু বাঙলার শিল্পপতি তখনও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে বিরাজ করত। বহিরাগত শোষকেরা তাদের পরিকল্পনা মাফিক পশ্চিম বাঙলার শিল্প ও বাণিজ্যের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে থেকে বাঙলার শিল্পপতিদের উৎখাত করতে শুরু করে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলা-বঞ্চনার কাজ নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক শুরু হয়ে যায়। স্বাধীনতা লাভের পরে পরেই পাটের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজমি পাটচাষের জমিতে রূপান্তরিত হয়ে

গেল। এর ফলে চাষীরা দু'দিক থেকে মার খেল। ধানজমি থেকে তাদের আয় বন্ধ হয়ে গেল। অন্য দিকে পাটের উৎপাদন খরচ বা বাজারদরও বাঙালী চাষীরা পেল না। বহিরাগত শোষকেরা কিন্তু দু' তরফা লাভ করল। এক, সমুদয় পাট তারা বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রার সবটুকু আত্মসাৎ করল। আর দুই, নিজস্ব এলাকায় উৎপন্ন অপ্রয়োজনীয় ধান তারা পশ্চিমবঙ্গে ঠেলে দিল। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে মোট আশিটি পাটকল। ওই সমুদয় পাটকলগুলির মালিক হ'ল বহিরাগত পুঁজিপতি। এরা কোটি কোটি টাকার মুনাফা অর্জন করত। কেন্দ্রীয় সরকার বাঙলার পাট বিদেশে রপ্তানী করে বছরে আয় করে কোটি কোটি টাকা আর পাটজাত দ্রব্যের ওপর নানাবিধ ট্যাক্স, শুল্ক ইত্যাদি বাবদ আয় করে আরও অনেক কোটি টাকা। কেন্দ্রের কুড়ি শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা আসে ৰাঙলার পাট থেকে। ৰাঙলার পাট চাষীরা তাদের উৎপাদিত সম্পদ থেকে তাদের পরিশ্রমের ফসল থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। পশ্চিমবঙ্গও তার নিজস্ব সম্পদ থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বিন্দুমাত্র লভ্যাংশও পায় না। কেন্দ্রীয় সরকার কম দামে মহারাষ্ট্র-গুজরাটকে তুলা বিক্রয়

করে। বাঙলার চাষীদের তার চেয়ে অনেক বেশী দামে কিনতে হয়। ফলে ৰাঙলার সুতি ও তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন খরচ বেশী পড়ে। চীনীর ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। বাঙলার খনিজ সম্পদ লোহা, কয়লা ইত্যাদি যখন অন্য রাজ্যে বিক্রী করা হয় তখন ৰাঙলাকে বিনালাভে তা দিতে হয় কিন্তু অন্য রাজ্য থেকে ৰাঙলাকে তেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে হলে অধিক মূল্য দিতে হয়।

বহিরাগতদের শোষণে বাঙলার ৯০ শতাংশ মানুষ আজ দারিদ্র্য সীমার নীচে নেমে এসেছে। বাঙলার অর্থনৈতিক কাঠামো আজ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ৰাঙলা থেকে প্রতিদিন গড়ে ১০ কোটি টাকা বহিরাগত শোষকদের মারফৎ ৰাঙলার বাইরে চলে যাচ্ছে। ৰাঙলার নিজস্ব শিল্প-উদ্যোগগুলি আজ প্রায় নির্মূল। ব্যবসা-বাণিজ্য সমেত বাঙলার গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলগুলিও বহিরাগত শোষকদের হাতে। বাঙলার এক কোটিরও বেশী কর্মক্ষম যুবক কর্মহীন, অন্যদিকে চাকুরী ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ লোককে বাঙলার বাইরে থেকে আনা হয়।

ফ্যাসিষ্ট শোষণ

আর্থিক শোষণের চূড়ান্ত ও ভয়াভয় রূপ হ'ল ফ্যাসিষ্ট শোষণ। সাম্রাজ্যবাদী শোষকরা তাদের শোষণকে যুক্তি ও তথ্যের ওপর দাঁড় করানোর জন্যে প্রথমেই তারা জাতীয় সমর্থন আদায় করতে সচেষ্ট হয়। এর জন্যে তারা একটা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। সেই তত্ত্ব হ'ল জাতীয়তাবাদের। জাতীয়তাবাদের সেন্টিমেন্ট দিয়ে তারা তাদের শোষণকে যুক্তিসিদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিক বলে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি তার শোষণকে যুক্তিসিদ্ধ করার প্রয়োজনে জাতিতত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছিল। ব্রিটিশের অনুসরণ করে ইতালীর মুসোলিনী, জার্মানীর হিটলার একই পথে অগ্রসর হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হ'ল তখন সোভিয়েৎ রাশিয়ার' নেতা যোসেফ স্ট্যালিন 'দাস-জাতি'র একনায়ক তন্ত্রের তত্ত্বকে প্রচার করলেন। তেমনি আবার কম্যুনিষ্ট চীনের নায়ক মাও সে-তুঙও ছিলেন 'চীনা-জাতিতত্ত্ব'। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ফ্যাসিষ্ট শক্তিতে রূপান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শোষিত জনগোষ্ঠীর ওপর মানসিক, সাংস্কৃতিক শোষণের জাল বিস্তৃত হয়। প্রধানতঃ

অর্থনৈতিক শোষণকে বাধাহীন ও চিরন্তন করার প্রয়োজনেই মানসিক শোষণ শুরু হয়, তাই একে এককথায় 'মানসিক-অর্থনৈতিক শোষণ' বলা চলে।

ফ্যাসিষ্ট শোষকরা তাদের শোষণের সুবিধার জন্যে প্রথমেই প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ একটি দুর্বল জনগোষ্ঠীকে বেছে নেয়। ফ্যাসিষ্টদের ক্রুরদৃষ্টি যে জনগোষ্ঠীর ওপর নিবদ্ধ হবে সেই জনগোষ্ঠীকে তারা প্রথমেই চেষ্টা করবে তাদের নিজস্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে উৎখাত করতে। এই প্রয়োজনে ফ্যাসিষ্ট শক্তি সর্বদাই ওই জনগোষ্ঠীর ওপর অন্যতর এক ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে চাপিয়ে দিতে চায়, যার ফলে ওই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যষ্টি মানস সহজে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, তার মধ্যে এক ধরনের পরাজিত মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে। ওই পরাজিত মনোভাব তার তেজকে, সংগ্রামশীলতাকে ধ্বংস করে' তার মানসিকতাকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে ফেলে। তীব্র অর্থনৈতিক শোষণের জন্যে ফ্যাসিষ্টরা ওই পটভূমিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করে। ফ্যাসিষ্ট শোষণের প্রধান লক্ষ্য হ'ল প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুণ্ঠনের

জন্যে প্রয়োজনে একটি জনগোষ্ঠীকে ইতিহাসের বুক থেকে বিলুপ্ত করে দেওয়া।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সময় দুর্ভাগা ৰাঙলার জনসাধারণ ফ্যাসিষ্ট ব্রিটিশদের এই ক্রুর মানসিক শোষণে শিকার হয়েছিল। মানসিক শোষণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা প্রধানতঃ তিনটি পদ্ধতিকে আশ্রয় করেছিল। ব্রিটিশবিরোধী মুক্তি সংগ্রাম, বিদ্রোহ –বিপ্লবে ব্যতিব্যস্ত ব্রিটিশ শোষক বাঙালীর মানসিকতা ও প্রাণশক্তি ধ্বংস করার জন্যেই মানসিক শোষণ শুরু করেছিল। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ৰাঙালী জনগোষ্ঠীর মূল সংখ্যাকে কমিয়ে ফেলার জন্যে ৰাঙলাকে খণ্ড বিচ্ছিন্ন করে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে যুক্ত করে দিল। সেখানে ৰাঙালী জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাঙলার মূল জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।এখনও একই নীতি অনুসৃত হচ্ছে। উদ্বাস্তু নীতিতেই পুঁজিপতি ফ্যাসিষ্টদের কুৎসিত শোষণকামী মনোভাবটা ধরা পড়ে গেল। ১৯৪৯ সালের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সুসম্পন্ন করে ফেলল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি প্রয়োগ

করা হ'ল। ৰাঙালী উদ্বাস্তু সমস্যাকে এখনও বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাস, সামর্থ্য ও কঠিন পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে বিপুল সংখ্যক ৰাঙালী উদ্বাস্তু ত্রিপুরা, বিহার, অসম ও ওড়িষ্যায় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করে চলেছে। ১৯৮১ সালেও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরের পথে পথে অসহায় সম্বলহীন ভবঘুরের মত আশ্রয় ও জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ৰাঙালী উদ্বাস্তু।

ৰাঙালী জনগোষ্ঠীর মূল সংখ্যাকে কমিয়ে ফেলার সঙ্গেই রয়েছে তাদের প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা। মানসিক শক্তি বিকাশের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হল ভাষা-সাহিত্য। তাই আপন ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে উৎখাত করার চেষ্টা হ'ল মানসিক শোষণের এক বিশেষ পদ্ধতি। সমগ্র পূর্ব ভারত জুড়ে বাঙলার জনমানসের ওপর এই সাংস্কৃতিক অন্যায় অবাধে চলছে। ৰাঙালীর জাতীয় চরিত্রের নৈতিকতা ও দৃঢ়তাকে শিথিল করার জন্যে রাজ্যের সর্বত্র মদ, জুয়া, আফিং, সাট্টা, গাঁজা, চরস, পতিতালয়, ক্যাবারে ইত্যাদি দূষিত ক্ষতের মত ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে ৰাঙলা জুড়ে দুষ্ট ক্ষতের মত

ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যৌন আবেদনমূলক অপরাধ প্রবণ চলচ্চিত্র ও অশ্লীল সাহিত্যের বিপুল প্রচার।

বাঙলার কারখানায় ও গ্রামীণ উৎপাদনক্ষেত্রে চলছে চরম পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সর্বশেষ উচ্ছিষ্ট হিসেবে এখনও জোতদাররা গ্রামে তাদের শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের পাশেই জায়গা করে নিয়েছে পুঁজিপতিরা ও বেনামে বিপুল জমির মালিকেরা। যে সব ভূমিহীন কর্ষক জমিতে সারা বছর খেটে বেঁচে থাকতে চায় তাদের অস্তিত্ব ও সামাজিকী নিরাপত্তার সবটুকু নির্ভর করে জোতদারের খেয়াল-খুশির ওপর। জোতদার যে কোনো সময়েই নিজে হাতে জমি চাষ করার অজুহাতে চাষীর কাছ থেকে জমি কেড়ে নিতে পারে।

জোতদারদের পাশেই ক্ষুধিত নেকড়ের মত ওৎ পেতে থাকে মহাজনরা। পশ্চিম বাঙলার প্রতিটি গ্রামগঞ্জে এরা ঢুকে পড়েছে। যেখানে ঢুকতে পারেনি সেখানে তাদের দালালরা সক্রিয় রয়েছে। সুদখোর মহাজনদের সঙ্গে জমির কোনো সম্পর্ক নেই। এরা দুঃস্থ চাষীদের চড়া সুদে দাদন দেয়। চাষ শুরু করার আগে চাষের প্রাথমিক উপকরণ গরীব চাষীদের

থাকে না। তাই তারা মহাজনের কাছ থেকে 'দাদন' নিতে বাধ্য হয়। মহাজন চাষীকে ১০০ টাকা দাদন দিলে চাষীকে সুদ সমেত ২০০ টাকা ফেরৎ দিতে হয়। কিন্তু মহাজন ২০০ টাকা নগদ অর্থে ফেরৎ নেয় না। সে অর্থের পরিবর্তে ফসল কাটার সময় অত্যন্ত কম দামে ২০০ টাকার ধান- আলু চাষীর কাছ থেকে আদায় করে। চাষী এই ব্যবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য থাকে। এই ব্যবস্থা মারফৎ চাষী দু'দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথমতঃ, দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ সে সুদে-মূলে শোধ করতে বাধ্য থাকে। আর দ্বিতীয়তঃ, ফসলের সময় তৎকালীন ধানের বাজার-মূল্য দিয়েই পরিশোধ্য ধানের পরিমাণ হিসাব করা হয়। কিন্তু সেই সময় ধানের বাজার-মূল্য সস্তা থাকে। সমস্ত ব্যাপারটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় মধ্যবর্তী দালাল মারফৎ যারা নিজেরাও লভ্যাংশ রাখে। এইভাবে বাঙলার কর্ষক সম্প্রদায় যে ধান উৎপন্ন করে, মহাজনের ঋণ পরিশোধ করতে করতে সমুদয় উৎপাদিত খাদ্য চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। বাকি সাত-আট মাস তাকে বেঁচে থাকার জন্যে পুনরায় মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয় কারণ বাকি মাসগুলি চালাবার মত সঙ্গতি কোনো কর্ষক

পরিবারেরই থাকে না। প্রথমে ঘটিবাটি বন্ধক দেওয়া শুরু হয়, তারপর চাষের জমি মহাজনের হাতে তুলে দিতে হয়। সুদে-আসলে চাষীদের ঋণ বাড়তে থাকে, ও এমন এক অবস্থায় পৌঁছায় যখন ঋণের পরিমাণ বন্ধকী জমির বিক্রয়মূল্যের সমান হয়ে যায়। এই অবস্থায় মহাজন চাষীর কাছ থেকে জমি কেড়ে নেয়। চাষী পরিবার সমেত জমি থেকে উৎখাত হয়ে প্রথমে গ্রামগঞ্জে, তারপর শহরের ফুটপাতে ভিখারি হিসেবে ভিড় জমায়।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হ'ল দালাল বা ফড়িয়ারা। এরা বাঙলার কর্ষককুলের দারিদ্র্য ও অভাবের সুযোগ নিয়ে কর্ষককুলকে উপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমশঃই পুঁজিপতি নির্ভর করার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে পুঁজিপতিদের প্রধান কর্মকেন্দ্র কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে এদের শাখা কর্মকেন্দ্র আছে। উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি, বীরভূমের সাঁইথিয়া, পুরুলিয়া জেলার পুরুলিয়া সদর ও মেদিনীপুর শহর হ'ল অবাঙ্গালী পুঁজিপতিদের প্রধান কর্মকেন্দ্র। এই ক'টি কেন্দ্র থেকে দালাল মারফৎ তারা পশ্চিমৰাঙলার সমগ্র গ্রামীণ অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

চাষীরা শুধু চাষের উপকরণের জন্যেই নয়, উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের জন্যেও ওইসব দালালদের ওপর অসহায়ভাবে নির্ভর করে থাকে। এই দালালরা এই সুযোগকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগায়। অনেক সময় সরল-অশিক্ষিত চাষীদের অক্ষর জ্ঞানহীনতার সুযোগ নিয়ে কম টাকা দিয়ে বেশী টাকার পাশে সই করিয়ে নেয়।

ভারতের সমাজ হ'ল পুঁজিতান্ত্রিক। কিন্তু এর প্রশাসন ব্যবস্থা হ'ল বৈশ্যশাসিত গণতান্ত্রিক। ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতি ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করছে পুঁজিপতিরা। ভোটের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা যে সরকার গঠন করেন সেই সরকারের সামনে প্রশাসন যন্ত্রে টিকে থাকার প্রশ্নটিই সবচেয়ে মারাত্মক রূপে দেখা যায়। সেই চেষ্টার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যটা মুখ্য স্থান পাওয়ায় সরকার যে আইন প্রণয়ন করে তাতে পুঁজিপতি ও শোষকদের স্বার্থই রক্ষিত হতে থাকে। আইনরক্ষার বেনামীতে শোষকদের স্বার্থই রক্ষিত হতে থাকে। আইন রক্ষার বেনামীতে শোষকদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব বর্তায়

আমলাতন্ত্র ও পুলিশের ওপর। রাজনৈতিক নেতারা সেই স্বার্থের ভাগীদার হবার জন্যে খেয়োখেয়ি করে।

মহাজনী শোষণ, কলুষিত রাজনীতি, দারিদ্র্যের অভিশাপ, দীর্ঘদিন বহন করতে করতে বাঙলার কর্ষককুল আজ নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে নেমে এসেছে। যেকোনো মূল্যে এর কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করার দায়িত্ব আজ ৰাঙলার কর্ষককুলকেই নিতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এর জন্যে পথ কী? চরম রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথই কি মুক্তির একমাত্র অভ্রান্ত দিক নির্দেশিকা? না অন্য কোনো উপায় আছে? আমার মনে হয় শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়ে শক্তি সম্প্রয়োগের পথকে এখনও পরিহার করা যেতে পারে। তার জন্যে নিম্মলিখিত আবশ্যকতাকে পূরণ করতে হবে।

প্রথম, এখনই কেন্দ্রীয় অর্থনীতি ব্যবস্থাকে বাতিল করে বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি (decentralized) ব্যবস্থার পত্তন করা ও ব্লকভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে ভিত্তি করা যার মধ্যে গ্রাম-উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বন্ধের এটি অমোঘ বিধান।

দ্বিতীয়, অর্থনীতির সর্বস্তরে সমবায় ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো যাতে শ্রমিক- কৃষকের উৎপাদিত সামগ্রীর ওপর খবরদারী করার কেউ না থাকে।

তৃতীয়, মহাজনী শোষণ বন্ধের জন্যে অবিলম্বে মহাজনী দাদন ব্যবস্থাকে বাতিল করে ব্যাঙ্ক মারফৎ কর্যকদের অগ্রিম ঋণদান ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

চতুর্থ, সব রাজ্যেই অস্থায়ী বাসিন্দাদের অর্থাৎ ফ্লোটিং পপুলেনকে এখনই স্থায়ী বা সেটেলড্ হতে হবে অথবা সেই রাজ্য ছাড়তে হবে। দু'টোর যে-কোনো একটাকে বেছে নিতে হবে।

সর্বশেষে একটা কথাই বলতে চাই ইতিহাসের অগ্রগতির চাকাকে কেউ পিছনের দিকে ঘোরাতে পারে না, ভবিতব্যের দুর্বার স্রোতকেও কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। মানুষের উন্নত শুভবুদ্ধিই সকল মানবীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান।

ৰাঙলাৰ কয়েকটি অঞ্চলেৰ উন্নয়ন সম্পর্কে কিছু বক্তব্য

সমতট

প্রাচীন ৰাঙলা পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল- রাঢ়, সমতট, ৰঙ্গ, বরেন্দ্র ও মিথিলা। মিথিলা বর্তমানে বিহারের অঙ্গীভূত।

বঙ্গোপসাগরের বিশাল উপকূল এলাকা যাতে কোনো পাহাড়-পর্বত নেই কিন্তু যা পদ্মা ও ভাগীরথী নদীর বালুযুক্ত দোয়াঁশ মাটি দিয়ে তৈরী, ও যার মধ্যে অজস্র জলাশয়, যা খাল-বিল আর শাখানদীতে সমৃদ্ধ, সংস্কৃতে সেই অঞ্চলকে বলে 'সমতট', কথ্য ৰাংলায় বলে 'বাগড়ী'। এই অঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদ আর সমৃদ্ধ কৃষিসম্পদে পূর্ণ। এইজন্যে সমতটকে বলা হত "সোণার বাঙলা”, যে কারণে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন– "সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং মাতরম্”।

স্বাস্থ্য, সম্পদ, বাচনিকতা আর সরলতায় পূর্ণ এই সমতটের অধিবাসীরা 'সোণার মায়ের' 'সোণার সন্তান'। কিন্তু এই কারণেই আবার এই সোণার সন্তানেরা সর্বদা অপরাজেয় জাতি হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। গত ৫০০০ বছর ধরে সমতটের বাঙালীরা দুর্ধর্ষ ও অসম সাহসিক নৌবিদ্যায় পারদর্শী বলে কথিত হত। সমতটের মানুষরা এই আখ্যায় আখ্যায়িত হবার সম্পূর্ণ যোগ্য। মুঘল সম্রাট আকবর বাধ্য হয়ে এদের যুদ্ধ ক্ষমতাকে সম্মান করতেন, এমনকি ব্রিটিশ সরকার এদের যুদ্ধ নিপুণতাকে ভয় করত। তাই 'সাম্প্রদায়িক রোঁয়েদাদ' প্রয়োগ করে বাঙলাকে দু'টুকরো করা হ'ল, আর এইভাবে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটা বিভেদ রেখা তৈরী হয়ে গেল।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত পুঁজিপতিরা বাঙলার বুকে নিরন্তর অপশাসন ও শোষণ চালিয়ে এসেছে। সমতটের প্রচুর কৃষিজ সম্পদ, বন সম্পদ আর জল সম্পদ এই নব্য ঔপনিবেশবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে শোষিত

হয়ে এসেছে। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ৩৬% এই সমতটের প্রাকৃতিক সম্পদ থেকেই আসে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এর এক শতাংশও স্থানীয় এলাকার উন্নয়নের জন্যে ব্যয়িত হয় না। সমতটের গ্রামীণ অর্থনীতি বহিরাগতদের দ্বারা চরমভাবে শোষিত। সমতটের জনসংখ্যার ৬০% অত্যন্ত দরিদ্র, তারা অশিক্ষিত, অপুষ্টি ও বেকারীর শিকার। এই অঞ্চলের ৭৭% কেবলমাত্র কৃষির সঙ্গে যুক্ত, আর যেহেতু এই বিপুলসংখ্যক মানুষ অনুন্নত কৃষির ওপর নির্ভরশীল, তাই তারা দ্রুত আর্থিক বিনষ্টির দিকে চলেছে। মার্ক্সবাদীরা সমতটের এই আর্থিক দুর্দশা আর অসহায়তাকেই তাদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে সমতটের জাতীয় সম্পদ আর শ্রম সম্পদ স্থানীয় জনসংখ্যার কল্যাণের জন্যে কাজে লাগানো হয়নি। বরং তা বহিরাগতদের নিহিত স্বার্থপূর্তির জন্যে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। সমতটের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে কোনো সরকারই কোনো আর্থিক পরিকল্পনা তৈরী করে নি। আর গরিবদের তথাকথিত 'বন্ধুরা' পুঁজিপতি আর সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করতে চায় না। তাই এক

সময়ের অপরাজেয় শক্তি এই সমতট, বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েও, পুঁজিপতি আর কম্যুনিষ্ট শোষণের কবলে পড়ে দ্রুত আর্থিক ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে।

প্রতি বছর যথেষ্ট কৃষি উৎপাদন হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মানুষ দু'বেলা অন্নের জন্যে মাথা চাপড়ায়। দীর্ঘ সময় যাবৎ তাদের এই দারিদ্র্যের কারণে জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশকে রাস্তায় ভিক্ষা করতে হয়। নিজেদের দলগত স্বার্থ শক্ত করতে রাজনীতিবিদরা গ্রামের মানুষদের জন্যে 'অন্নের জন্যে কাজ' প্রকল্প চালু করেছে। ছাত্র ও যুবকদেরও এই প্রকল্পে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার এক নির্দিষ্ট অংশকে ও দরিদ্র জনসাধারণকে বেকারী ভাতার নামে 'ইজম্'-এর নামে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। তারা মানুষকে শারীরিক ও আর্থিক কাজে নিয়োজিত রাখছে, আর এইভাবে এতদিন পর্যন্ত সমাজে বিপ্লবের মানসিকতাকে আটকে রেখেছে।

সমতটকে এই রকমের অসামাজিক আর অমানবিক শক্তির কাছে নতি স্বীকার করতে দেওয়া উচিত নয় আর এই অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি চলতে দেওয়াও উচিত নয়। সমতটের মানুষকে এইসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। মহাপ্রভু

চৈতন্য, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, বাঘাযতীন, আর সুভাষচন্দ্রের সমতটকে আর তার গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে এই অবলুপ্তির পথে ঠেলে দেওয়া যায় না। বাঙলার কোনো মানুষই এটা হতে দিতে চাইবে না। তাই সমতটের মানুষকে আজ জেগে উঠতে হবে ও বাস্তব সত্যকে বুঝতে হবে, আর আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্যে তাদের নিজে থেকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের মিলিতভাবে দাবী করতে হবেঃ "আমরা সমতটের চৌদ্দ কোটি ৰাঙালী একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলব। আমরা মিলিতভাবে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্তি করব। আমরা এক শোষণমুক্ত ৰাঙলা চাই। আমরা চাই এক স্বনির্ভর সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চল যার নাম 'ৰাঙালীস্তান'।"

১৯৮৪, কলিকাতা

বৃহত্তর ৰাঙলা

প্রায় ৫০০০ বছর আগে অস্ট্রিক, মঙ্গোলিয়ন আর নিগ্রো রক্তের সংমিশ্রণ-জাত ৰাঙালী জনসমুদায় সৃষ্টি হয়েছিল। সেই

সময় ৰাঙলার ভাষা ছিল সংস্কৃত, তাই ৰাংলাভাষারও পথনির্দেশক ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত। প্রায় ১২০০ বছর আগে ৰাংলাভাষার এক রূপান্তরণ হয়েছিল। সেই সময় ৰাঙলা বলতে বোঝাত বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গ, নেপালের ঝাপা জেলা, বিহারের পূর্বাংশ, সম্পূর্ণ ৰাঙলাদেশ আর বর্মা, মেঘালয়ের সমতল অংশ, প্রাগজ্যোতিষপুরের কিছু অংশ আর অসমের বরপেটা, কামরূপ ও নগাঁও। বৃহত্তর বাঙলার এই ছিল এলাকা। আজ ৰাঙালী বলতে বোঝায় দুই প্রকারের অভিব্যক্তি- ভারতীয় ৰাঙালী আর বাঙলাদেশী ৰাঙালী। এই দু'য়ের মধ্যে একটা সংহতিকরণ বা মিশ্রণ অবশ্যই হওয়া উচিত।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ভারতীয় নেতাদের মূর্খতার কারণেই ৰাঙলাদেশের সৃষ্টি। অসম ও মেঘালয়কে তারা এইভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে। বৃহত্তর ৰাঙলা আজ নানা অংশে বিভাজিত হয়ে গেছে, আর এই পরিস্থিতি চলতে দেওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে ৰাঙলার অধিবাসীদের মধ্যে অনৈক্য। তাই এই সমস্যার সমাধানের জন্যে ৰাঙালী জনসাধারণের মধ্যে একতা অত্যন্ত জরুরি। লর্ড কার্জনের সময় ভারতীয় নেতাদের বোকামির জন্যেই ৰাঙলা ভাগ

হয়েছিল। ১৯১২ সালে আবার ৰাঙলা এক হয়েছিল কিন্তু অসম ও ওড়িষ্যার কিছু অংশ ৰাঙলার বাইরে থেকে গেল। সেই সময় বাঙলার নেতারা এর কোনো বিরোধিতা করেনি। ৰাঙলার সব অংশকেই এক বৃহত্তর ৰাঙলার সামাজিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলে পুনর্বার এক করতে হবে। ৰাঙলার মানুষদের একতাই এই রাজনৈতিক বিভাজনকে বদলে দিতে পারে।

বৃহত্তর বাঙলার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের মানুষেরা অধিক কালো আর উত্তর ও উত্তর-পূর্বে অধিক হলদেটে। এই ৰাঙলার মানুষদের শিরা-ধমনীতে বইছে একই রক্তধারা।

আগেই বলা হয়েছে কী ছিল বাঙলা বা বৃহত্তর বাঙলা বা বাঙালীস্তানের সামগ্রিক অঞ্চল। এখন এই টুকরো টুকরো আর খণ্ডিত ৰাঙলা কীভাবে এক হবে? এই সমগ্র অঞ্চলে একই রকমের সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য। ৰাঙলাদেশে কোনো সুসংহত উন্নয়ন পরিকল্পনা না থাকার জন্যে মানুষেরা অভাব-অভিযোগ আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ অধিকাংশ স্থানে বছরে একটিমাত্র ফসল হয়, আর বাকি সময় জমি খালি পড়ে থাকে। বাঙলাদেশের জনসাধারণের

জীবনধারণের মান বাড়াবার জন্যে এক সুসংহত পরিকল্পনা খুব জরুরি। ভারতের আর্থিক মান যেমন বাড়বে, সেই সঙ্গে ৰাঙলাদেশেও অধিকতর দ্রুততার সঙ্গে সেরকমটি হওয়া উচিত। ভারত, ৰাঙলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরায় আর্থিক স্বয়ম্ভরতা আনতেই হবে।

এখন প্রশ্ন হ'ল, রাঙলাদেশ আর ত্রিপুরার মানুষদের কি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নিয়ে আসতেই হবে? না, ব্যাপারটা সেরকম নয়। আসল কথাটা হ'ল ত্রিপুরা আর ৰাঙলাদেশের মানুষের আর্থিক উন্নতির জন্যে কাজ করা যাতে এদের দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রগতি সুনিশ্চিত হয়। বাঙলাদেশে প্রয়োজন হচ্ছে এক গঠনমূলক সামাজিক-অর্থনৈতিক আন্দোলন। এর মধ্যে থাকতে হবে কারিগরী শিক্ষা, কৃষির উন্নতি আর সেই ধরনের আন্দোলন যা সব ধর্মীয় মতবাদগুলিই এইসবকে প্রোৎসাহন দেয়। শিক্ষা কখনো ভাবজড়তা প্রচারের বাহন হতে পারে না, শিক্ষা সবরকমের ভাবজড়তা থেকে মুক্ত থাকবে। ইন্দোনেশিয়ার পরেই বাঙলাদেশের জনসাধারণ সহ্যের সীমায় পৌঁছে গেছে আর বিক্ষোভের আগুনে ফুঁসছে। যেহেতু ত্রিপুরা আর বাঙলাদেশে বেশী বৈষম্য, তাই এদের উন্নতির কথা

অধিক ভাবতে হবে। ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, বরপেটা ইত্যাদি ৰাঙালী অধ্যুষিত জেলাগুলি ছাড়া অসমের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিছুটা সন্তোষজনক।

বাঙলাদেশের উন্নতির জন্যে কী করা উচিত আর কী না করা উচিত? ৰাঙলাদেশের প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে কাঁচাপাট আর চামড়া। পাটের বিকল্পের উপযুক্ত বিকাশ ঘটাতেই হবে, বিশেষ করে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ ব্লক যা বড় পাট উৎপাদন কেন্দ্র, সেখানে। এছাড়াও মিশ্রচাষ ও পর্যায়ক্রমে (crop rotation) চাষের ব্যবস্থা করে জমির সর্বাধিক উপযোগ করতে হবে। ৰাঙলাদেশের যে প্রতিকূলতাগুলি আছে তার মধ্যে পড়ে শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অপুষ্টি আর আর্থিক উন্নতির অভাব।

ত্রিপুরায় দুই প্রকারের ধান হয়– আউশ আর বোরো চাষ। অসমের দুটি প্রধান নদী উপত্যকা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র আর বরাক উপত্যকা। বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ ব্লকে বাঁশের মান খুব ভাল, একে কাগজ শিল্পে ব্যবহার করা উচিত। মিষ্টি আলু আর সুগার বিটের চাষও এ এলাকায় হতে পারে। এখানে বছরে চারটি ফসল হওয়া উচিত। আনারস থেকে পরিধানের

জন্যে কৃত্রিম তন্ত্র, ওষুধ, জ্যাম-জেলি প্রস্তুত করা উচিত। কলাগাছ ও কলাগাছের পাতা ইত্যাদিকে কাজে লাগানো উচিত আর কলাগাছ পুড়িয়ে সোডিয়াম আর সোডিয়াম নাইট্রেট সংগ্রহ করে নিয়ে সাবান শিল্পে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। অসম আর ত্রিপুরায় কাঁটাল খুব ভাল হয়, এর সঙ্গে মধু আর প্রাকৃতিক প্যারাফিনের মোম তৈরী হতে পারে।

ত্রিপুরায় লালমাটি আছে। এই মাটিতে সিলেটের ছোট কমলা, কাজুবাদাম আর পেঁপে উৎপন্ন হতে পারে। ছোট ছোট শিল্পও গড়ে তোলা উচিত। ত্রিপুরার অমরপুর ব্লকে প্রাকৃতিক রাবারের সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম রাবারের উৎপাদনকেও উৎসাহ দেওয়া উচিত। একই কথা পানিসাগর ব্লকের জাম্পুই পার্বত্য অঞ্চলের জন্যেও প্রযোজ্য। চীনাবাদাম, অন্যান্য প্রকারের বাদাম আর সাদা তিল উৎপন্ন হতে পারে। এই অঞ্চলের তেল আর প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারের প্রচুর সম্ভাবনা আছে, আর এর সঙ্গে সৌরশক্তিও উৎপাদিত করতে হবে। সৌরশক্তি হ'ল একটি অন্যতম স্থায়ী শক্তির উৎস যা নিঃশেষ হবে না। সৌরশক্তিকে ব্যাটারির মধ্যে ভরে সৌর-ব্যাটারি তৈরী করা উচিত।

ত্রিপুরাকে শক্তিস্রোতের জন্যে কেন বাইরের ওপর নির্ভর করতে হবে?

৩ জানুয়ারী ১৯৮৯, আনন্দনগর

গোর্খাল্যান্ড

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন যা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের কয়েকটি জেলা দাবী করছে, তা আজ এক চরম অবস্থায় পৌঁছেছে। গোর্খা, যারা রাজ্যের বাইরে থেকে এসেছে, তারা ভারতের নাগরিকত্বের সুযোগ নিয়ে এখন একটি পৃথক রাজ্য দাবী করছে। তারা নিয়মিতভাবে আন্দোলন করছে, হরতাল ডাকছে, জাতীয় সম্পদকে লুণ্ঠন করছে ও জ্বালিয়ে দিচ্ছে, মানুষকে হত্যা করছে, আর এইভাবে তারা সেখানকার আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে অচল অবস্থায় নিয়ে এসেছে। আসলে 'চোখের বদলে চোখ' এই পৈশাচিক আহ্বানে আজ দেশের ওই স্থান রাজনৈতিক শ্লোগানে মুখরিত। তাই পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় আইনের শাসনের প্রায় -কোনো অস্তিত্বই নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুরোপুরি ব্যর্থ। এই সরকারের একমাত্র কাজ এই আন্দোলনকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া যাতে নির্বাচনে তারা সুবিধা পায়। কম্যুনিষ্টদের লক্ষ্য যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ তাদের এই স্বার্থপূর্তির প্রয়াসকে বুঝে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের আইনমান্যকারী নাগরিকেরা এই ধর্ষণ, খুন, পুলিশের গুলিচালনা আর এত বৃহৎরূপের সন্ত্রাস, সাম্প্রতিককালেও যা সংগঠিত হয়ে চলেছে, সে সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন।

বস্তুতঃ **গোর্খাল্যান্ডের দাবী একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর কোনো পৃথক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়**, এটা ভারতের অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টি আর তার দালালদের দ্বারা **প্রাথমিকভাবে সৃষ্ট একটা কৃত্রিম ব্যাপার।** ১৯৭৭ সালে মার্ক্সবাদীরা গোর্খাদের মধ্যে একটা আবেগ তৈরী করে', তাদের দিয়ে গোর্খাদের স্বশাসন ও গোর্খালী ভাষার স্বীকৃতির নামে এই দাবী চাগিয়ে তুলেছিল। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা। সেই নির্বোধ আর সংকীর্ণমনা রাজনৈতিক নেতারা এটা তখন বুঝতে পারে নি

যে, তাদেরই সৃষ্ট এই দাবী ও আন্দোলন একদিন তাদের ওপরেই বুমেরাং হয়ে আঘাত করবে। বিস্ময়করভাবে সেই কম্যুনিষ্টরাই এখন নিজেদের রোপিত বিষবৃক্ষকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের কৃতকর্মের দায়কে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের স্বভাবগত ধূর্ততার সাহায্যে তারা এখনও পশ্চিমঙ্গের মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে যে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। আর তারাই নাকি এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের উৎসাহদাতা।

আজ সময় এসেছে কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে কী কী জঘন্য ভূমিকা পালন করেছে সেটা, আর তাদেরই সৃষ্ট এই গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনের মুখোশ খুলে দেওয়া। ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই কম্যুনিষ্ট পার্টিই ৰাঙলাকে বিভক্ত করার শ্লোগান তুলেছিল। সেই সময়েই তারা গোর্খাদের জন্যে পৃথক ভূমির শ্লোগানও দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই 'গোর্খাল্যাণ্ড' শব্দটা চল্লিশ বছরের পুরনো আর **কম্যুনিষ্টপার্টি দাবী করেছিল যে সিকিম, নেপালের অংশবিশেষ আর উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং সহ কয়েকটি জেলা নিয়ে এই গোর্খাল্যান্ড গঠিত হোক।** এটা হবে

গোর্খাদের নিজস্ব বাসভূমি। এই গোর্খাল্যান্ড দাবীর মাধ্যমে কম্যুনিষ্ট পার্টি আসলে গোর্খাদের মধ্যে একটা শক্ত রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরী করতে চেয়েছিল; কিন্তু সেইসময় এই আন্দোলন ফলপ্রসূ হয়নি।

১৯৭৭ সালে কম্যুনিষ্টরা যখন ক্ষমতায় এল, মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি এই পুরনো গোর্খাল্যাণ্ড আবেগকেই পুনর্জাগরিত করল, যা আজ রাজ্যের উত্তরাংশে এক চরম অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা আর রক্তস্নানের স্থান হয়ে উঠেছে। নিরীহ, শান্তিপ্রিয় সেখানকার বাঙালী অধিবাসীরা দার্জিলিং-এ নিজেদের বাসগৃহ ত্যাগ করে পালিয়ে এল, আর তারা আজ উদ্বাস্তু হয়ে কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি জেলায় বাস করছে। এইভাবে বাঙালীর নিজেদেরই রাজ্যে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বহিরাগত গোর্খারাই দাবী করছে যে বাঙালীরা দার্জিলিং ছেড়ে চলে যাক।

দার্জিলিং-এর মূল অধিবাসী লেপ্সা-ভুটিয়ারা কোচ জাতিভুক্ত। এই কোচেরা আদি ৰাঙালী। 'কোচ' জনসাধারণের একটা অংশ সিকিম-ভুটানে সংকোচ নদীর দুই ধারে বসতি স্থাপন করেছিল, আর তাদেরই একটা অংশ বরেন্দ্রভূমি থেকে

এসে বাঙলার উত্তরাংশের আরো উত্তরে পর্বত অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিল। লেপ্সা-ভুটিয়ারা বাঙালী জীবন আর সংস্কৃতির মূলস্রোতের সঙ্গে সবসময় সম্বন্ধিত থেকেছে। অন্যদিকে গোর্খারা স্পষ্টতই বহিরাগত।

প্রায় দু'শ বছর আগে বাঙলার বাইরে থেকে গোর্খারা জীবিকার সন্ধানে এসে দার্জিলিং পর্বতাঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিল। ১৮৭২ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী সে সময় এদের সংখ্যা এত নগণ্য ছিল যে তাদের সেই রিপোর্টে রেকর্ডভুক্তই করা হয়নি, শুধু এইটুকু উল্লেখ করা হয়েছিল যে তারা বহিরাগত মাত্র। ওই অঞ্চলের উচ্চতর পার্বত্য এলাকায় লেচা আর ভুটিয়ারা বাস করত। সমতলে বাস করত বাঙালীরা।

এছাড়া যারা নেপালী বলে পরিচয় দেয় আর দার্জিলিং অঞ্চলে বসবাস করে, তাদের একটা বড় অংশ আদৌ গোর্খা নয়। নেপালীদের পনেরোটি গোষ্ঠী যেমন-তামাং, গুরুং নেওয়ারী ইত্যাদি দার্জিলিং অঞ্চলে বসবাস করে। তারা গোর্খা নয় আর তাদের ভাষাও গোর্খালী নয়। আসলে গোর্খালী খুবই ছোট একটি গোষ্ঠীর উপভাষা। ব্যাপারটা ঠিক এইরকম-

ভারতীয় ভাষা বলে যেমন কোনো ভাষা বলা যায় না, কেননা ভারতে ৩২৩ টি মুখ্য বা গৌণ ভাষা-আর উপভাষা আছে, আর সব ভাষাগুলিই ভারতীয় ভাষা। ঠিক তেমনি নেপালে প্রায় বত্রিশটি ভাষা আর উপভাষা আছে আর তাদের মধ্যে প্রত্যেকটিই নেপালী ভাষা। গোর্খালী ভাষা সেই অর্থে ঠিক নেপালের রাজভাষাও নয়। এই গোর্খারা এক ক্ষুদ্র উপজাতি সম্পদায়ের হয়েও তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থপূর্তির জন্যে গোর্খাল্যান্ডের দাবী তুলেছিল, আর এইভাবে তারা দার্জিলিং পর্বতাঞ্চলে বসবাসকারী সরল ও নিরীহ মানুষদের ভুল বোঝাতে শুরু করলেন।

এই গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের পিছনে কোনো ঐতিহাসিক, সামাজিক অথবা আর্থিক যৌক্তিকতা নেই। লেপচা আর ভুটিয়া যারা সেখানকার মাটির সন্তান, তারা গোর্খাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী। তাই যারা আজ 'গোর্খাল্যান্ড গোর্খাল্যান্ড' বলে চিৎকার করছে তারা কেবলমাত্র তাদের হাতকে কলঙ্কিত করে এক বিপজ্জনক রাজনৈতিক খেলায় মেতেছে। ঠিক যেরকম গোর্খালী ভাষা সংখ্যালঘুদের ভাষা আর তা বৃহদংশের ওপরে কোনোভাবেই চাপিয়ে দেয়া যায় না, ঠিক তেমনি গোর্খারা

দার্জিলিং জেলায় বসবাসকারী অধিবাসীদের মধ্যে খুবই ক্ষুদ্র গোষ্ঠী; আর তাদের এই জন্যেই ওই অঞ্চলে উস্কানির রাজনীতিতে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু গত চল্লিশ বছর ধরে এই রাজনীতি লালিত-পালিত হতে দেওয়া হয়েছে, আর গোর্খাল্যান্ডের পিছনে আছে এই গোর্খারাই। এই গোর্খারা সিকিম, ভুটান, আর অসম থেকে উঠে এসে এই দার্জিলিং জেলায় একত্রিত হয়েছিল। পশ্চিম ৰাঙলার বামফ্রন্ট সরকারই জঙ্গল সাফ করে তাদের সেখানে বসিয়েছিল, আর গোর্খালীকে রাজ্যের ভাষার মধ্যে একটি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাই মার্ক্সিস্টরাই গোর্খাদের তাদের নিজস্ব বাসভূমির জন্যে উস্কানী দিয়েছিল। ৰাঙলার মার্ক্সিস্টদের বিপজ্জনক আর জঘন্য রাজনীতির এটা একটা নমুনা মাত্র।

এখন দেখা যাক্ এই ব্যপারে ভারতের সংবিধান কী বলে? অলিখিতের চেয়ে একটা লিখিত সংবিধান মানুষের অপেক্ষাকৃত ভাল আশ্রয়। **ভারত, ফ্রান্স, আর আমেরিকার সংবিধান লিখিত** কিন্তু **ইংল্যান্ডের সংবিধান অলিখিত** যদিও তার সঙ্গে সেখানকার মানুষেরা ভালভাবেই পরিচিত। ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্দিষ্ট উপজাতিভুক্ত

এলাকাগুলি বিশেষ সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করে। অর্থাৎ যেখানে উপজাতিদের অ-উপজাতিদের দ্বারা পরিচালিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানকার উপজাতিরাই এই সাংবিধানিক অধিকারভুক্ত। এইরকম কয়েকটি উপজাতির উদাহরণ হ'ল গারো, খাসিয়া, কাছারী ইত্যাদি যারা অসম ও মিজোরামের কিছু জেলায় বসবাস করে। ভারতীয় সংবিধানের এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র উপজাতিদের জন্যে, অন্য কোনো ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর জন্যে নয়। আর এই সুবিধা কেবলমাত্র পূর্বোত্তর ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য কোনো অঞ্চলের জন্যে নয়, এমনকি ভারতের অন্যান্য অংশে বসবাসকারী উপজাতিদের জন্যেও নয়। অবশ্য এই সাংবিধানিক অধিকার কোনো দেশে খুব অল্প সময়ের জন্যেই প্রচলিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

ত্রিপুরা এই সাংবিধানিক সুবিধার আওতাভুক্ত নয়, তা সত্ত্বেও এই কম্যুনিষ্ট পার্টি সেই রাজ্যে এর অপব্যবহারের সুযোগ নিতে ছাড়েনি। তারা সেখানে ক্ষমতার অপব্যবহার করে সংখ্যার জোরে বিধানসভায় উপজাতি পার্বত্য কাউন্সিল বিল অনুমোদন করিয়েছিল। বস্তুতঃ এই আইন ভারতের সংবিধান বিরোধী, আর তা ভারতীয় একতারও পরিপন্থী।

ৰাঙলাতেও ঠিক তেমনি দার্জিলিং-এ আজকের **গোর্খা হিল কাউন্সিল ভারতীয় সংবিধান বিরোধী,** কেননা গোর্খারা উপজাতিভুক্ত নয়। স্বার্থপর কম্যুনিষ্ট নেতা আর গোর্খা প্রধানদের মধ্যে এই সমঝোতা বা চুক্তি শুধু বেআইনীই নয়, অসংবিধানিকও বটে। সংবিধান অনুসারে গোর্খারা কোনোমতেই 'গোর্খা হিল কাউন্সিল আইনে এই অধিকারভুক্ত হতে পারে না। যারা এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল তারা বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই সরকার আর গোর্খাদের এই চুক্তির কোনোভাবেই উপজাতি সম্বন্ধিত হতে পারে না। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই এটি বেআইনী ও সংবিধান বিরোধী। সুপ্রিমকোর্টে যদি উপযুক্ত বিচার হয় তাহলে এটা সেখানে টিকবেও না।

৩০ আগষ্ট ১৯৮৮, কলিকাতা

বাঙলার জন্যে উপযোগী কয়েকটি উন্নয়ন কার্যক্রম

ৰাঙলার সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের জন্যে অনেক কিছু করবার রয়েছে; কিন্তু তা

করবার জন্যে তোমাকে স্থানীয় এলাকা ও মানুষজন সম্পর্কে ভালভাবে জেনেবুঝে নিতে হবে, আর সেই সঙ্গে সেই বাস্তব, জ্ঞানকে বৈবহারিক ভাবে কাজে লাগাতে হবে। ৰাঙলার প্রধান নগর ও শহরগুলি কী কী? সেখানে দৈনন্দিন পানীয় জলের ব্যবস্থা কী? এর উৎস-স্রোত মাটির নীচেকার জল, না বৃষ্টির জল? এইসব শহরে অধিবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্যের কোনো সমস্যা আছে কি? এখানে নাগরিকদের · আয়ের উৎসই বা কী? সেটা কি কৃষিনির্ভর বা শিল্পনির্ভর বা ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর? এই ব্যাপারে বীরভূম জেলা, বাঁকুড়া জেলা ও দীঘা অঞ্চলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা যাক্।

বীরভূম জেলায় উত্তর থেকে দক্ষিণে, বিশেষ করে তারাপীঠ এলাকা যেখানে উঁচু জমি আর নীচু জমি আছে, দুই রকমের জমির চরিত্র। লাভপুরের কাছে নানুর ব্লকে উঁচুজমি আর ময়ূরেশ্বর ব্লকে নিচুজমি। এই উঁচু আর নিচু জমির মুখ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেখানে বসবাসকারী মানুষদের উচ্চতা সমান হবে না- উঁচু এলাকায় মানুষ আকারে লম্বা, আর নিচু এলাকায় তাদের আকার ছোট। ঠিক তেমনি বীরভূম জেলার পূর্বে মানুষেরা অপেক্ষাকৃতভাবে লম্বা আর পশ্চিমে মানুষেরা

অপেক্ষাকৃতভাবে ছোট। বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশ পূর্বাংশের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। উঁচুজমি এলাকায় লোকেরা চর্মরোগে বেশী ভোগে। ১৮৫৬ সালে সিউড়ি, রামপুরহাট, দুমকা, দেওঘর আর মুর্শিদাবাদ জেলার কিয়দংশ নিয়ে বীরভূম জেলা তৈরী হয়েছে।

প্রায় ১২০০ বছর আগে উপবঙ্গ বা শ্রীভূমির পত্তন হয়েছিল যার মধ্যে ছিল সিলেট, নোয়াখালি, চট্টল, ত্রিপুরা ইত্যাদি। পদ্মার পূর্ব পাড়ে আর মেঘনার পশ্চিম পাড়ে ছিল ৰঙ্গ বা বরাক। পদ্মার দক্ষিণে ছিল বরেন্দ্রভূমি অঞ্চল। ৰাঙলার মূল অঞ্চলগুলি ছিল রাঢ়, সমতট, ৰঙ্গ, বরেন্দ্র আর মিথিলাকে নিয়ে। সামূহিকভাবে এই পাঁচটি এলাকাকে বলা হত **'পঞ্চগৌড়'** অর্থাৎ 'মিষ্টি দেশ'। 'পঞ্চ' শব্দের অর্থ 'পাঁচ' আর 'গৌড়' শব্দের অর্থ 'মিষ্টি'।

চৈতন্যদেব যখন ত্রিপুরার উপজাতিদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করলেন তখন তারা 'দেব বর্মণ' উপাধি নিল– 'দেব' এসেছে চৈতন্যদেব থেকে আর 'বর্মণ' শব্দের অর্থ 'উপজাতি'। উত্তর ত্রিপুরার সালেমা ব্লকের শিল্প সম্ভাবনা কী রকম? এই এলাকায় নদী আর ছোট নদীর সংখ্যাই বা কী? ব্লকের মুখ্যালয়

কৈলাশহর। জলের প্রধান উৎস লংতরাই পাহাড় থেকে নেমে আসা ধলই নদী। তাই বর্ষাকালে নদীতে প্রচুর জল কিন্তু গ্রীষ্মকালে জলের আকাল।

এবার দীঘার কথা বলা যাক্। পূর্বে দীঘার নাম ছিল দীর্ঘকা 'দীর্ঘ' মানে 'লম্বায় বড়' আর 'ক'-এর অর্থ 'ভূমি'। এই ভাবেই হয়েছে আজকে দীঘা। দীঘার নিকটে যে রামনগর আছে তার নামকরণ হয়েছে মেদিনীপুর জেলার শেষ মহারাজা রামনারায়ণ হাতার নামানুসারে। তখন জেলার রাজধানী ছিল কাঁথি। রামনগর একবার প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়েছিল, তখন ব্রিটিশরা জেলার মুখ্যালয় কাঁথিতে স্থানান্তিরত করেছিল। কিন্তু তারা কাঁথির নাম পাল্টে করল কন্টাই কেননা প্রায় কাছাকাছি নামের আর একটি জেলার মুখ্যালয়ের নাম ছিল (কান্দি)। দীঘা সহ চারিপাশের এলাকা ছিল প্রধানতঃ বৌদ্ধামতাবলম্বী।

দীঘার সমুদ্রতট পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে চওড়া। সমগ্র দীঘা অঞ্চল জুড়ে সমুদ্র উপকূল বরাবর সামুদ্রিক ঝাউ ইত্যাদি লাগিয়ে বৃহৎভাবে বনসর্জন করতে হবে। যার ফলে সামুদ্রিক ঝড় আটকানো সম্ভব হবে। সেটা হলে দীঘা অঞ্চলে নানা ধরনের গাছ লাগানো যাবে। এখানে নারকেল তো খুব ভালই

জন্মায়। তুমি যদি গাড়ি করে দীঘার সমুদ্র তীরবর্তী রাস্তা ধরে পাঁচ মাইল যাও তাতে দেখবে কিছু বনাঞ্চল আছে। অবশ্য সমুদ্রের আগ্রাসনকে ঠোকানোর জন্যে দীঘার সমুদ্রতটে সেরকমভাবে পাথরের দেওয়াল তৈরী করা হয়নি। আনুমানিক প্রতি সাত বছরে একবার বিশাল ঝড় এসে গাছ- পালাকে ধুয়ে নিয়ে চলে যায়, যার ফলে গাছ বেশী বড় হবার সুযোগই পায় না। যদি প্রতি বছর নিয়মিতভাবে আর ব্যাপকভাবে তট বরাবর গাছ লাগানো হতে না থাকে আর পাথরের দেওয়াল ঠিকভাবে তৈরী করা না হয়, তাহলে ভূমিক্ষয় আরও বেড়ে চলবে, আর ঝড়ের তীব্রতা রুখবার কোনো উপায়ই থাকবে না।

ট্রেন লাইনকে নিয়ে যেতে হবে একেবারে ভোগরাই পর্যন্ত যেখানে সুবর্ণরেখা নদী সমুদ্রে পড়ছে। বর্তমানে ভোগরাই ওড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত। সেই স্থানে বা দীঘার অন্য সুবিধাজনক স্থানে বন্দর গড়ে তুলতে হবে যা দিয়ে নারকেল, মাছ, পান, সুপারি, উঁচু মানের কাজুবাদাম ইত্যাদি রপ্তানি করা যাবে। এর ফলে এই অঞ্চলের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর হবে। ভ্রমণকারীদের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্যে দীঘার

সমুদ্রতট বরাবর মেরিন ড্রাইভ তৈরী করতে হবে আর এর উপযুক্ত সৌন্দর্যায়ন করতে হবে।

এবার আমাদের বাঁকুড়া জেলা নিয়ে আলোচনা করা যাক্। বাঁকুড়া জেলাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে ইন্দাস ব্লক বাদে বিষ্ণুপুর মহকুমা। এই এলাকায় মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশী নয়। জমি একেবারে সমতলও নয় আবার ঢেউ খেলানোও নয়। আমন ধান ভাল হলেও আউশ আর বোরো তত ভাল হয় না। সেচ ব্যবস্থা আর খালনালা ইত্যাদি পরিকল্পিতভাবে করতে হবে।

দ্বিতীয় হচ্ছে ইন্দাস ব্লক। সেখানে জমি সমতল হলেও মাটির জলধারণ ক্ষমতা কম। এখানকার মাটি সীমান্তবর্তী বর্ধমান জেলার মত। তাই এই ব্লকের কৃষি পরিকল্পনা বর্ধমান জেলার সঙ্গে সামূহিকভাবে করতে হবে। এই এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষি।

তৃতীয় হচ্ছে খাতরা মহকুমা আর জেলার বাকি অংশ। এখানে জমি ঢেউ খেলানো আর এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে আছে কুঁড়ে ঘরগুলি। খুব তাড়াতাড়ি জল নীচে চলে যায় আর জেলার অন্যান্য অংশের চেয়ে মাটির জলধারণ ক্ষমতা আরও

কম। এই অঞ্চলে উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। এখানকার কৃষি সম্ভাবনা খুব কম হলেও এই এলাকা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ এই এলাকার দক্ষিণাংশে আছে কয়লার বিশাল ভাণ্ডার, অভ্র-রুপে-তামাও পাওয়া যাবে। সংলগ্ন পুরুলিয়া জেলার মানভূম এলাকাতেও তামার ভাণ্ডার আছে। পুরুলিয়া আর বাঁকুড়ার সংযোগকারী রাস্তার দক্ষিণে নান ধরনের খনিজ সম্পদ আছে। এই সব খনিজ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন প্রকারের শিল্প করার জন্যে উপযুক্ত পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।

বাঁকুড়া জেলার মাটি ফলচাষের পক্ষে খুবই ভাল, তাই এই সংক্রান্ত শিল্পের জন্যেও উপযুক্তভাবে পরিকল্পনা করে তা কার্যে রূপায়িত করতে হবে। যেমন আঙুর, মিষ্টি নেবু, পেঁপে, পেয়ারা ইত্যাদি এখানে খুব ভাল হয়। তালডাংরা ব্লকের চারিপাশের মাটি লাউ উৎপাদনের পক্ষে খুব উপযোগী। এই সবকে মনে রেখে উপযুক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করতে হবে।

আরাকান পর্বতমালা বরাবর স্থানীয় মানুষের ভাষা বাংলা; কবি সৈয়দ মহম্মদ আলাওল বাঙলাদেশের অধিবাসী ছিলেন, তিনিই এইস্থানে ৰাংলাভাষার প্রবর্তন করেন।

হাওড়া জেলায় এখন রেশম শিল্প মোটেই ভাল অবস্থায় নেই, অধিকাংশ 'রেশম মালদা জেলা থেকে আসে। এই জেলার আমকে নিয়ে কোনো শিল্প গড়ে ওঠেনি। এই জেলার আমতা ব্লকে এক বৃহৎ উর্বর এলাকা আছে যা ধান ইত্যাদি চাষের উপযুক্ত। আমতা মহকুমায় কোনো নোতুন বৃহৎ বা মাঝারি আকারের শিল্প গড়ে উঠতে পারে কি? এই এলাকার নদীগুলি কী? জলের কি চিরস্থায়ী উৎস আছে? এই ব্লকের সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কী? এইসব বিবেচনা করেই উপযুক্ত পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।

ওড়িষ্যার কেওঝড় এলাকার বাদামপাহাড়ে আকরিক লৌহের ভাণ্ডার আছে। আগে ওই এলাকার মহারাজা এই আকরিক পরিবহনের জন্যে একটি ন্যারো গেজ লাইন তৈরী করে দিয়েছিল। আজ টাটা কোম্পানী এখনও আকরিক লৌহ বহনের জন্যে সেই ট্রেন লাইনটি ব্যবহার করছে। এই এলাকায় বাবুই ঘাসের প্রচুর জঙ্গল আছে যা দিয়ে সাধারণ মানুষ দড়ি তৈরী

করে। এই বাবুই ঘাস কাগজ শিল্পেও কাজে লাগানো যাবে। ভঞ্জভূমের মাহাতোদের মাতৃভাষাকে অবদমিত করা হচ্ছে।

যে-কোনো অঞ্চলের শিল্প সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে তোমাদের যেসব বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে তা হচ্ছে-শক্তি উৎপাদন, জলাধার নির্মাণ, জনগণের সাধারণ সমস্যা, জমি আর মাটির অবস্থা, মিশ্রচাষের সম্ভাবনা, কাঁচামালের সহজলভ্যতা, স্থানীয় শিল্প তৈরী।

১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯, কলিকাতা

বাঙলার মূল অধিবাসী

ৰাঙালীস্তানের মূল অধিবাসী হচ্ছে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, রাঢ়ের মাহাতো ইত্যাদি, চট্টগ্রাম আর ত্রিপুরার চাকমা, মেদিনীপুর আর চব্বিশ পরগণার মাহিষ্য, বীরভূমের সদগোপ, যশোর আর খুলনার নমশুদ্র আর বর্ধমানের উগ্র ক্ষত্রিয়। এই আদি ৰাঙালীদের বলা উচিত 'জাত ৰাঙালী'।

এইসব জনসমুদায় যে আদি ৰাঙালী তার প্রমাণ হচ্ছে যে তাদের বাসস্থান সংলগ্ন গ্রামগুলিতে, আর ওইসব স্থানেই তারা

গোষ্ঠীৰদ্ধভাবে থাকে। এই মূল অধিবাসীরা গ্রামের পর গ্রাম এক সঙ্গে থাকে। তারা এক-দু'টি বিচ্ছিন্ন গ্রামে থাকে না, এই জনসমুদায়ের কিছু লোক দূরবর্তী গ্রামেও বসবাস করে না। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে স্থানীয় মানুষ নির্দিষ্ট এলাকায় সংঘৰদ্ধ হয়ে থাকে। বিপরীতভাবে ব্রাহ্মণ আর কায়স্থদের কিছু কিছু গ্রামে পাওয়া যাবে আর তাদের সংখ্যাও এক একটা গ্রামে বেশী থাকে না; তাই এটা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না যে তারা বাঙলার মূল অধিবাসী। তারা বাঙলার বিভিন্ন অংশ থেকে বিশেষ কাজের জন্যে এসেছে অথবা তারা বাঙলার বাইরে থেকে এসেছে।

তুমি যখনই ৰাঙলার জন্যে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করবে তখন তোমাকে জাত ৰাঙালীদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে, কেননা তারা মূল অধিবাসী আর তাদেরই সংখ্যাধিক্য। তারা উপকৃত হলে সমগ্র ৰাঙালীস্তান উপকৃত হবে।

ৰাঙালী জনসমুদায়ের মূল নাম ছিল 'কৈবর্ত্ত' যার অর্থ 'মাছ ধরার সম্প্রদায়'। মাহাতো নাম এসেছে 'মহাত্মা' শব্দ

থেকে। এই পাঁচটি মূল অধিবাসীরা tribal অর্থাৎ আদিবাসী নয়।

বাঙলায় ছোট ছোট অনেক এমন গোষ্ঠী আছে যারা অ-সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ ইন্দো-টিবেটান বা এই ধরনের অন্যান্য ভাষা। যারা অ-সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে তাদেরই আদিবাসী বলা যায়। আর জাত ৰাঙালীরা সংস্কৃতজ ভাষায় কথা বলে।

মানবসমাজ এক আর অবিভাজ্য। তাই ৰাঙালীস্তান অবশ্যই বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধে কখনই যাবে না। এটা অত্যাবশ্যক। তুমি যেখানে বাস কর সেখানকার স্বার্থ তো অবশ্যই দেখবে, কিন্তু তুমি বিশ্বমানবতার ভাবধারাকে কখনই ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না। মূল কথাটা হচ্ছে তোমরা বিশ্লেষণাত্মক পথে হাঁটবে না। যেমন **সমস্ত উপভাষা বা তস্য শাখা-ভাষা সমূহ (dialects and sub-dialects) একদিন মূল ভাষায় মিশে যাবে। এটাই হ'ল সংশ্লেষণের পথ।**

২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯, কলিকাতা